শ্রীঅরবিন্দ

(জীবন ও যোগ)

প্রমোদকুমার সেন

দি কাল্‌চার পাব্‌লিশার্স
২৫এ, বকুলবাগান রো, কলিকাতা

লেখকের বিবৃতি

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী লেখা সহজ কথা নয়। এক তিনিই তাঁহার কথা বলিতে পারেন। কাজেই আমি নিজেই আশ্চর্য হই কেন এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি তাঁহার বিরাট জীবনের কতটুকু জানি। তাঁহার অন্তর্জীবনের পরিচয় রাখার বিন্দুমাত্র স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমি যে এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা নিছক নিজের অন্তরের প্রেরণায়—তাঁহাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিবার জন্য।

শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধা করিবার প্রেরণা লাভ করি আমার পিতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেনের নিকট। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে শ্রীঅরবিন্দের অনুবর্ত্তী ছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে কার্য্য করিতেন। তাঁহার শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই, তবে তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী প্রাদেশিক সম্মিলনে শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়দলের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত "বন্দেমাতরম", "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" নিয়মিতভাবে পাঠ করিতেন। আমার মনে পড়ে বাল্যকালে ঐ সকল কাগজ দেখিতাম এবং উহাতে কি লেখা থাকে জানিবার জন্য আমার বালকমন উৎসুক হইত। কিন্তু কিছুই বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না।

উত্তরকালেও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ছিল, কিন্তু কিছুতেই বুঝিতাম না কেন তিনি রাজনীতিক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। যোগ

সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, শ্রীঅরবিন্দের কোন লেখা পড়িয়া বুঝিতাম না, পড়ারও কৌতূহল ছিল না। মনে পড়ে আমাদের হোষ্টেলে আমার পাশের ঘরে জনৈক ছাত্র "আর্য্য" রাখিতেন—তখন "আর্য্য" প্রকাশিত হইতেছিল—কিন্তু তাহাতে কি লেখা থাকে কোনদিন পাতা উল্টাইয়াও দেখি নাই, যদিও আমি দর্শনের ছাত্র ছিলাম। তবু যেদিন আমাদের কলেজের প্রিন্সিপালের আদেশে হোষ্টেল লাইব্রেরীতে শ্রীঅরবিন্দের "War and Self-Determination" ও অন্য কয়েকখানি পুস্তক ক্রয় করিয়াও ফিরাইতে হইল, সেদিন বড় ব্যথা পাইলাম। অবশ্য নিজের ঐ সকল পুস্তক বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না, তবু ক্ষোভ হইল জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে কেন ঐ মহান ব্যক্তির লেখা বিদায় দেওয়া হইল। পরে ঐ পুস্তকখানি পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি যে, কি কারণে আমাদের সাহেব প্রিন্সিপাল উহাকে পাত্তা দিলেন না। তিনি নিশ্চয়ই উহা পড়েন নাই, যদি পড়িতেন তাহা হইলে উহার যুক্তিমত্তা ও উদার ইঙ্গিতে মুগ্ধ হইতেন। সাধারণতঃ এইরূপই হয়—আমরা কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে ভাল করিয়া না জানিয়া বা কোন বিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান না করিয়া বিচারক সাজিয়া বসি।

পরে শ্রীঅরবিন্দের কিছু কিছু লেখা পড়িয়া বুঝিবার ক্ষমতা হইল, কিন্তু তিনি কেন যোগাশ্রয় করিয়াছেন তাহা প্রহেলিকার মত লাগিত। যাঁহারা পণ্ডিচারী আশ্রমে গিয়াছেন বা সেখানকার খবর রাখেন এরূপ কাহারও কাহারও সহিত আলাপ হইত। চমক লাগিল যখন দেখিলাম শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও দিলীপকুমার রায় পণ্ডিচারী প্রয়াণ করিলেন। পরে দিলীপবাবুর লেখা "শ্রীঅরবিন্দ সন্দর্শনে" নামক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দের যে মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিলাম

তাহাতে হৃদয় মুগ্ধ হইল—শ্রীঅরবিন্দের যোগ কি জানিবার ঔৎসুক্য জন্মিল, শ্রীঅরবিন্দের লেখাগুলি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইহার ফলে যে সামান্য জ্ঞানোদয় হইয়াছে, এই পুস্তক হয়ত তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবে।

সাংবাদিকের জীবন গ্রহণ করিবার পর কয়েকটী রাজনীতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হইল। দেশের কিছু পরিচয় পাইলাম। মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মিল। বিশ্বের রহস্য জানিবার ঔৎসুক্য হইল। কিন্তু নানারূপ বই ও লেখা পড়িয়াও কূলকিনারা পাইতাম না। এমন সময়ে আমার এক বন্ধুর অনুগ্রহে "আর্য্যে"র প্রথম খণ্ড হাতে আসিল। তাহাতে Life Divine পড়িয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলাম—এরূপ উদার দৃষ্টি, অকাট্য যুক্তি, জ্ঞানের বিশালতা ত কোথায়ও পাই নাই। কয়েকখণ্ড "আর্য্য" পড়িয়া মনে হইল যেন নূতন জন্ম হইল—এতদিন যে ভাব ও ধারণার মধ্যে ছিলাম তাহা একেবারে বদলাইয়া গেল! জীবন-রহস্যের সন্ধান পাইলাম, মহান-জীবনের আভাস পাইলাম, বিশ্বের ও ব্রহ্মের স্বরূপের বিষয়ে প্রতীতি জন্মিল। বুঝিলাম শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতিক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কি মহান ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। Life Divine-এ শ্রীঅরবিন্দের দিব্যযোগের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে, জীবনে ও জগতে সমন্বয় স্থাপনের যে ইঙ্গিত আছে তাহা পড়িয়া শ্রীঅরবিন্দের সেই অপূর্ব্ব আদর্শের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সুখের বিষয় Life Divine শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের সহজ কথায় কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের "তীর্থঙ্কর" পুস্তকের শ্রীঅরবিন্দ-অধ্যায়ে।

আমি এই পুস্তক লিখিবার সময়ে উহা প্রকাশিত হয় নাই, কাজেই শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে আলোচনায় উহার সহায়তা লইতে পারি নাই। দিলীপবাবু বড়ই ভাগ্যবান যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের মুখে তাঁহার আদর্শের কথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।* আরও সুখের বিষয় যে, তিনি ঐ কথাগুলি তখনই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য আজ আমরা শ্রীঅরবিন্দের কথায় তাঁহার যোগরহস্য জানিবার সুযোগ পাইয়াছি।

উহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, কি উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ যোগ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহার পর উপলব্ধির ফলে তাহার কি অপূর্ব অভিজ্ঞতা হইল। তাঁহার কথাগুলি কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

আমার নিজেরও এক সময়ে ইচ্ছা হ'ত যোগবলে জগৎটাকে মুহূর্তে দিই বদলে—মানবপ্রকৃতিটাকে ফেলে সাজাই—জগতে মন্দ যা কিছু আছে, শোচনীয় যা কিছু আছে এই দণ্ডে লুপ্ত ক'রে দিই আমার সাধনবলে। আমি প্রথম এসেছিলাম এখানে এই ধরণের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য নিয়ে—যদিও আমার পণ্ডিচেরিতে আসার প্রধান কারণ আমি এইখানে সাধন করবার আদেশ পেয়েছিলাম। ..

'লেলে-কে † আমি তাই বলি যে যোগসাধনা করতে আমি রাজি কিন্তু কর্মসাধনা ছেড়ে নয়। দেশ ও কাব্য দুই-ই আমি অত্যন্ত ভালোবাসতাম।.. ...লেলে রাজি হ'ল, দিল আমাকে

* দিলীপবাবু পণ্ডিচেরীতে স্থায়ীভাবে যাইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

† মহারাষ্ট্রীয় যোগী। বরোদায় ইহার সহিত শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় হয়।

দীক্ষা। কিছুদিন পরে আমাকে নিজের অন্তর্নির্দেশ মেনেই চলতে বলে বিদায় নিল। আমি পণ্ডিচেরি এসে পূর্ণযোগসাধনায় বসলাম। কিন্তু সাধনা করতে করতে আমার দৃষ্টিভঙ্গিই গেল বদলে। আমি দেখলাম যে আমি এখনি এখনি এসব করা সম্ভবপর ভাবতাম শুধু আমার অজ্ঞানের জন্যে।

"দিলীপ—অজ্ঞান?

"হ্যাঁ, কেন না আমি এই সত্যটা তখন জানতাম না যে জগতের মানুষকে উদ্ধার করতে হ'লে একজন মানুষের পক্ষে বিশ্বসমস্যার চরম সমাধানে পৌঁছনই যথেষ্ট নয়—তা সে মানুষ যতই কেন অসামান্য হোক না। শুধু নিজেই অমৃতলোকে পৌঁছলেই হবে না—বিশ্বমানবকেও হ'তে হবে অমৃতলাভের অধিকারী। কিন্তু তার জন্যে কালও অনুকূল হওয়া চাই। আসল সমস্যাটা হ'ল ঐখানে। শুধু উপরের আলো নামতে রাজি হ'লেই হবে না—সে নামতেও পারে থেকে থেকে—কিন্তু তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না যদি নিচের আধার—গ্রহীতা আধার ধারণ করতে না পারে। ...এ বিশ্বজগতের দুর্দৈবের কোনো আশু সমাধান বা অমোঘ ঔষধ চমৎকার ক'রে বাৎলে দেওয়া অসম্ভব। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ-কথার সাক্ষ্য মিলবে।

"দিলীপ—তাহ'লে আপনি সাধনা করছেন কিসের জন্যে? নিজের মুক্তি বা সিদ্ধির জন্যে?

"না। তাহ'লে আমার এত সময় লাগত না। ...আমি চাই ঊর্দ্ধতর লোকের এমন কোনো আলো এ জগতে আনতে, এমন কোনো শক্তি এখানে সক্রিয় করতে—যার ফলে মানবপ্রকৃতির মধ্যে হবে একটা খুব বড় রকমের অদলবদল, ওলটপালট·

এমন কোনো দিব্যশক্তি যা এ-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় হয় নি।"

এই হৃদয়গ্রাহী কথোপকথনের কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল—সমস্তটা পাঠ না করিলে কেহ তৃপ্ত হইবেন না। ইহাতে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। আদর্শোপলব্ধি সম্বন্ধে তাঁহার কি অটুট বিশ্বাস! তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত জানি যে অতিমানস—সত্য, তার আবির্ভাবও যথাসময়ে হবেই হবে। আমার বিশ্বাস ও ইচ্ছা বলে যে এযুগেই ঘটবে এ-অঘটন। .... এই অতিমানস শক্তি নিজের পথ নিজে ক'রে নিতে পারে যদি সে একবার নামতে পারে—অর্থাৎ যদি পার্থিব চেতনা তাকে একবার ধারণ করতে পারে।"

দিলীপকুমার জিজ্ঞাসা করেন এ-শক্তির কাজ কি মুষ্টিমেয় জনকয়েকের ওপর, না অনেকের ওপর। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "পূর্ণযোগ যদি আমার মতন দুএকজনের জন্যে হ'ত, তাহ'লে তার মূল্যও হ'ত খুব কম. কেননা আমি তো আর এই বাস্তবজীবনকে ছাড়তে চাইছি না—চাইছি তার একটা আমূল গভীর পরিবর্ত্তন।

"দিলীপ—কিন্তু, এ-পরিবর্ত্তনের জন্যে আপনার পরবর্ত্তীদের আপনার মতন অমানুষিক সাধনা করতে হবে না তো?

"শ্রীঅরবিন্দ হাসলেন: "না। আর করতে হবে না বলেই আমি বলেছিলাম অনেকদিন আগে যে আমার যোগ শুধু আমার জন্যে নয়—সব মানুষের জন্যে। যাকে অচিন বনের মধ্যে দিয়ে প্রথম পথ কেটে চলতে হয় তাকে অনেক দুঃখই সইতে হয় পরবর্ত্তীদের পথ সুগম করতে।"

কি অভিনব সাধনায় তিনি ৩০ বৎসরকাল পণ্ডিচারীতে আছেন। তাঁর সাধনায় মানব-প্রকৃতির কি অভিনব পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা, যাহাতে মানব-সভ্যতা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিবে। কেন এ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী তিনি তাহা বিশদভাবে সাত বৎসর "আর্য্যে"র লেখায় বুঝাইয়াছেন। আমি এই পুস্তকে তাহার কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি, সফল হইয়াছি কি না পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস শক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহার পরিচয় দিতে অক্ষম। যোগের কোন অভিজ্ঞতাই আমার নাই। শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় করিয়া হয়ত কিছু লিখিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার নিজের শক্তিতে এ কার্য্য পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় অভাবনীয়।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সাক্ষাৎ পরিচয়ও আমার কিছুই নাই। যাহারা বরোদায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন এবং সর্ব্বোপরি যাঁহারা বলিতে গেলে ৩৫ বৎসর যাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার সঙ্গে আছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনেক কিছু লিখিতে পারেন। আমি তাঁহার জীবনকাহিনীর জন্য বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পুস্তকদ্বয়ের সাহায্য লইয়াছি। শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নানা লেখার মধ্য হইতেও কিছু তথ্য পাইয়াছি। ঘটনার বিষয়ে কিছু কিছু ভুল থাকিবার কথা, যথা, লেখার পর বারীন্দ্রকুমারের আত্মজীবনীতে দেখিলাম যে তাঁহার জন্ম সাগরবক্ষে নহে—লণ্ডনের নরউড অঞ্চলে।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী লিখিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই—শুধু

উপলব্ধিব আনন্দে আমি দেশবাসীকে তাঁহাব জীবন ও যোগের কিছু পবিচয় দিতে চাহিযাছি, তাহার বিবাট সত্তাব একটু আভাস দিতে চাহিযাছি, কাবণ তাঁহাব সম্বন্ধে জনসাধাবণেব মনে দারুণ হেযালী বহিযাছে। তাঁহাব আদর্শ প্রচাব কবা আমাব উদ্দেশ্য নহে—সে আদর্শ প্রচাবেব অপেক্ষা বাখে না, কাবণ তাহা স্বযংসিদ্ধ। আব তিনিও আজন্ম আত্ম প্রচাববিবোধী। আমাবই বা কি ক্ষমতা যে তাহাকে প্রচাব কবিব? তবু হৃদযে একটা আশা যে, তিনি যে-দেশে জন্মগ্রহণ কবিযাছেন সেই দেশেব লোক তাঁহাকে ভাল কবিযা চিনুক, উপলব্ধি করুক কি বিবাট সত্তা তাহাদেব মধ্যে বিবাজ কবিতেছেন, যাহাব সাধনায আমাদেব চবম সার্থকতা লাভ কবিবাব সম্ভবনা। আরও আশা হয যে, শ্রীঅববিন্দেব অনুপম লেখাগুলি আলোচনা ও উপলব্ধি কবিবাব জন্য দেশেব সর্বত্র পাঠক-গোষ্ঠী গঠিত হইবে এবং পূর্ণযোগেব আশ্রয় গ্রহণ কবিবাব জন্য বাংলাব সাধাবণ লোকেবও ঔৎসুক্য জন্মিবে।

এই পুস্তকে আন্তর্জাতিক বাজনীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু তাহাব পিছনে কোন বাজনৈতিক মতবাদ প্রচাব কবিবাব উদ্দেশ্য নাই। বাজনীতি মানুষেব জীবনেব বহিবঙ্গ এবং তাহা নিযত পবিবর্ত্তনশীল। তবু তাহাতে মানুষেব জীবন-আদর্শের পবিচয় পাওযা যায়। এই আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীঅববিন্দ ২৫ বৎসব পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাব কিছু ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা কবিযাছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক "আর্য্যে" প্রকাশিত Psychology of Social Development ও Ideal of Human Unity পড়িযা তাহাব প্রকৃষ্ট পবিচয পাইবেন। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে শ্রীঅববিন্দ মানব-জাতির ভাবী বিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা লিখিযাছিলেন, আজ আমবা

চক্ষের সম্মুখে তাহা ঘটিতে দেখিতেছি। বর্ত্তমানে ইয়ুরোপে আবার মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, আশা হয় ইহার অবসানে মানব-আদর্শের অভিনব পরিবর্ত্তন হইবে, ন্যায়ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মানব-জাতি ঐক্যের সন্ধান পাইবে।

এই পুস্তক লেখায় এবং ইহার সুষ্ঠু রূপ দিতে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন ও উৎসাহ দিয়াছেন, তাহাদের প্রীতির প্রতিদানে লৌকিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অশোভন দেখায়।

কলিকাতা,
আশ্বিন, ১৩৪৬।

প্রমোদকুমার সেন

বিষয় সূচী

জীবন-কাহিনী :

যোগ :

প্রথম অধ্যায়

বাল্যে প্রবাসে জ্ঞানার্জ্জন

শ্রীঅরবিন্দের জীবন, তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, তাঁহার দেবতুল্য চরিত্র, তাঁহার ঈশ্বরান্বেষণা বাস্তবিক অতীব বিস্ময়কর। এমন একটী আশ্চর্য্য জীবন সচরাচর দেখা যায় না। একদিকে গভীর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ প্রতিভা, বিরাট ব্যক্তিত্ব—অপরদিকে তাঁহার জীবনের অত্যাশ্চর্য্য বিবর্ত্তন, যাহার প্রথম বিকাশ দেশমাতৃকার সেবায়, দেশকে স্বাধীন করিবার প্রচেষ্টায়, এবং যাহার পরিণতি ভগবানের পূর্ণ উপলব্ধি ও মানবজীবনের দিব্যরূপান্তরের অভিনব সাধনায়—এক জীবনে এরূপ লীলা-বৈচিত্র্য বোধ হয় আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। কবি অরবিন্দ, জ্ঞানী অরবিন্দ, শিক্ষাগুরু অরবিন্দ, দেশপ্রেমিক অরবিন্দ, মানবপ্রেমিক অরবিন্দ, যোগাচার্য্য অরবিন্দ—তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার যে-কোন দিক হইতেই তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

এরূপ জীবনকাহিনী পূর্ণভাবে বিবৃত করিবার সময় আসে নাই। ভারত হয়ত শ্রীঅরবিন্দের মহত্ত্ব কতকটা উপলব্ধি করিয়াছে, কিন্তু প্রচার-বিমুখ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ পরিচয় জগৎ এখনও পায় নাই। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিবার কাল এখনও জগতে আসে নাই। যাঁহারা গুণগ্রাহী তাঁহারা তাঁহার জীবনকথা আলোচনা করিয়া আনন্দলাভ করেন, এবং যাঁহারা সত্যই মানবপ্রেমিক তাঁহারা তাঁহার

ভাগবত সাধনা উপলব্ধি করিয়া সত্যের সন্ধানে আলোক পান। আর ভারতবাসী আমরা, আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান উপলব্ধি—শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ পরিচয় পাইয়া আমরা ভারতের বৈশিষ্ট্য, ভারতের সাধনা, ভারতের ভাবী রূপান্তর, মানব-ইতিহাস বিবর্ত্তনে ভারতের দান সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাই।

আজ শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণযোগের সাধক, সাধনা দ্বারা দিব্যজীবন লাভ করিয়াছেন; কিন্তু ভারত প্রথমে দেখিয়াছিল পণ্ডিতচূড়ামণি শ্রীঅরবিন্দকে, এবং তাহার পরে দেখিয়াছিল দেশপ্রেমিক, দেশ-মাতার পূজারী, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, জাতীয়তার উদ্বোধনকারী, কর্ম্মযোগী শ্রীঅরবিন্দের শক্তি-উদ্ভাসিত মূর্ত্তি। বাল্যে ও কৈশোরে অরবিন্দকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা বোধ হয় কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, একদিন এই জ্ঞান-তপস্বী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য অরবিন্দ রাজনীতিক নেতারূপে, স্বাধীনতার ভেরী-নিনাদকারীরূপে ভারতকে চমকিত করিবেন। তাঁহারা কি করিয়া কল্পনা করিতে পারিতেন যে, তরুণ কবি স্বপ্ন-বিলাস ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় দেশমাতাকে সেবা করিবার জন্য জীবনে রুদ্রকে বরণ করিবেন? আবার যাঁহারা রাজনীতিক নেতা অরবিন্দকে দেখিয়াছেন, তাঁহার বাণী শুনিয়া দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার প্রেরণায় জাতীয়তার প্লাবনে দেশকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, কাপুরুষতা ও ভণ্ডামির মস্তকে খড়্গাঘাত করিয়াছেন, তাঁহার সাহচর্য্যে অশেষ দুঃখ ক্লেশ বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই বা কি করিয়া কল্পনা করিতে পারিতেন যে, এই জাতীয়তার মন্ত্রদ্রষ্টা অরবিন্দ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আবার স্বেচ্ছায় অন্য এক মহান্ ব্রত গ্রহণ করিবেন?

তাঁহার জীবনে যে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহা শ্রীঅরবিন্দও বোধ হয় প্রথমে জানিতেন না। একদিন যে দিব্যের সাধনায় তিনি মগ্ন হইবেন তাহার আভাস বোধ হয় যৌবনের প্রারম্ভেও তিনি পান নাই। তিনি ভাবী জীবনে যে যোগী হইবেন, দিব্যমানবত্ব লাভ করিবেন তাহার ইঙ্গিত হয়ত পূর্ব্বে কেহই পান নাই। তাই আমরা তাঁহার জীবনের প্রারম্ভে দেখি যেন তিনি সাধাবণ মানুষ, তবে অপূর্ব্ব মেধাসম্পন্ন, পাণ্ডিত্যভূষিত, তাঁহার ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয়, হৃদয় মানব-প্রেমে ভরপূব—মহাপুরুষদিগেব জীবনে সচরাচব যেরূপ অলৌকিকত্ব দেখা যায় তাহার কোন নিদর্শনই নাই।

কিন্তু তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, সত্যকে পূর্ণভাবে জীবনে ফুটাইযা তোলার প্রেরণা কৈশোর হইতেই তাঁহাকে পরিচালিত কবিয়াছে। সত্য-লাভের প্রেরণায় তিনি লৌকিক জীবনের লাভক্ষতি কোনদিনই হিসাব করেন নাই। এই কারণেই তিনি ধন, মান বা যশের জন্য লালায়িত হন নাই, যে-কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুপম "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

"তোমা লাগি' নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—"

কৈশোর ও যৌবনে শ্রীঅরবিন্দ, কখনও স্বেচ্ছায় কখনও বিড়ম্বনায়, কি দারুণ অভাব ও দৈহিক ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন তাহা খুব অল্প লোকই জানেন। এমন কি বিলাতে পড়িবার সময়ে তাঁহার

পিতার উদাসীনতার জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে অর্দ্ধাশনে কাটাইতে হইয়াছে। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন যে, অনেকদিন এমন গিয়াছে যে তিনি দু-একখানি স্যাণ্ডউইচ খাইয়াই দিন কাটাইয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য অভিভূত হন নাই, সানন্দে পাঠাগারে পুস্তকরাশির মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দের পিতার জীবন বড়ই বিচিত্র। তাঁহার পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসভুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে মেডিক্যাল সার্ভিসের বিশেষ পদগৌরব ছিল, কিন্তু ডাঃ কৃষ্ণধন তাঁহার উদার হৃদয়ের জন্যই বিখ্যাত। দরিদ্রের দুঃখে সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত, এবং এই কারণে তাঁহার দানের কোন সীমা ছিল না। সুতরাং সময়ে সময়ে তিনি যে প্রবাসী আত্মজদিগের কথা ভুলিয়া যাইতেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এমন হইয়াছে তিনি দীর্ঘকাল শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের খরচপত্র পাঠান নাই এবং তাঁহাদিগকে ঋণের পর ঋণ করিয়া দিন কাটাইতে হইয়াছে। কিন্তু এদিকে ডাঃ কৃষ্ণধন কোন স্থান হইতে বদলি হইলে, তাঁহার সাহায্য-বঞ্চিত হইতে হইবে বলিয়া দরিদ্রগণ ক্রন্দন করিত—এমনি ছিল তাঁহার বদান্যতা।

পিতার এই ঔদার্য্য শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রে বাল্যকাল হইতে পরিস্ফুট হইয়াছে। অপরদিকে তাঁহার মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণের দেবতুল্য চরিত্রের কথা ভারতখ্যাত। রাজনারায়ণের খ্যাতি শুধু তাঁহার মহত্ত্বের জন্য নহে, তাঁহার স্বদেশপ্রেম বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁহাকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা ও সমাজ-সংস্কার তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তি নহে, জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এবং স্বদেশীর প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। রাজনারায়ণের প্রতিভা, মহত্ত্ব ও

ঋষিদৃষ্টি শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে পূর্ণভাবে বর্ত্তাইযাছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র-কুমার রায় লিখিয়াছেন যে, রাজনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া শ্রীঅরবিন্দ (তখন তিনি বরোদায় ছিলেন) বলিয়া উঠেন, "হায়, কি সর্ব্বনাশ হইল।" রাজনারায়ণের সহিত শ্রীঅরবিন্দের শুধু রক্তের সম্বন্ধ নয়, নিবিড় আধ্যাত্মিক যোগ ছিল অনুমান করা যায়।

ডাঃ কৃষ্ণধনের মেজাজ ছিল খাঁটি সাহেবী। তাঁহার সাহেবীয়ানার ঝোঁক এত বেশী ছিল যে, তিনি—বিনয়কুমার, মনোমোহন ও অরবিন্দ—তিন পুত্রের বিলাতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন সাত বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে বিলাত যান এবং সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডে জাহাজ পৌছিবার পূর্ব্বেই বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়।

বাল্যকাল হইতে বিলাতে শিক্ষা-ব্যবস্থার দুইটী ফল শ্রীঅরবিন্দের জীবনে দেখা যায়। প্রথম, শ্রীঅরবিন্দের পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত নিবিড় পরিচয়—যাহা তাঁহার অদ্ভুত মনীষা-বিকাশে সহায়তা করিয়াছে, এবং দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্যের জীবন-আদর্শের খুঁত কি ও তাহার তুলনায় ভারত ও প্রাচ্য সভ্যতার বিশেষত্ব কোথায়, তাহা নির্দ্ধারণের সুযোগ। তাঁহার জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, তাহার কারণই তাঁহার বাল্যকাল হইতে বিলাতে শিক্ষা। আর ইহার ফলেই তিনি মানব জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিবার, সকল প্রকার সংস্কারমুক্ত করিয়া মানব জীবনকে উর্দ্ধে বিবর্ত্তন করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক প্রতিভার পরিচয়ে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই দীর্ঘ পাশ্চাত্য-প্রবাস তাঁহার দৃষ্টিকে শুধু উদার ও

জ্ঞানকে ব্যাপক করে নাই, পরন্তু গভীব কবিযাছে, এবং এই কাবণেই তিনি ভাবতপ্রতিভা-বিকাশে নূতন আলোকের সন্ধান পাইযাছেন।

দীর্ঘকাল বিলাত-প্রবাসেব ফলে, শুধু পাশ্চাত্যেব শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা ও মনীষার পরিচয় নয়, পাশ্চাত্যের বাজনীতি ও সমাজনীতি শ্রীঅববিন্দ পূর্ণভাবে আয়ত্ত কবিতে পারিয়াছিলেন। শুধু বৃটেনেব বাজনীতি নয়, পৃথিবীব প্রত্যেক দেশেব বাজনীতিক বিবর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীঅববিন্দেব যে গভীর জ্ঞান দেখিযা আমবা মুগ্ধ হই, তাহাব কাবণও চৌদ্দ বৎসব যাবৎ পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা। এরূপ অভিজ্ঞতা লাভেব সুযোগ খুব কম লোকেবই জীবনে ঘটিযা থাকে।

শ্রীঅরবিন্দেব বাজনীতিক প্রতিভা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ইংবাজী "শ্রীঅববিন্দ-জীবনী"তে যে কথা লিখিযাছেন, তাহা বোধ হয অবাস্তব হইবে না। শ্রীঅববিন্দেব জন্ম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেব ১৫ই আগষ্ট। ঐ বৎসবই ফরাসী-জার্ম্মান যুদ্ধেব পরে ইউবোপে এক নূতন যুগেব আবম্ভ, যাহার পরিণতি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে।* ইটালীর জাতীয আন্দোলনেব প্রবর্ত্তক জোসেফ মাত্‌সিনীব তিবোধান হয ঐ বৎসবে। জ্যোতিষবাবু স্মরণ কবাইয়াছেন যে, মাত্‌সিনী যেমন ইটালীর বাজনীতিকে নূতন

* ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইয়োরোপীয মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয। ঐ মাসেই পণ্ডিচারী হইতে শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজী মাসিক পত্র "আর্য্য" প্রকাশ করেন। পৃথিবীতে দিব্যজীবন স্থাপনেব পথ প্রদর্শন কবা "আর্য্য"র উদ্দেশ্য ছিল। "আর্য্য"ব কতকগুলি প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ মানবজাতিব বিবর্ত্তনের যে ইঙ্গিত কবিযাছিলেন, তাহাব সার্থকতা পরবর্ত্তী কালে দেখা গিযাছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের পবিবর্ত্তন এবং মানবজাতির রাজনীতিক মৈত্রীর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তিনি যে কথা লিখিযাছিলেন, আজ সেগুলিকে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে হয।

আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তেমনি শ্রীঅরবিন্দ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন ভাবের বন্যা বহাইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ মাতসিনীকে যে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার পরিচয় ইংরাজী সাপ্তাহিক "কর্ম্মযোগিন্"-এর লেখায় পাওয়া যায়।

শ্রীঅরবিন্দের বিলাত-প্রবাসের কথা বিশেষ ভাবে জানা যায় না। তিনি নিজের কথা খুব কম লোকের কাছেই বলিয়াছেন, এবং এ পর্য্যন্ত তাহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে কেহ কিছু লিখেন নাই। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে (আর্য্য পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত), তাহাতে জানা যায় যে, তিনি প্রথমে ম্যাঞ্চেষ্টারে এক ইংরাজ পরিবারে থাকিতেন এবং সেইখানেই তাহার শিক্ষার আরম্ভ। তিনি বাল্যেই ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন এবং পরে নিজের চেষ্টায় ইটালীয় ও জার্ম্মান ভাষা এতদূর আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, ঐ দুই ভাষার অমূল্য সম্পদ দান্তে ও গ্যেটের মহাকাব্যদ্বয়ের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, মাত্র তের বৎসর বয়সে, তিনি লণ্ডনের সেণ্ট্ পল্ স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং পাঁচ বৎসর পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া কিংস্ কলেজে প্রবেশ লাভ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি কেম্ব্রিজের "ট্রাইপোজ" পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। গ্রীক ও লাতিন ভাষাদ্বয়ে তিনি এরূপ অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, কেম্ব্রিজের পরীক্ষার পূর্ব্বে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি ঐ দুই ভাষায় যত নম্বর পাইয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ তত নম্বর পান নাই। কাজেই অত অল্প বয়সে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় শিক্ষক ও সতীর্থদের তাক্ লাগিয়াছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন এবং ঐ বৎসরই কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হন। তাঁহার বয়স তখন ১৮ বৎসর মাত্র, কিন্তু সেই অল্প বয়সেই তিনি সিভিল সার্ভিসের ন্যায় দুরূহ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি গ্রীক্ ও লাতিন এই দুইটী প্রাচীন ভাষায় এত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন যে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ঐ দুই বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

সিভিল সার্ভিসে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর শিক্ষানবিশী করিবার পরেও, তিনি এক বিচিত্র কারণে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দিলেন না। ফলে সিভিল সার্ভিসে তিনি চাকুরি পাইলেন না। শ্রীঅরবিন্দের জীবনী সম্বন্ধে আর্য্য পাব্লিশিং হাউস শ্রীঅরবিন্দ-অনুমোদিত যে ক্ষুদ্র ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে :—"but at the end of two years of probation (he) failed to present himself at the riding examination and was disqualified from the Service." *

* যাঁহারা মনে করেন যে কোন দিন ঘোড়ায় চড়েন নাই বলিয়া শ্রীঅরবিন্দ ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত (অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস) লিখিত নিম্নলিখিত কাহিনী পাঠ করিয়া বুঝিবেন একেবারে অনভ্যস্ত ব্যাপারেও শ্রীঅরবিন্দ কিরূপ দক্ষতা দেখাইতে পারেন। কাহিনীটী চারুচন্দ্রের ভাষায় এই :—

"(বন্দুকটা) প্রথমবার আওয়াজ করার সময় চোখ দুটো বুজে এসেছিল, আর বন্দুকের ধাক্কায় উল্টে প'ড়ে গিয়েছিলাম। হয়ত সকলেরই এই হয়—অর্থাৎ সাধারণ লোকের। একজনের হয় নাই, জানি। বহু কালের কথা, অরবিন্দ একদিন আমার ঠানার (বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর একটী সহর) বাড়ীতে (চারুচন্দ্র

এই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা লইয়া শ্রীঅরবিন্দের পরবর্ত্তী জীবনে আর এক অভিনব ব্যাপার ঘটিয়াছিল। যে বৎসর তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই বৎসর বীচক্রফট্ নামক এক ইংরাজ যুবকও কৃতকার্য্য হন। ইয়ুরোপীয় প্রাচীন ভাষাদ্বয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম স্থান অধিকার করেন, আর বীচক্রফ্ট হন দ্বিতীয়। আঠার বৎসর পরে আলিপুরের বোমার মামলায় দেখা গেল যে, শ্রীঅরবিন্দ আসামীর কাঠগড়ায়, আর বিচারকের আসনে বীচ্-ক্রফট। যাহা হউক, বিচারপতির সুবিচারে তাহার মনীষী সতীর্থ সসম্মানে মুক্তিলাভ করিলেন।

যদি শ্রীঅরবিন্দ সিভিল সার্ভিসে চাকুরি পাইতেন, তাহা হইলে হয়ত হাইকোর্টের জজ বা বড়লাটের সচিব হইয়া নানা খেতাবভূষিত হইতেন এবং এতদিনে মোটা পেন্সন লইয়া হোমরাচোমরা মডারেট নেতাও হয়ত হইতেন। কিন্তু বিধির বিধানে পেন্সন ভোগ তাঁহার ভাগ্যে নাই। তাহার ভাগ্যে আছে লোকগুরুরূপে অবিরাম কার্য্য—বিনিদ্র সাধনা।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানাস্থানে জজিয়তি ও ম্যাজিষ্টেটগিরি করিয়াছেন) এসে উপস্থিত হলেন। সেদিন ভয়ানক বৃষ্টি হ'চ্ছে বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। আমরা একটা ছোট রাইফেল নিয়ে বারান্দায় আমোদ করছিলাম। অরবিন্দকে কেউ বললেন, 'আসুন ঘোষ সাহেব আপনিও একবার।' তিনি প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না কখনও বন্দুক হাতে করি নাই ইত্যাদি নানা ওজর দেখাচ্ছিলেন। আমরাও নাছোড়বান্দা। শেষে বন্দুক ধরলেন। সামান্য একটু দেখিয়ে দিতে হ'ল কি ক'রে নিশানা করতে হয়। তারপরে বারবার লক্ষ্যভেদ করতে লাগলেন। লক্ষ্য ছিল পাকবে বাল দিই দেশলাই কাঠির ছোট্ট মাথাটা। ওরকম লোকের যোগসিদ্ধি হবে না ত কি তোমার আমার হবে।" —"পুরাণো কথা", ৫৮-৫০ পৃষ্ঠা।

তাঁহার উদার দৃষ্টি শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকিবে কি করিয়া? তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্জ্জিত হয় নাই; তাহা হইয়াছে জ্ঞানসম্পদের সমৃদ্ধির, বিশ্বমঙ্গলের, মানবজাতির ভাবী রূপান্তরের ভিত্তি। তাই কর্ম্মজীবনে এমন অবস্থান্তর ঘটিল যে, যেন জ্ঞানমণ্ডলের একখণ্ড পরিক্রম করিয়া তিনি অপর খণ্ডে নিবিষ্ট হইলেন। তিনি পাশ্চাত্যকে চিনিয়াছিলেন—তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, রাজনীতি, সমাজনীতি সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ইয়ুরোপের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিলেন—এবার তাঁহার স্বদেশকে চিনিবার, জানিবার, স্বর্গাদপি গরীয়সীরূপে উপলব্ধি করিবার, এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহাকে সেবা করিবার সুযোগ আসিল।

দেশের ছেলে দেশে ফিরিলেন, কিন্তু সাহেব হইয়া আসিলেন না—যদিও তিনি মাতৃভাষায় একটী কথাও বলিতে পারিতেন না। তখন তাঁহার পিতা পরলোকে, মাতার দেহ ও মন সুস্থ ছিল না, কিন্তু মাতামহ রাজনারায়ণের প্রাণের আশা পূর্ণ করিয়া তিনি দেশমাতার ক্রোড়ে আসিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ দেখিলেন যে, বালক অরবিন্দ হইয়াছেন শান্ত, সৌম্য, পাণ্ডিত্যের প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিভাবান অরবিন্দ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বরোদায় শিক্ষাব্রত

বিলাতে যখন শ্রীঅরবিন্দেব শিক্ষা সমাপ্ত হয় সেই সময় বরোদার গায়কোয়াড * লণ্ডনে ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিলে গায়কোয়াড তাঁহাকে বরোদা সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করেন। প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজও তাঁহাকে কিছু কিছু করিতে হইত। কিছুকাল ঐভাবে কাজ করিবার পর তিনি বরোদার শিক্ষাবিভাগে যোগদান করিয়া লইলেন শিক্ষাব্রত। এই ব্রতের দুইটী দিক ছিল। একদিকে তিনি ছাত্রদিগকে ইংরাজী-সাহিত্য শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। যেমন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রগণ শ্রীঅরবিন্দেব মধ্যমাগ্রজ সুপণ্ডিত মনোমোহনের অগাধ পাণ্ডিত্যেব পরিচয় পাইয়াছিল, তেমনি বরোদা কলেজের ছাত্রগণ শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাপনায় মুগ্ধ হইত। অপরপক্ষে সুদূর বরোদায়, আত্মীয় স্বজনবিহীন নির্জ্জনতায় শ্রীঅরবিন্দের নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিবার চমৎকার সুযোগ ঘটিল।

বিলাতে থাকিবার সময়েই তিনি প্রাচ্যবিদ্যার্ণবের মহিমা কিছু আস্বাদন করিয়াছিলেন, তের বৎসর বরোদার নির্জ্জনতায় তিনি এই জ্ঞানসাগরে অমূল্য রত্নের সন্ধানে পূর্ণভাবে মগ্ন রহিলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তিনি ভারতীয় কাব্য, সাহিত্য,

* ইনি ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পরলোকে গিয়াছেন।

দর্শনগ্রন্থরাজি ও ধর্ম্মপুস্তকগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত, বাংলা ও অপর কয়েকটী ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি ভারতের সনাতন সত্তা উপলব্ধি করিলেন, বর্ত্তমান যুগের ভারতেরও পরিচয় লইলেন। এদেশের লোক হইয়াও এতদিন যেন ছিলেন তিনি বিদেশী, এইবার হইলেন খাঁটি স্বদেশী। আমরা "আর্য্য"র পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে ভারতীয় দর্শনে তাঁহার পাণ্ডিত্যের যে অভিব্যক্তি দেখিয়া মোহিত হই, তাহার প্রতিষ্ঠা তাঁহার বরোদায় দীর্ঘ সাধনায়। প্রাচীন ইয়ুরোপীয় ভাষা সমূহে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় ভারত পায় নাই, কিন্তু বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধরাজি ভারতের অমূল্য সম্পদ। "আর্য্যে" প্রকাশিত তাঁহার সব লেখাগুলি এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, কিন্তু সামান্য যে কয়েকখানি ছাপা হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া শুধু এদেশের নয়, বিদেশেরও সুধীবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছেন :

শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা শিখাইবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় কয়েক বৎসর বরোদায় ছিলেন এবং সেই সুযোগে তিনি শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান-তপস্যা দেখিয়াছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার "অরবিন্দ-প্রসঙ্গ" নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : "এমন অদ্ভুত পাঠানুরাগ আমি আর দেখি নাই।……অরবিন্দের পুস্তক কদাচিৎ 'বুকপোষ্টে' আসিত ; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-বাক্সে বোঝাই হইয়া 'রেল পার্শ্বেলে' পুস্তকগুলি আসিত ; এমন পার্শ্বেল মাসে দুই তিনবারও আসিত। অরবিন্দ সেই সকল কেতাব আট দশ দিনের মধ্যে পড়িয়া ফেলিতেন। আবার নূতন নূতন পুস্তকের অর্ডার যাইত।"

আর একস্থলে দীনেন্দ্রকুমার লিখিযাছেন, "আমি যে সময়ে ববোদায় ছিলাম সে সময়েও অরবিন্দ অনেক টাকা বেতন পাইতেন। তিনি একা মানুষ, বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না; তথাপি মাসের শেষে তাঁহার হাতে এক পয়সাও থাকিত না। অনেক সময় তাঁহাকে জনৈক বন্ধুর নিকট টাকা ধার কবিতে দেখিয়াছি।"

শ্রীঅরবিন্দ বরোদার যে একটী বাসায় থাকিতেন (সরকার হইতে বন্দোবস্ত করা হইযাছিল) তাহার নানা অসুবিধা উল্লেখ করিয়া দীনেন্দ্রকুমাব লিখিয়াছেন, "এমন কদর্য্য গৃহে বাস কবিতে অরবিন্দের বিন্দুমাত্র আপত্তি বা কুণ্ঠা দেখি নাই। তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে দীর্ঘকাল সেই জীর্ণ গৃহে বাস কবিয়াছিলেন। অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত দুঃসহ মশক-দংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলেব ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, 'জুয়েল ল্যাম্পে'র আলোকে সাহিত্যালোচনা কবিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় একই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম—যোগনিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঘরে আগুন লাগিলেও বোধ হয় তাঁহার হুঁস হইত না। তিনি এই ভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইয়ুরোপের নানা ভাষায় কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইয়ুরোপের নানা ভাষায় গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্ম্মান, রাশিয়ান, ইংরাজী, গ্রীক, লাতিন, প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না। চসার হইতে সুইন্‌বর্ণ্ পর্য্যন্ত সকল ইংরাজ কবির কাব্যগ্রন্থ তাঁহার পাঠাগারে সঞ্চিত ছিল। অসংখ্য ইংরাজী উপন্যাস আল্‌মারীতে, গৃহকোণে,

ষ্টিলট্রাঙ্কে পুঞ্জীভূত ছিল। হোমারের ইলিযাদ, দান্তের মহাকাব্য, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল।”

ইহাতেই বুঝা যায যে, শ্রীঅরবিন্দ শুধু ভারতীয় শাস্ত্র, দর্শন, কাব্যাদি পাঠে নিমগ্ন ছিলেন না, তিনি আধুনিক ইয়ুরোপীয় সাহিত্য, কাব্য এবং দর্শনেরও সমানভাবে চর্চ্চা করিতেন। শ্রীঅরবিন্দ জন্মকবি—চৌদ্দ বৎসর বয়সে লেখা তাঁহার একটী ইংরাজী কবিতা প্রকাশিত হইযাছে। বরোদা প্রবাসে শ্রীঅরবিন্দের কাব্যচর্চ্চার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। দীনেন্দ্রকুমার লিখিযাছেন যে, এক সময়ে শ্রীঅরবিন্দ মহাভারতের এক একটী উপাখ্যান অবলম্বন করিযা ইংরাজীর নানা ছন্দে কবিতা লিখিতেন। তাঁহাব এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় নাই। ইংবাজি “কর্ম্মযোগিনে” তাঁহাব যে কয়েকটী কবিতা প্রকাশিত হইযাছিল (তাহার অধিকাংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে), তাহা পাঠ করিযা আমরা তাঁহার কাব্যমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারি। বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দ যখন গ্রেপ্তার হন, সেই সময়ে খানাতল্লাসীর ফলে তাঁহার অনেকগুলি কবিতা নিশ্চয়ই খোয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে তিনি “কারাকাহিনী”তে লিখিয়াছেন, “বাক্সের ভিতরে বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজেব টুক্‌রা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা পাওয়া যায কিছুই এই সর্ব্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি পায না।” এই প্রকারেই বোধ হয় তাঁহার বরোদায় সাহিত্যসৃষ্টির অমূল্য রত্নগুলি লুপ্ত হইযাছে।

বরোদা-প্রবাসের পর শ্রীঅরবিন্দ বোধ হয় আর ঐকান্তিক ভাবে সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু

পণ্ডিচারীতে সুদীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি আধুনিক দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সহিত কি নিবিড় পরিচয় রাখিয়াছেন, তাহার অনুপম নিদর্শন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্রাবলীতে* পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে "আর্য্যে"র বিভিন্ন সংখ্যায় তিনি সাহিত্যবিষয়ক কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কিন্তু যৌগিক সাধনার জন্য সাহিত্য-সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন নাই। কাজেই বলা যায় যে, বরোদার তের বৎসরের প্রবাস তাঁহার সাহিত্য সাধনার স্বর্ণ-যুগ।

শ্রীঅরবিন্দের কবি প্রতিভা সম্বন্ধে দীনেন্দ্রকুমার-লিখিত এই কাহিনীটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন: "স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনারী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে কি পরে ঠিক আমার স্মরণ নাই—বোধ হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষে, মহারাজের নিমন্ত্রণে বরোদায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। অরবিন্দের সহিত স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু তিনি অরবিন্দের কবি-প্রতিভার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহার কিছু কিছু পরিচয়ও পাইয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় তৎপূর্ব্বে বিলাতে রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারতের স্থান বিশেষের অনুবাদ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাহা দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, দত্ত মহাশয় ইংরাজী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী রচনা

* "অনামী" ও "সূর্য্যমুখী"তে কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেক প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখকের রচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, এবং গদ্যে, পদ্যে, উপন্যাসে, কাব্যে তাঁহার সমান কলম চলিত। সুতরাং দত্ত মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অরবিন্দের কবিতাগুলি দেখিতে চাহিলে, অরবিন্দ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবেই তাঁহাকে তাহা দেখাইয়াছিলেন। অরবিন্দের কবিতাগুলি পাঠ করিয়া গুণগ্রাহী দত্ত মহাশয় এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমার এই সব কবিতা দেখিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে আমি কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছি ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে। তোমার এই কবিতাগুলি আগে দেখিলে আমি আমার লেখা কখনই ছাপাইতাম না। এখন মনে হইতেছে, আমি ছেলেখেলা করিয়াছি।'—অথচ দত্ত মহাশয়ের সেই রামায়ণ ও মহাভারতের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনায় ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিকের স্তম্ভ পূর্ণ হইয়াছিল।"

অতঃপর দীনেন্দ্রকুমার লিখিতেছেন, "দত্ত মহাশয়ের এই প্রশংসাতেও অরবিন্দকে কিছুমাত্র হর্ষোৎফুল্ল দেখি নাই। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, নিন্দা প্রশংসায় অরবিন্দ চিরদিন সমান নির্ব্বিকার।" শ্রীঅরবিন্দের এই যশোবিমুখতার জন্যই তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্যসৃষ্টি জনসাধারণের অগোচরে রহিয়া গিয়াছে। সেগুলির অবস্থা হইয়াছে যেন—

"যে ফুল ফুটিল বারেক কুঞ্জ 'পরে
ঝ'রে গেল ম'রে গেল সে চিরতরে!"

সত্যই খানাতল্লাসীর ঝড়ো হাওয়ায় সেই সাহিত্য-কুসুমগুলি অনন্তে মিলাইয়া গিয়াছে!

দীনেন্দ্রকুমার জ্ঞান-তপস্বী অরবিন্দের মূর্ত্তিটী বড় সুন্দররূপে ফুটাইয়াছেন। যাহারা রাজনীতিক নেতা বা যোগী অরবিন্দের মূর্ত্তি

দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহার জ্ঞান-তপস্যারত এই মূর্ত্তি বড়ই মধুর লাগিবে। সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীঅরবিন্দকে প্রথম দর্শন করিয়া দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন ঃ—

"অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম। তখন কে ভাবিয়াছিল যে, পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগ্‌রা জুতা, পরিধানে আহ্‌মাদাবাদ মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা খাদি, গায়ে আঁটা মেরজাই, মাথায় লম্বা-লম্বা গ্রীবাবিলম্বিত বাব্‌রীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ, ক্ষীণদেহধারী এই যুবক ইংরাজী, ফরাসী, লাতিন, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান্ অরবিন্দ ঘোষ। দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত 'ঐ হিমালয়' তাহা হইলেও বোধ হয় ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না! যাহা হউক, দুই একদিনের ব্যবহারেই বুঝিলাম অরবিন্দের হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নাই। তাঁহার হাসি শিশুর মত সরল, তরল ও সুকোমল। হৃদয়ের অটল সঙ্কল্প ওষ্ঠপ্রান্তে আত্মপ্রকাশ করিলেও, মানবদুঃখে আত্মবিসর্জ্জনের দেবদুর্লভ আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন সে হৃদয়ে পার্থিব উচ্চাভিলাষের বা মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই।...... দিবারাত্র একত্র বাস করিয়া ক্রমে যতই অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম, অরবিন্দ এ পৃথিবীর মানুষ নহেন, অরবিন্দ শাপভ্রষ্ট দেবতা।"

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শীতের প্রারম্ভে দীনেন্দ্রকুমার, শ্রীঅরবিন্দের মাতুল স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসুর (ঋষি রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র) অনুরোধে তাঁহাকে বাংলা শিখাইবার জন্য বরোদায় যান। ১৯১৮

খৃষ্টাব্দে ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রিকায় দীনেন্দ্রকুমারের "অরবিন্দ-প্রসঙ্গ" প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দেই —বাংলা ও ভারত তাঁহাকে চিনিবার বহু পূর্ব্বে—দীনেন্দ্রকুমার বুঝিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর মানুষ নহেন। উক্ত পুস্তকে দীনেন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রের কয়েকটী খুঁটিনাটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলে বহুলোকও সে পরিচয় পাইয়াছেন।

দীনেন্দ্রকুমারের পুস্তক পাঠে আমরা জানিতে পারি শ্রীঅরবিন্দ মাতা ও ভগিনীকে (শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ) নিয়মিত টাকা পাঠাইতেন, আত্মীয়স্বজনদিগেব সহিত মাঝে মাঝে পত্র ব্যবহার কবিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত বিশেষ মাখামাখি ছিল না। শ্রীঅরবিন্দের এক কাকা ভাগলপুরে ছিলেন, শ্রীঅববিন্দ একবার তাঁহার নিকট গিযাছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সংস্রব ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়কুমার কুচবিহারের রাজদরবাবে চাকুরী করিতেন এবং মধ্যম সহোদর ছাত্রপ্রিয় মনোমোহন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। বিনয়কুমার এখনও জীবিত আছেন, মনোমোহন পরলোকে গিয়াছেন। কনিষ্ঠ বারীন্দ্রকুমারের লেখায় জানা যায যে, তিনি কয়েকবার বরোদায় গিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দেব বিবাহ হইলে তাঁহাব পত্নী ও ভগিনী মাঝে মাঝে বরোদায় থাকিতেন। দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন যে, মাতুলবংশের আত্মীয়স্বজনের সহিত শ্রীঅরবিন্দের অনেকটা আন্তরিক নৈকট্য ছিল। শ্রীঅরবিন্দ মাতার সহিত অতি অল্পকাল বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু

দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন, "মায়ের প্রতি অরবিন্দের অসাধারণ ভক্তির পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।"

শ্রীঅরবিন্দ কোনদিনই সংসারে লিপ্ত হন নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তিনি সাধনার সাথী বলিয়া মনে করিতেন। বরোদায় থাকিবার সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, মৃণালিনী, ছিলেন ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা। ভূপালবাবু বঙ্গীয় কৃষিবিভাগে উচ্চপদে কার্য্য করিতেন। তাহার ন্যায় সরল, অমায়িক, উদার-হৃদয়, বিদ্যানুরাগী লোক খুব কম দেখা যায়।* শেষ জীবনে তিনি রাঁচি থাকিতেন এবং কয়েকবার শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করিতে পণ্ডিচারী গিয়াছিলেন।

দীনেন্দ্রকুমারের পুস্তকপাঠে আমরা জানিতে পারি শ্রীঅরবিন্দ সাংসারিক ব্যাপারে কিরূপ উদাসীন ছিলেন। পরিজনদিগের শত ত্রুটীতেও কখনই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না। মানুষের দোষত্রুটীতে ঔদার্য্যের হাসি হাসাই শ্রীঅরবিন্দের চিরকালের স্বভাব। নিজের ব্যাপারে তিনি কিরূপ উদাসীন ছিলেন তাহার ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন, "অরবিন্দ বলিতেন, নিজের কথা যত কম প্রকাশ করা যায় ততই ভাল। এই জন্যই বোধ হয় তিনি কথাও কম বলিতেন।" অশনে, বসনে, ব্যবহারে কোন দিনই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন নাই, নিজের বলিয়া কোন জিনিষের বাসনাও কোনদিন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

অথচ বরোদায় তিনি যে বেতন পাইতেন (প্রায় সহস্র মুদ্রা) তাহাতে একক জীবনে যথেষ্ট বিলাসিতা করিতে পারিতেন।

* ভূপালবাবু পরলোকে গমন করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে লেখকের একবার তাঁহার পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

কিন্তু বিলাসিতা দূরের কথা, তিনি জীবন যাপন করিতেন অতি সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়। বাস্তবপক্ষে তিনি সংসার ত্যাগ না করিয়াও আজীবন সন্ন্যাসী। দীনেন্দ্রকুমারের লেখায় আমরা তাহার সম্যক্ পরিচয় পাই। দীনেন্দ্রকুমার দেখিয়াছেন—

"অরবিন্দ কখনও সাজ-পোষাকের পক্ষপাতী ছিলেন না, বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না; এমন কি রাজদরবারে যাইবার সময়েও তাঁহাকে সাধারণ পরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে দেখি নাই। মূল্যবান জুতা, জামা, টাই, কলার, ফ্লানেল, লিনেন, পঞ্চাশ রকম আকারের কোট, হ্যাট, ক্যাপ্—এ সকল তাঁহার কিছুই ছিল না। কোন দিন তাঁহাকে হ্যাট ব্যবহার করিতে দেখি নাই। যে টুপিগুলি এদেশে 'পিরালী টুপি' নামে সাধারণতঃ পরিচিত, তিনি তাহাই ব্যবহার করিতেন।

"তাঁহার শয্যাও তাঁহার পরিচ্ছদের ন্যায় নিতান্ত সাধারণ ও আড়ম্বরবিহীন ছিল। তিনি যে লৌহখট্টায় শয়ন করিতেন, ত্রিশ টাকা বেতনভোগী কেরাণীও সে খট্টায় শয়ন করা অগৌরবের বিষয় মনে করে। কোমল ও স্থূল শয্যায় শয়নে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। বরোদা মরুসন্নিহিত স্থান বলিয়া সেখানে শীতগ্রীষ্ম উভয়ই অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু মাঘমাসের শীতেও অরবিন্দকে কোন দিন লেপ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। 'কম্বলবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'—অরবিন্দ অল্প মূল্যের সাধারণ কম্বলে লেপের অভাব পূর্ণ করিতেন। পাঁচ সাত টাকা মূল্যের একখানি নীল আলোয়ান তাঁহার শীতবস্ত্র ছিল। যতদিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যনিরত, পরদুঃখকাতর, আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইত না; যেন জ্ঞানসঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত।

এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কর্ম্মকোলাহল মুখরিত সংসারে থাকিয়াও যেন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন।"

মনে হয়, ভাবী জীবনে আরও কঠোর ক্লেশ ভোগ করিবেন বলিয়াই যেন শ্রীঅরবিন্দ স্বেচ্ছায় এই দুঃখ-ব্রত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং এই কারণেই দশ বৎসর পরে জেলে বাস করিবার সময়ে অম্লানবদনে অসহনীয় অবস্থায়ও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

দীনেন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের এই প্রচ্ছন্ন তপস্যা সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন:—"অরবিন্দ অত্যন্ত অল্পাহারী ছিলেন। অল্পাহারী ও মিতাচারী ছিলেন বলিয়াই গুরুতর মানসিক পরিশ্রমেও তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বাস্থ্যের দিকে তাঁহার লক্ষ্যও ছিল। ব্যায়ামে তাঁহার অনুরাগ ছিল না, তবে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায় একঘণ্টা বারান্দায় দ্রুত পায়চারী করিতেন।

"অরবিন্দের একখানি 'ভিক্টোরিয়া' গাড়ী ছিল। ঘোড়াটা খুব বড, কিন্তু চলনে গাধার দাদা। চাবুকেও তাহার গতিবৃদ্ধি হইত না। গাড়ীখানি যে কতকালের তাহা কেহ বলিতে পারিত না। অরবিন্দের সকলই বিচিত্র। যেমন পোষাক পরিচ্ছদ, তেমনি গাড়ী, তেমনি বাড়ী! অথচ যে টাকা তাহার বাড়ীভাড়া লাগিত, সেই টাকাতে কলিকাতাতেও ভাল বাড়ী পাওয়া যায়। সংসার-বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় সকলেই তাঁহাকে ঠকাইত। অর্থে যাঁহার মমতা নাই, ঠকিয়াও তাঁহার অনুতপ্ত হইবার অবকাশ নাই।"

বরোদার মহারাজার সহিত শ্রীঅরবিন্দের খুব হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তিনি নিজের পদোন্নতির জন্য বা অন্য কাহারও চাকুরি বা সুখসুবিধা করিয়া দিবার জন্য কখনও কোনরূপ চেষ্টা করেন

নাই। দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন, "আমার মনে হইত, অরবিন্দকে মহারাজের কিছুই অদেয় ছিল না। আমি একদিন কথাপ্রসঙ্গে অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম, 'এখানে দেখিতেছি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অনেক, তাঁহাদেব মানসম্ভ্রমও অসাধারণ; আপনি একটু চেষ্টা করিলেই এইরূপ মানসম্ভ্রমের অধিকারী হইতে পারেন, কত লোক তেলেব ভাঁড লইয়া আপনার দরজায় ঘুরিয়া বেড়ায়! তাহা না কবিয়া, আপনি সম্ভ্রান্ত সমাজের উপেক্ষা সঞ্চয় করিয়া এভাবে একধারে পডিযা আছেন কেন?' অববিন্দ হাসিয়া বলিযাছিলেন, 'মানসম্ভ্রম, ক্ষমতা, প্রতিপত্তিতেই যে সকলে সুখ পায়, এমন নহে; কতকগুলা স্বার্থপর মূর্খেব তোষামোদে কি কোন আনন্দ পাওয়া যায়?' কেবল মূর্খের তোষামোদ নহে, পণ্ডিতব্যক্তিব প্রাণখোলা প্রশংসাতেও অরবিন্দকে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে দেখি নাই।"

দীনেন্দ্রকুমার আরও লিখিয়াছেন, "মহারাজাও অরবিন্দকে চিনিতেন, তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতেন; বুঝিতেন তাঁহার সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মশালায় মাসিক দুইতিন হাজার টাকা বেতনের স্থূলোদর কর্ম্মচাবী অনেক আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় অরবিন্দ সেখানে নাই।"

মহারাজা সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দের ধারণা অতি উচ্চ ছিল। "অববিন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন," দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান মহারাজা একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনের যোগ্যপাত্র। তাঁহার ন্যায় 'পলিটিসিযান' সমগ্র ভারতে দুর্লভ।" সত্যই গায়কোয়াড় সমগ্র ভারতে কিরূপ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর ভাল করিয়া বুঝা গিয়াছে। তাঁহারই নীতির ফলে আজ ববোদা প্রগতিশীল দেশীয় র'জ্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অথচ শ্রীঅরবিন্দ রাজকার্য্য করিলেও কোনদিনই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। এ সম্বন্ধে দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন, "দেখিতাম, এক একদিন সকালে বা বিকালে এক একজন অশ্বারোহী তুরুক্-সোয়ার 'লক্ষ্মীবিলাস' প্রাসাদ হইতে মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্র লইয়া অরবিন্দের নিকট উপস্থিত হইত। প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় কোন দিন লিখিতেন, 'আজ আপনি মহারাজের সহিত 'ডিনারে' যোগদান করিলে তিনি বড়ই আপ্যায়িত হইবেন।' না হয় লিখিতেন, 'মহারাজের সহিত অমুক সময় একবার আপনার কি সাক্ষাতের অবসর হইবে?'—ইত্যাদি। সময়ের অভাববশতঃ কখনও কখনও মহারাজের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এমনও দেখিয়াছি। কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহারাজের সহিত একবার সাক্ষাতের জন্য মাসের পর মাস উমেদারী করিয়া বেড়াইতেন, আর সামান্য 'স্কুল মাষ্টার' অরবিন্দ মহারাজের প্রসাদ অপেক্ষা কর্ত্তব্যকে অনেক অধিক মূল্যবান মনে করিতেন।"

বরোদায় কর্ম্মজীবনে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে সেটেল্‌মেণ্ট ও পরে রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঐরূপ কার্য্য তাঁহার প্রকৃতির অনুকূল নহে বলিয়াই বোধ হয় তিনি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন এবং পরে কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। বরোদার ছাত্র-সমাজে তিনি ঐকান্তিক ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিলেও মহারাজা প্রায়ই রাজকার্য্যে শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং তিনি বরোদা ত্যাগ না করিলে বহুপূর্ব্বেই যে দেওয়ান হইতেন তাহা বেশ বুঝা যায়। সিভিল

সার্ভিসে চাকুরি না লইয়া তিনি যেমন কোন দিন ক্ষুব্ধ হন নাই, তেমনি তিনি দেশের আহ্বানে বিনা দ্বিধায় পদগৌরব ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছিলেন। দেশের জন্য মহান্ ত্যাগের আদর্শ শ্রীঅরবিন্দই প্রথম দেখাইয়াছেন।

অধ্যাপকরূপে শ্রীঅরবিন্দ যে শুধু ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি বরোদায় অবস্থান কালে মারাঠা জাতির মধ্যে জাতীয় প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরণায়ই মহারাষ্ট্রের সহিত বাংলার রাজনীতিক আদর্শের ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত ভাবেও মহারাষ্ট্রকেশরী লোকমান্য তিলকের সহিত তাঁহার যে নিবিড় আদর্শগত ও প্রাণের যোগ হইয়াছিল এমন বোধ হয় আর কাহারও সহিত হয় নাই, এবং রাজনীতিক্ষেত্রে উভয়ের সহযোগিতা জাতীয় ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ যাহার তাহার সহিত মেলামেশা করিতে ভালবাসিতেন না, এই জন্যই বরোদার জনসাধারণ তাঁহাকে লইয়া হৈ চৈ করিবার সুযোগ পায় নাই। অথচ সেখানে সকলেই তাঁহাকে জানিত এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন যে, বরোদায় যে দুই চারিজনের সহিত শ্রীঅরবিন্দের বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তেমন বন্ধুত্ব পৃথিবীতে দুর্লভ। শ্রীঅরবিন্দ বাংলার ন্যায় যত্নপূর্ব্বক মারাঠা ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং ঐ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। মারাঠা ভাষার অপভ্রংশ 'মোরি' ভাষা শিক্ষায় তাঁহার কত না আগ্রহ ছিল!

ঐকান্তিকতার সহিত তিনি বাংলাও শিখিয়াছিলেন, এবং এই কারণে বাল্যকালে বাংলার কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকায়ও পরে

নিপুণতার সহিত বাংলা লিখিয়াছেন—যাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাঁহার "ধর্ম্ম" সাপ্তাহিক-সম্পাদনে। তাঁহার দার্শনিক ও রাজনীতিক বাংলা লেখাগুলি শুধু গাম্ভীর্য্যপূর্ণ নয়, তাহাতে যথেষ্ট মধুর হাস্যরসও পরিবেশণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অতীত ও বর্ত্তমান ব্যবধানের উপর সুবর্ণ-সেতু। তিনি ইংরাজীতে একটী 'সনেট' লিখিয়া বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে "বন্দে মাতরম্" সংবাদপত্রে বঙ্কিম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্কিম মহিমামণ্ডিত হইয়াছেন। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধগুলি পড়িয়া তিনি বড়ই আনন্দ পাইতেন এবং দীনেন্দ্রকুমারকে বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর ভাষায় যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, ভাষার ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীও তিনি পাঠ করিতেন এবং তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের জন্য নিয়মিতভাবে কলিকাতা হইতে বাংলা পুস্তক আনাইতেন।

দীনেন্দ্রকুমারের নিকট বাংলা শিখিয়াই তাঁহার তৃপ্তি ছিল না, দীনেন্দ্রকুমারকেও ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষা শিখাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিচিত ও সহকর্ম্মীদের সহিত এইরূপ একান্ত আপনজনের মত ব্যবহারে শ্রীঅরবিন্দের সহিত বহু লোকের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে, যাহার স্মৃতিমাধুর্য্য আজও তাঁহারা উপভোগ করেন।

এইরূপে তের বৎসর বরোদায় জ্ঞান-তপস্যা সাঙ্গ করিয়া, দেশমাতৃকার আহ্বানে শ্রীঅরবিন্দ বাঙ্গলার কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ

করিলেন। এতদিন ভারত বা বাংলা তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিত না, জনসাধারণের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না, কিন্তু অচিরেই তাঁহার গৌরবচ্ছটা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। প্রাতঃসূর্য্য যেন মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল, সহসা মধ্যাহ্ন গগনে বিকশিত হইয়া দশ দিক উদ্ভাসিত করিল! বরোদায় আসিয়াছিলেন শান্ত, সৌম্য আচার্য্য অরবিন্দ; জ্ঞান-যজ্ঞের বেদীতে ধ্যানমগ্ন হইয়া ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর পরে সেই তপঃশক্তির বিকাশ হইল। তখন শক্তিমন্ত্রে দেশকে প্রবুদ্ধ করিতে আসিলেন তেজোদ্দীপ্ত, স্বাধীনতা যজ্ঞের পুরোহিত অরবিন্দ। দেশমাতৃকাকে তিনি আবাহন করিলেন—সহস্র কণ্ঠে দেশমাতার জয়ধ্বনির সহিত তাঁহারও জয়ধ্বনি উঠিল।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার কার্য্য ত্যাগ করিয়া বাংলায় আসেন। তাঁহার বয়স তখন ৩৪ বৎসর। সেই সময়ে বাংলায় রাজনীতিক আন্দোলনের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, তাহার ঢেউ সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিক্ষোভে সমস্ত দেশ টলমল। কিন্তু ইহা নিছক রাজনীতিক আন্দোলন নয়, ইহা সুপ্ত জাতির পুনর্জাগরণ—ইহার ভিতর ছিল জাতীয় আত্মোদ্বোধনের অমোঘ ইঙ্গিত। জাতি আর 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইয়া থাকিতে চাহিতেছিল না, চাহিতেছিল সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে। আজ আমরা সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা-লাভের যে অদম্য চেষ্টা দেখিতেছি তাহার স্ফুরণ বাংলার এই জাতীয় আন্দোলনে।

ইহার অবশ্যম্ভাবিতা শ্রীঅরবিন্দ বহুপূর্ব্বেই অনুভব করিয়া-ছিলেন এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে ইহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার বরোদা-জীবন আলোচনা করিবার সময়ে আমরা তাঁহার দেশাত্মবোধের সাধনার কথা উল্লেখ করি নাই, জ্ঞান-তপস্যার কথা বলিয়াছি—কিন্তু তাঁহার শিক্ষা ও সাধনা যে অলক্ষ্যে এক মহান্ আদর্শে নিযোজিত হইতেছিল তাহার ইঙ্গিত পাইয়াছি। যদি তাঁহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ হইত তাহা হইলে তিনি নিরুপদ্রব

অধ্যাপকের জীবন যাপন করিয়া তৃপ্ত থাকিতেন, হয়ত কতকগুলি মূল্যবান পুস্তক লিখিয়া জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেন। কিন্তু তাঁহার সাধনা তাঁহাকে অন্যপথে লইয়া যাইতেছিল—মানব-মুক্তির সাধকরূপে তাঁহাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যে যাইতেই হইবে!

বাল্যকাল হইতেই বিভিন্ন জাতির সভ্যতার ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক বিবর্ত্তন আলোচনা করিয়া, তিনি ভারতের অবনতির মূলকারণ অনুসন্ধানে বহুকাল ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে ভারতের বিশেষত্ব কি এবং কি করিয়া তাহার সম্যক্ অভিব্যক্তি হইতে পারে, সে বিষয়েও তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। ভারতে ফিরিয়া তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও তাহার তদানীন্তন নেতৃবর্গের কার্য্যকলাপ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন যে, বরোদায় কার্য্য করিবার প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ বোম্বায়ের "ইন্দুপ্রকাশ" নামক পত্রিকায় কংগ্রেসের কতকগুলি দোষত্রুটী প্রদর্শন করিয়া কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেস-নেতাগণ তাঁহার অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরে মহামতি রাণাডের সহিত শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং দীনেন্দ্রকুমার শুনিয়াছেন এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনাও হইয়াছিল। রাণাডে তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই, তবে এইরূপ সমালোচনায় কংগ্রেসের ক্ষতি হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি শ্রীঅরবিন্দকে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ লিখিতে বিরত হইতে বলেন। শ্রীঅরবিন্দ রাণাডের এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ "কারাকাহিনী"তে, অন্য এক প্রসঙ্গে নিজেই লিখিয়াছেন, "মনে পড়ে, আমি পনের বৎসর আগে বিলাত হইতে দেশে আসিয়া যখন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায় কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিযাছিলাম, তখন স্বর্গগত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যুবকদের মনে এই প্রবন্ধগুলির ফল হইতেছে দেখিযা তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবা-মাত্র আমাকে অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত এই কার্য্য পরিত্যাগ করিযা কংগ্রেসের কোন কার্য্যভার গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি আমার উপর জেল-প্রণালী সংশোধনের ভার দিতে ইচ্ছুক হইযাছিলেন। রাণাডের এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইযাছিলাম এবং সেই ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে, ইহা সুদূর ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাষ মাত্র এবং একদিন স্বয়ং ভগবান আমাকে জেলে এক বৎসরকাল রাখিযা সেই প্রণালীর ক্রূরতা ও ব্যর্থতা এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবেন।"

তখনকার দিনের কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির ব্যর্থতা বুঝিয়াই শ্রীঅরবিন্দ দেশকে অন্যভাবে প্রবুদ্ধ করিতে এবং তাহাকে পূর্ণ-স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই স্বাধীনতা শুধু রাজনীতিক স্বাধীনতা নহে, ভারতকে তাহার আত্মবিকাশে সহাযতা করা। ভারতের সনাতন সাধনায় নিমগ্ন হইয়া শ্রীঅরবিন্দের প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, পূর্ণভাবে ভারতসত্তা বিকশিত না হইলে তাহার পূর্ণ স্বরাজ লাভ হইবে না। তাই তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় এক শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

এই শুভক্ষণ যে আসিবে তাহাও তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কারণ ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতেই তিনি প্রচ্ছন্নভাবে ভারতের ভাবী রাজনীতিক আন্দোলনের সৃজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলন যদি নিছক রাজনীতিক আন্দোলন হইত, তাহা হইলে শ্রীঅরবিন্দ তাহাতে যোগদান করিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি জাতীয় জাগরণের স্পন্দন পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আন্দোলনের পিছনে রহিয়াছে ভারতের আত্মবিকাশ, দেশমাতৃকার মহিমা-বিকাশের ইঙ্গিত, রাজনীতির অভিনব আধ্যাত্মিক রূপান্তর—যাহা প্রচলিত পাশ্চাত্যনীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই রূপান্তরে সহায়তা করিবার জন্য, ভারতকে পাশ্চাত্যের জড়বাদের মোহপাশ হইতে পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই, তিনি শিক্ষাব্রত ত্যাগ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে ইংরাজী পুস্তিকা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, বরোদা-জীবনের শেষের কয়েক বৎসর তিনি ছুটি লইয়া নীরবে রাজনীতিক কার্য্য করিতেছিলেন। বস্তুতঃ ১৯০২ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত কয়েকজন সহকর্ম্মীর সহিত তিনি স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ এই আন্দোলন মূর্ত্ত হইয়া উঠে। তিনিও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরোদা ত্যাগ করিয়া ইহাতে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন।

প্রথমে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদ কর্ত্তৃক স্থাপিত কলিকাতা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। প্রথমে

বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, শিক্ষাব্রতের সহিত জাতীয় আন্দোলনে কার্য্য করিবেন। কিন্তু অচিরেই ছাত্রভর্ত্তি ব্যাপারে পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটিল। তখন ছাত্র-নিপীড়নের যুগ। সামান্য রাজনৈতিক কারণে বহু ছাত্র স্কুল কলেজ হইতে বিতাড়িত হইতেছিল। শ্রীঅরবিন্দ এই সকল ছাত্রকে অবাধে জাতীয় কলেজে ভর্ত্তি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ জেদ করেন যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, সরকারী স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষাদান বিষয়ে যে সকল দোষত্রুটী দেখা যায় জাতীয় শিক্ষাদ্বারা তাহা দূর করা। মতভেদের জন্য শ্রীঅরবিন্দ অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন এবং "বন্দে মাতরম্" ইংরাজী দৈনিক স্থাপনা করিয়া তাহার সম্পাদকরূপে সমগ্র জাতিকে প্রেরণা দিতে আরম্ভ করেন। তখন হইতেই তিনি জাতীয়দলকে শক্তিমান করিবার জন্য প্রকাশ্যে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

বৎসরকাল তিনি জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। তাঁহার যে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট ছাত্রগণ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দেয়। উত্তরে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেই তাঁহার দেশসেবার আদর্শ পূর্ণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় যে তাঁহাকে জাতীয় কলেজের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহার জন্য বিন্দুমাত্র বিরক্তি সে বক্তৃতায় প্রকাশ পায় নাই, বরং তিনি ইঙ্গিত করেন যে, বাল্যকাল হইতে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন,

তাহার পরিচালনে বাধাবিপত্তি অবশ্যম্ভাবী, তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। কোন বিষযেই কোন দিন তাঁহার মায়া নাই, এই কারণেই যে-প্রতিষ্ঠান তিনি নিজেই গড়িয়াছিলেন, মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। মায়া শুধু ব্যক্তি বা দ্রব্যের উপর জন্মে না, প্রতিষ্ঠানের উপরও জন্মে—এই মায়াই কালচক্র ঘূর্ণনে, প্রতিষ্ঠান বা আদর্শের প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে বাধা দিবার চেষ্টা করে এবং মায়ায় অভিভূত ব্যক্তি মানসিক অশান্তি ভোগ করে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ স্বভাবমুক্ত—সত্য ও শ্রেয়ঃ তাঁহার একমাত্র কাম্য। সেই জন্যই বার বার তিনি প্রেয়কে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রেযের জন্য জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তখনকার দিনেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই মহান্ আদর্শ উপলব্ধি করিযাই "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার" প্রশস্তিতে লিখিয়াছিলেন, "আছ জাগি' পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন····· যার কাছে আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে।"

জাতীয় কলেজে ঐ বিদায় অভিভাষণে আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গলার ছাত্রসমাজ শ্রীঅরবিন্দকে শুধু হৃদয়-উৎস হইতে স্বতঃনিঃসৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিত না, তাহারা তাঁহাকে দেশাত্মার মূর্ত্ত বিকাশ বলিয়া মনে করিত। অভিভাষণে তিনি বলেন, "আজ তোমরা আমার প্রতি যাহা কিছু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছ, আমি মনে করি, তাহা আমার জন্য নয়, এমন কি অধ্যক্ষের জন্য নয়—তাহা তোমাদের দেশের প্রতি—আমার ভিতর দেশমাতৃকার যে বিকাশ আছে, তাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়াছ: কারণ আমি অল্প যাহা কিছু করিয়াছি, সেই দেশমাতার জন্য করিয়াছি, এবং আমি যে সামান্য দুঃখ ভোগ করিতে যাইতেছি তাহা তাঁহারই জন্য।"

কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় কলেজের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার নিজের কথায়ই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলেন, "আশা করিয়াছিলাম এই প্রতিষ্ঠানে আমরা জাতির একটা শক্তিকেন্দ্র, নবীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিব—যাহাতে ভারত দুঃখের নিশার অবসানে নূতন জীবন গড়িতে পারে—সেই জয়-মহিমামণ্ডিত দিনের জন্য, যখন ভারত জগৎ-হিতার্থ কার্য্য করিবে।"

ছাত্রদের নিকট দেশসেবার মহান্ আদর্শ ব্যক্ত করিয়া তিনি বলেন, "আমার কামনা তোমাদের মধ্যে কয়েকজন মহান্ হউক—কিন্তু তোমাদের নিজেদের জন্য নহে, তোমাদের অহঙ্কার তৃপ্ত করিবার জন্য নহে। মহান্ হও দেশমাতার জন্য, ভারতকে মহান্ করিবার জন্য, যাহাতে ভারত পৃথিবীর জাতিবর্গের মধ্যে উন্নতশিরে দাঁড়াইতে পারে—যেমন সে পুরাকালে ছিল, যখন জগৎ তাহার নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিত। এমন কি যাহারা দরিদ্র ও অখ্যাত থাকিবে, আমি চাহি যে তাহাদের দারিদ্র্য এবং যশোহীনতাও মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত হইবে। ....তোমরা জীবিকা উপার্জ্জন করিবে যাহাতে মা'র জন্য বাঁচিতে পার। তোমরা বিদেশে যাইবে, যাহাতে জ্ঞান আহরণ করিয়া মা'র সেবা করিতে পার, শ্রম করিবে যাহাতে মা সমৃদ্ধিশালিনী হন; ক্লেশস্বীকার করিবে যাহাতে তিনি তৃপ্ত হন। যদি তোমাদের আমার প্রতি সহানুভূতি থাকে, আমি তাহা ব্যক্তিগত ভাবে দেখিতে চাহি না—আমি মনে করিতে চাহি, ইহা, আমি যে আদর্শের জন্য কাজ করিতেছি, তাহার প্রতি সহানুভূতি।"*

* শ্রীঅরবিন্দের এই কথাগুলি তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার অসম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ মাত্র, যাহা হয়ত কিঞ্চিৎ ভাবার্থ প্রকাশ করিয়াছে।

জাতীয় কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং লেখা ও বক্তৃতাদ্বারা জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন। একদিকে যেমন জাতীয়দলে শক্তিসঞ্চার করিয়া তিনি মধ্যপন্থীদল-সৃষ্ট রাজনীতিক কুহেলিকা বিদূরিত করিলেন, অপরদিকে "বন্দে মাতরম্" সংবাদপত্রের স্তম্ভে দিনের পর দিন জাতীয় জাগরণের তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। তিনি আর নিরালায় শিক্ষাব্রত, 'মানুষ গড়িবার' প্রচেষ্টায় নিবিষ্ট থাকিতে পারিলেন না—তাঁহাকে জাতীয় যজ্ঞের পৌরোহিত্য লইতে হইল। ইহার ফল হইল এই যে, একদিকে মধ্যপন্থীদলের সহিত তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইল এবং অপরদিকে তাঁহার শক্তির প্রভাব দেখিয়া তখনকার দিনের রাজপুরুষগণ প্রমাদ গণিলেন। অচিরেই তাঁহার যশঃসূর্য্যকে রাজরোষরূপী রাহু গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিল। তাঁহার জীবনে আসিল অগ্নি-পরীক্ষা, যাহাতে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রকাশিত হইল। দেশমাতার সেবা করিতে করিতে তিনি দিব্য জীবনের সন্ধান পাইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের জাতীয় নেতারূপে

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাংলায় আসিবার পূর্ব্বেই জাতিকে স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার ও জাতীয় শিল্পসম্পদ সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন। ইহার দুইটী দিক ছিল—এক ছিল রাজনীতিক; বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য দৃঢ় পণ করা। আর এক ছিল, জাতীয় সংগঠনের জন্য দেশে শিল্পসম্পদ সৃষ্টি করা এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রসারের জন্য বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করা।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সেই যুগে একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের সাফল্যের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই আমলাতন্ত্রের সহিত সাহসিকতা ভরে, কিন্তু বিচক্ষণতাপূর্ব্বক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়াই ছিল একমাত্র উপায়। ইহাই হইল শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি। কিন্তু সংঘর্ষ সুরু করিবার পূর্ব্বে চাই স্বাধীনতার আদর্শে অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই ত্যাগে ও দুঃখভোগে প্রেরণা দেয়; ইহার বলেই ধৈর্য্য রক্ষা করা যায়। এই জন্যই জাতীয় দলের নেতারূপে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমেই স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিলেন।

সে যুগের কংগ্রেসী নেতারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভিন্ন

আর কোন রাজনীতিক আদর্শ কল্পনা করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের সে সাহস ছিল না। অবশ্য জাতির পক্ষে পরাধীনতা ক্রমশঃ দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল এবং ধীরে ধীরে স্বরাজের আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে দাদাভাই নওরোজী এই আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 'স্বরাজের অর্থ লইয়া বিশ বৎসর কি যে বাদবিতণ্ডা হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এমন কি কংগ্রেস ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—যতক্ষণ না বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জাতীয় দাবী একেবারে উপেক্ষা করিলেন—কিছুতেই ঘোষণা করিতে রাজি হয় নাই যে স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা।

বাংলায় আসিয়াই শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়দলের সম্মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপন করিলেন। অনেকেই বোধ হয় এই কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। ভারতবিখ্যাত নেতারা কখন ভুলিয়াও শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক কার্য্যের উল্লেখ করেন না, তবে সুভাষচন্দ্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে স্মরণ করিয়াছিলেন যে, জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সর্ব্ব প্রথমে দিয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। যাহা হউক, ইহা আজ কংগ্রেসেরও আদর্শ এবং জাতির দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে স্বাধীনতা লাভ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু তখনকার দিনে এই আদর্শ লইয়াই সুরু হইল কংগ্রেসে বিরোধ, এবং এই বিরোধের পরিণতি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে জাতীয়দল ও মধ্যপন্থীদলের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাহার পুস্তকে ইহাকে জাতীয় কুরুক্ষেত্র বলিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ 'গীতার ভূমিকা"য় বুঝাইয়াছেন যে ভারতকে সবল করিবার জন্য, নূতন আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল। তেমনি বলা যায় সুরাটে এই রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্রের ফলেই কংগ্রেসের ভাবী রূপান্তরের সূচনা হইয়াছিল। তখন হইতেই ভারতে রাজনীতির গতি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, জাতি স্বাধীনতার আদর্শ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার প্রেরণা পাইয়াছে।

জাতীয়দল গঠনে শ্রীঅরবিন্দের প্রথম কার্য্য হইল একটী নির্ভীক জাতীয় সংবাদপত্র স্থাপন করা। জাতীয় কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি ইংরাজী দৈনিক "বন্দে মাতরম্"-এর সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। অচিরে তিনি জাতীয়দলকে এই সংবাদপত্র-পরিচালনার ভার গ্রহণ করাইলেন। মহানুভব রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক তাঁহার এই কার্য্যে প্রধান সহায়ক হইলেন। সুবোধচন্দ্রের টাকায় "বন্দে মাতরম্"-এর প্রেস হইল। স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি জাতীয়দলের নেতাগণ এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি তরুণ কর্ম্মীদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় শ্রীঅরবিন্দ "বন্দে মাতরম্"কে জাতীয় জাগরণের ভেরী করিলেন। সমগ্র ভারতে "বন্দে মাতরম্"-এর লেখা কি উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এখনও অনেকে স্মরণ করেন। ১৯০৭ হইতে ১৯০৮এ গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের লেখনী "বন্দে মাতরম্"-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি দিনের পর দিন পূর্ণ করিত। এই প্রকারে তিনি ভারতের ইংরাজী সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিলেন। এতদিন নীরবে সাধনা করিয়া তিনি যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার পরিচয় তাঁহার লেখনীতে পাওয়া গেল। সেই তপঃশক্তির প্রভাবে জাতি প্রাণে নূতন আশা পাইল, হৃদয়ে নূতন বল অনুভব করিল, মাতৃভূমির সেবায়

দুঃখকে বরণ করিতে শিখিল এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রেরণা পাইল। এই মহৎ কর্ম্ম করিবার জন্যই যেন শ্রীঅরবিন্দের বিলাতে শিক্ষা, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ না-করা, এবং বরোদায় জ্ঞান-তপস্যা।

বাংলার সংবাদপত্রগুলিই জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু "বন্দে মাতরম্"-এর মত নির্ভীক ভাবে, ওজস্বিনী ভাষায় জাতীয়তার বাণী প্রচার কেহই করে নাই। অচিরেই "বন্দে মাতরম্"-এর ভারতব্যাপী প্রচার হইল এবং ইহা হইল নবীন ভারতের মুখপত্র। ভারতে যাঁহারা জাতীয় জাগরণে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা—যেমন মহাত্মা শিশিরকুমারের "অমৃত বাজার পত্রিকা", সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী", লোকমান্য তিলকের "কেশরী" ও "মরাঠা", স্যর ফেরোজ শাহ মেহ্‌টার "বম্বে ক্রনিক্‌ল্", এনি বেসান্টের "নিউ ইণ্ডিয়া", মহাত্মা গান্ধীর "ইয়ং ইণ্ডিয়া", শ্যামসুন্দরের "সার্ভেণ্ট", দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের "ফরোয়ার্ড" প্রভৃতি, তেমনি শ্রীঅরবিন্দ ভারতের জাতীয়তা প্রচারের জন্য "বন্দে মাতরম্", পরে "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম", এবং অবশেষে দিব্য-আদর্শ প্রচারের জন্য পণ্ডিচারী হইতে "আর্য্য" পরিচালনা করিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ-অনুসারে "বন্দে মাতরম্"-এর প্রধান কার্য্য হইল কংগ্রেসের আবেদন-নীতির ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করা এবং জাতিকে আত্মনির্ভরতা শিখান। এই কারণেই "বেঙ্গলী"র সহিত "বন্দে মাতরম্"-এর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী, স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি জাতীয়দলের স্বাধীনতার আদর্শ বরদাস্ত করিতে পারিতেন না এবং

তখনকার দিনের অন্যান্য প্রসিদ্ধ নেতাদের ন্যায় নিবেদন-নীতি সমর্থন করিতেন। তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতিতে পাশ্চাত্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্য শুধু রাজনীতিক সংগ্রাম ছিল না, তিনি চাহিয়াছিলেন সর্ব্ব-বিষয়ে ভারতের বিশেষত্ব ফুটাইতে। সর্ব্বোপরি তিনি দেশাত্মবোধের জাগরণেও ভগবত প্রেরণা অনুভব করিতেন, দেশকে জগন্মাতার মূর্ত্তরূপ বলিয়া মনে করিতেন, ভগবত সত্তার উপলব্ধিই চরম ব্যক্তি-গত আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেন। "বেঙ্গলী" বর্ণিত রাজনীতি-ক্ষেত্রে এ সকল জিনিষ অবান্তর, কাজেই শ্রীঅরবিন্দের ভগবদ্দর্শন প্রভৃতি লইয়া "বেঙ্গলী" ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। শ্রীঅরবিন্দ "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগিন্"-এর স্তম্ভে তাহার উপযুক্ত জবাব দিতেন।

সত্য কথা বলিতে গেলে, "বেঙ্গলী" বা তখনকার দিনের মধ্যপন্থী নেতারা শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ বুঝিতেই চাহিতেন না।* তিনি চাহিয়াছিলেন গোটা জাতিকে জাগাইতে—তাঁহার ক্ষুদ্র রাজনীতিক লাভালাভের দিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি জাতির জাগরণে শ্রীভগবানের অমোঘ নির্দ্দেশ দেখিয়াছিলেন, এবং প্রকাশ্য ভাবে বলিতেন ও লিখিতেন যে শ্রীভগবানই আন্দোলনের নেতা। তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করিতেন, কারণ তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল, আজই হউক বা কালই হউক ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে। সুতরাং তিনি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা অন্য কোন রাজনীতিক সুবিধাবাদের দ্বারা, সাময়িক লাভের

---

* সুরেন্দ্রনাথ বোধ হয় শ্রীঅরবিন্দের উপর বিশেষ বিরূপ ছিলেন, কারণ তাঁহার "আত্মজীবনী"তে ("A Nation in Making") তিনি বহু লোকের নাম করিয়াছেন, কিন্তু একবারও শ্রীঅরবিন্দের নাম করেন নাই।

আশায়, জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ম্লান করিতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। অথচ তিনি কোন বেপরোয়া নীতি সমর্থন করেন নাই। তখনকার দিনে যাহা সম্ভবপর ছিল, তিনি জাতিকে সেই পন্থাই অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে তিনি জাতিকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া নির্ভীক ভাবে দণ্ডায়মান হইতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্যের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া জাতি স্বশক্তি বিকাশ করিবে, যাহাতে জাতীয় আদর্শে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির স্বাভাবিক বিবর্ত্তন হইবে। সর্ব্বোপরি তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, জাতীয়তার বিকাশ ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, যাহার জন্য জগতের মধ্যে ভারত যুগে যুগে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে—সেই সনাতন ধর্ম্মের বিকাশ যাহা বারংবার রাজনীতিক ঝঞ্ঝার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতাকে অবিকৃত রাখিয়াছে, তাহার সত্তাকে রক্ষা করিয়াছে। ইহা যে কবির কল্পনা নহে, স্থূল বিকাশের পশ্চাতে অভ্রান্ত সূক্ষ্মশক্তি কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তিকে আশ্রয় করিলে ব্যক্তি ও জাতি চরম ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়—ইহাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধগুলির মূল স্বর।

পরাভূত, নিপীড়িত, মূর্চ্ছিত ভারতের নিকট তখনকার দিনে এ এক অভিনব বাণী! স্বরাজ্যের এই ঐশী মন্ত্রে নিদ্রিত ভারত জাগরিত হইল। সমগ্র জাতি প্রতি ধমনীতে শক্তির স্পন্দন অনুভব করিল। শ্রীঅরবিন্দ জাতিকে শুধু প্রেরণা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, স্বয়ং জাতীয়দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের রূপান্তর সাধনের জন্য তিনি মধ্যপন্থীদলের সহিত সংঘর্ষেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহাতে, শুধু আদর্শবাদী হিসাবে নয়, তাঁহার

রাজনীতিক কুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। প্রথমে তিনি বাংলার জাতীয়দলকে পরোক্ষে চাল চালিবার নীতি ত্যাগ করিয়া আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিলেন—যাহাতে অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করা যায় এবং দেশের সম্মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপিত হয়। তার পর তিনি জাতীয়দলকে প্রাদেশিক গণ্ডীর বাহিরে সমগ্র ভারতে ব্যাপকভাবে দলবিস্তার ও কার্য্য করিতে মন্ত্রণা দিলেন। তাঁহার এই নীতির ফলে প্রায় প্রতি প্রদেশেই জাতীয়দল গঠিত হইল এবং লোকমান্য তিলক ও শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে ক্রমশঃই তাঁহাদের দলের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই প্রকারে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া যে আন্দোলনের সুরু হইয়াছিল, তাহা নিখিল ভারতব্যাপী স্বরাজ-আন্দোলনে বিস্তৃতি লাভ করিল।

কিন্তু অতীব প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া জাতীয়দলকে অগ্রসর হইতে হইল। একদিকে সরকারের চণ্ডনীতি, অপরদিকে মধ্যপন্থীদলের প্রতিকূলতা। সরকার জাতীয়দলকে উগ্রপন্থী আখ্যা দিয়া উহাকে দমন করিতে সচেষ্ট হইলেন, এবং মধ্যপন্থীদলকে ঝুটা শাসনসংস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া তোয়াজ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাকেই প্রচলিত কথায় "লাথি ও চুমা"র নীতি বলে।

সরকারের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে জাতীয়দলের প্রথম কার্য্য হইল কংগ্রেসে মধ্যপন্থীদলের প্রভাব বিনষ্ট করা। তখনকার দিনে কংগ্রেস ব্যাপক প্রতিষ্ঠান ছিল না, প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। কাজেই জাতিকে সংগঠন করিবার একমাত্র উপায় ছিল লেখা ও বক্তৃতা। শ্রীঅরবিন্দ ও

লোকমান্য তিলক এবং জাতীয়দলের অপরাপর নেতৃবৃন্দ সেই উপায়ে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন এবং তাহারা ঐকান্তিকতার সহিত জাতীয়দলের আদর্শ গ্রহণ করিল। প্রায় সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয়পক্ষ অবলম্বন করিল। সাধারণ লোকের তখনকার দিনে রাজনীতির সহিত বিশেষ সংস্রব ছিল না এবং এখনকার মত তাহারা দলে দলে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিত না; কিন্তু তাহারা যে এই আন্দোলনে পূর্ণভাবে সাড়া দিযাছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসী শ্রীঅরবিন্দ ও লোকমান্য তিলককে ভারতের মুক্তিপ্রবাহের আবাহনকারী ভগীরথ-যুগল বলিয়া মনে করিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসের পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় দলের প্রচার কার্য্যের জন্য বাহিরে যাইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ যে চারি বৎসর তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে ছিলেন তাহার মধ্যে খুব বেশী বক্তৃতা দেন নাই। বাগ্মিতায় জনসাধারণের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, তিনি তাহাদের বিচারশক্তি ও চিন্তাশক্তি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জন্যই যখন তাঁহার বক্তৃতাগুলি ছাপা হইত তখন তাহা হইতে পাঠক অপূর্ব্ব প্রেরণা পাইত। বলা যায় যে সত্যই তাঁহার লেখনী তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। সেই সময়ে ভারতের ভাবরাজ্যে যে বিপ্লব ঘটিযাছিল, জাতীয়তার যে প্লাবন বহিয়াছিল তাহার উৎস ছিল শ্রীঅরবিন্দের লেখনী ও বাণী।

কিন্তু তিনি বুঝিযাছিলেন শুধু লেখনী পরিচালনায় ও বাণী প্রচারে কাযাসিদ্ধি হইবে না—নেতাহিসাবে তাঁহাকে জনসাধারণের সহিত মিশিতে হইবে, স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মীদের প্রেরণা দিতে

হইবে, আদর্শ কর্ম্মীর পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, কর্ম্মযোগ কাহাকে বলে নিজে কাজ করিয়া দেখাইতে হইবে। এই জন্যই তিনি জাতীয়দলের নীতি পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। যদি তিনি তাহা না করিতেন তাহা হইলে আদর্শবাদী হিসাবে যশোলাভ করিতেন বটে, কিন্তু ভারত তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইত না। প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে যোগদান না করিলে হয়ত তাঁহাকে প্রচণ্ড রাজরোষ ভোগ করিতেও হইত না। তাঁহাকে বোমার ষড়যন্ত্রের নেতারূপে প্রতিপন্ন করিয়া তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়দলের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়া; কিন্তু আদালতের সুবিচারে সে প্রয়াস ব্যর্থ হইল। তবে বেশ বুঝা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দ সাধনার জন্য বাংলা হইতে চলিয়া না গেলে, তাঁহাকে হয়ত লোকমান্য তিলকের মত দীর্ঘকাল কারাগারে বা নির্ব্বাসনে কাটাইতে হইত।

যাহা হউক, শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে বাংলার জাতীয়দলকে শক্তিমান করিবার ফলে অচিরেই সুবিধাবাদী ও ধীরপন্থী নেতৃবর্গের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। প্রথম সংঘর্ষ হইল মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে। মেদিনীপুর জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, কাজেই ওখানে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইল। সম্মেলনে মধ্যপন্থীদলের আসল রূপ প্রকট হইল, কিন্তু সংখ্যাধিক্য থাকিলেও জাতীয়দল একটা বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি না করিয়া, শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে পৃথক সম্মেলন করিল। ইহাতে মূল সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। অপরপক্ষে জাতীয়দল দৃঢ় সংকল্প করিল জাতিকে সর্ব্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে—শাসন সংস্কার বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া লাভ নাই।

মেদিনীপুরে যে সংঘর্ষের সুরু, কয়েক মাস পরে তাহার পরিণতি দেখা গেল সুরাট কংগ্রেসে। এই কয়েক মাসের মধ্যেই জাতীয়দলের আদর্শ সমগ্র দেশে এরূপ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল যে মধ্যপন্থীদল প্রমাদ গণিলেন। তাঁহাদের মুঠার ভিতর হইতে যে কংগ্রেস সরিয়া পড়ে, তাঁহাদের ইজ্জৎ ত থাকে না, দেশেরও সর্ব্বনাশ হয়! কিন্তু এরূপ প্রবল বিপক্ষতা ও দারুণ রাজরোষেও শ্রীঅরবিন্দ কোনদিন বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। চিরকালই তিনি যে ধৈর্য্যের অবতার! জেল হইতে বাহির হইয়াও শ্রীঅরবিন্দ আদর্শ হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই এবং রাজনীতিক জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মধ্যপন্থীদলের সহিত লড়িয়াছেন। পরে দেখিব হুগলীতে প্রাদেশিক সম্মেলনে, বলিতে গেলে তিনি একাই, মধ্যপন্থী ব্যূহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। বাংলায় মধ্যপন্থীদল বিপক্ষতা করিলেও, সমগ্র জাতি ছিল তাঁহার পক্ষে।

সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বেই বুঝা গেল যে বাংলার ন্যায় মহারাষ্ট্রও সম্পূর্ণভাবে জাতীয়বাদী। বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য নেতৃবর্গ এবং মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ জাতীয়তার তূর্য্যনিনাদে সমগ্র দেশ মুখরিত করিয়া তুলিলেন। মধ্যপন্থীদল প্রমাদ গণিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস নাগপুরে হইবার কথা, কিন্তু কংগ্রেসের কর্ত্তাগণ বুঝিলেন ঐ স্থানে রাজনীতিক উত্তাপ খুব বেশী—মরাঠাগণ জাতীয় উদ্দীপনায় ভরপূর। কাজেই নিরাপদ হইবার জন্য তাঁহারা সুদূর সুরাট নগরীতে অধিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে তখন মধ্যপন্থী নেতা স্যর ফেরোজশা মেহ্‌তার পূর্ণ আধিপত্য। মধ্যপন্থীদল ভাবিলেন সুরাটে জাতীয়দল পাত্তা পাইবে না।

কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল জাতীয়দলের নেতৃবৃন্দ দলবল লইয়া ওখানেও ধাওয়া করিয়াছেন।

আসন্ন রাজনীতিক কুরুক্ষেত্রের আশঙ্কায় কংগ্রেসের অধিবেশন সুরু হইল। তখনকার দিনে প্রাদেশিক সমিতিগুলি কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিত না; আগে কর্ত্তারা ঠিক করিতেন কোন্ নেতা সভাপতি হইবেন, এবং কংগ্রেসের অধিবেশনেই তিনি মনোনীত হইতেন। মধ্যপন্থীদলের পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ স্যার রাস-বিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করিলেন; জাতীয়দলের পক্ষ হইতে লোকমান্য তিলকের নাম প্রস্তাব করা হইল। ইহার ফলে তুমুল বাদবিতণ্ডা সুরু হইল এবং অচিরেই দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইল। জুতা, চেয়ার প্রভৃতি চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, দুই এক জন নেতা আঘাত পাইলেন, নেতাদিগের মঞ্চের দিকে জনতা ধাওয়া করিল। সুরেন্দ্র-নাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার "আত্মজীবনী"তে ("A Nation in Making") লিখিয়াছেন :—

"কংগ্রেসের পূর্ব্ব-প্রেসিডেণ্ট হিসাবে আমার কাজ ছিল স্যার রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করা। পূর্ব্বেও আমি কংগ্রেসের সম্মতি লইয়া এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছি। কিন্তু এবার সেরূপ হইবার নয়। মেদিনীপুর সম্মেলনের ঘটনাবলী (সেখানে আমিই গণ্ডগোল থামাইয়াছিলাম) মনে পড়িল, এবং আমার বক্তৃতায় বারবার বাধা দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। আমার পক্ষে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা, কারণ আমি কংগ্রেসের মঞ্চে উঠিলেই প্রাথমিক হর্ষধ্বনির পরেই পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত।"

অতঃপর সুরাট দক্ষযজ্ঞের বিবরণ দিয়া সুরেন্দ্রনাথ লিখিতে-ছেন : "জনতা মঞ্চের দিকে ধাবিত হইলেও আমি সেইখানেই

রহিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে আমাকে, স্যর ফেরোজশা মেহ্‌তাকে ও অপরাপর কয়েকজনকে তাঁহারা পিছনের তাঁবুতে লইয়া গেলেন এবং পুলিশ আসিয়া প্যাণ্ডেল হইতে সমস্ত লোকজন সরাইয়া দিল। এই প্রকারে কংগ্রেসের এক স্মরণীয় অধ্যায়ের অবসান হইল এবং এক নূতন অধ্যায়ের স্বরু হইল।"

এই নূতন অধ্যায়েই আজ কংগ্রেস স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং অধিকাংশ প্রদেশের শাসনভার পাইয়াছে। কংগ্রেসে আর সেকালের নিবেদন-নীতি নাই, এবং কংগ্রেসের যশ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ কংগ্রেস সত্যই গণ-সম্মেলন। কিন্তু খুব কম লোকই আজ স্মরণ করেন যে, কংগ্রেসের এই রূপান্তরের স্বরু হইয়াছিল শ্রীঅরবিন্দ ও লোকমান্য তিলকের কার্য্যের ফলে।

যাহা হউক, সুরাটের দক্ষযজ্ঞের দৃশ্যেও শ্রীঅরবিন্দ অচল অটল ছিলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন যে, কংগ্রেসে যখন 'মার মার' রব উঠিয়াছে, চারিদিকে জুতা, লাঠি, চেয়ার প্রভৃতি শন্ শন্ করিয়া ছুটিতেছে, তখন শ্রীঅরবিন্দ প্রশান্ত বদনে বসিয়া আছেন, তাঁহার একটুও বিচলিত হইবার লক্ষণ নাই, আত্মরক্ষার জন্যও একটু ব্যস্ততা নাই; অবশেষে পুলিশ প্যাণ্ডেলকে জনশূন্য করিলে তিনি কয়েক-জন সহকর্ম্মীর সহিত বাহিরে আসিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে, কংগ্রেসের এই আত্মকলহে জাতির অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহার ফলে জাতীয় আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুরাটের পরে কয়েক বৎসর কংগ্রেস স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ দমন-নীতির ফলে জাতীয়দল ছত্রভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু অচিরেই তিলকের নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের

পর স্বরাজ আন্দোলন সুরু হইল এবং তাহার সহিত এনি বেসান্তের নেতৃত্বে 'হোমরুল' আন্দোলন দেশকে সরগবম করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাব পবই মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এবং অসহযোগ আন্দোলন হইতে স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯১৬ খ্রষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেস মধ্যপন্থী দলেব হাতেই ছিল, কিন্তু ঐ বৎসবে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সাময়িক ভাবে দলাদলির অবসান হইয়া যুক্তকংগ্রেস হইল। দলাদলির চরম অবস্থায়ও "ধর্ম্মে" এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিযাছিলেন—এমনিই ছিল তাহাব রাজনীতিক দূরদৃষ্টি। যাহা হউক, রাজনীতিক উত্তাপের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া মধ্যপন্থীদল আর বেশী দিন কংগ্রেসে থাকিতে পারেন নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেস উপলক্ষেই দলাদলি সুরু হয এবং পর বৎসবই মধ্যপন্থীদল কংগ্রেসেব সংস্রব বর্জ্জন করিযা দলের ভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু তখন হইতেই মধ্যপন্থীদলের প্রভাব বিলুপ্ত হইতে সুরু করিয়াছে এবং এখন 'একে একে নিভিছে দেউটি' হইযা মুষ্টিমেয় নেতা মাত্র কোনরূপে দলের অস্তিত্ব বজায় রাখিযাছেন।

সুবাট হইতে ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দ উৎসাহের সহিত জাতীয়দলের প্রচার কার্য্য সুরু করেন। তিনি বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কয়েক-স্থানে জাতীয়দলের আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন এবং বুঝাইয়া দেন কংগ্রেসে দলাদলি অনিবার্য্য হইল কেন। গ্রেপ্তার হইবার মাস খানেক পূর্ব্বে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দেব ১০ই এপ্রিল, কলিকাতায় যুক্তকংগ্রেস সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, ভগবানেব ইচ্ছায়ই সুরাট কংগ্রেস ভঙ্গ হইযাছে এবং যদি কংগ্রেস পুনর্ব্বার যুক্ত হয় তাহা হইলে তাঁহারই ইচ্ছায় হইবে। তিনি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন যে, কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্য কংগ্রেস ভঙ্গ হয়

নাই, কতকগুলি সুস্পষ্ট সমস্যার জন্যই দলাদলি প্রকট হইয়াছে। প্রথম, সভাপতি নির্ব্বাচনে অনিয়ম; দ্বিতীয়, পূর্ব্ব বৎসর (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতায় যে চারিটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল দল বিশেষের তাহা নাকচ করিবার চেষ্টা; তৃতীয়, স্থানীয় (সুরাটের) দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে শক্তিমান (জাতীয়) দলকে দাবাইয়া কংগ্রেসের মূল আদর্শ পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা। এই অবস্থায় সংঘর্ষ ছাড়া উপায় ছিল না এবং তিলক প্রস্তাব করেন যে, কংগ্রেসকে নিয়মানুযায়ী ভাবে গড়িবার জন্য একটী কমিটী গঠিত হউক এবং এই কমিটীই সেই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবে। অপর পক্ষ, অর্থাৎ মধ্যপন্থীদল, তিলককে ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার সুযোগ না দিয়া সহসা ঘোষণা করিলেন যে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্যর রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ বিষয়ে যখন সুস্পষ্ট মতভেদ ছিল, তখন কি করিয়া বলা চলে যে, সভাপতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন?

অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, জাতীয়দল এ সকল অনিয়ম উপেক্ষা করিতেও প্রস্তুত আছেন, যদি অপর দল কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি বজায় রাখিবার অঙ্গীকারে যুক্তকংগ্রেসে রাজি হন। যদি তাঁহারা রাজি না হন, তাহা হইলে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দলগত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিবার দায়িত্ব তাঁহাদেরই। "আমাদের নীতি এই যে, আমরা ভিন্ন দল হিসাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানেই কার্য্য করিব, কিন্তু আমরা চাই সমগ্র জাতির যুক্তকংগ্রেস।"

আজও মধ্যপন্থীদল এই আদর্শগত বিভিন্নতা মানিয়া চলিয়াছেন যদিও উত্তরোত্তর তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইতেছে এবং

সমগ্রজাতি পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছে, তথাপি আজও মুষ্টিমেয় মধ্যপন্থীদল বৃটিশ সাম্রাজ্য আঁকড়াইয়া থাকিতে বদ্ধপরিকর। বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুরেন্দ্রনাথ, ফিরোজশা মেহ্তার দিনের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন আর নাই—আজ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিও স্বাধীন, এমন কি বৃটিশ উপনিবেশ সচিব ম্যাল্কলম্ ম্যাক্ডোনাল্ডের ধারণা যে, তাঁহারই জীবনকালের মধ্যে সাম্রাজ্য একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবে—তবু ভারতের মুষ্টিমেয় মধ্যপন্থীদলের নেতাদের আকুতি যে, ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্য সজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাহাদের দলের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি প্রকাশ নারায়ণ সাপ্রু (স্যর তেজ বাহাদুরের পুত্র) এই আদর্শের কথাই বলিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজরোষের প্রকোপে কারাগারে

সুরাট কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণোদ্যমে রাজনীতি-ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। নানাস্থলে সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদ্বারা তিনি জাতীয়দলের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তাহাতে মাতব্বরী করিবার প্রচেষ্টা করা তখনকার জাতীয়নেতাদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র জাতিকে মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। তাঁহারা প্রকৃত নেতা ছিলেন, কাজেই নিছক নেতাগিরিতে বা প্রতিষ্ঠানের ঢক্কা নিনাদ করায় তাঁহাদের ঝোঁক ছিল না।

কিন্তু এদিকে তাঁহাদের ভাগ্যাকাশে অলক্ষ্যে রাজরোষের কৃষ্ণ মেঘ ঘনীভূত হইতে লাগিল। দেশের কার্য্যের জন্য ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজরোষের প্রকোপে পড়িয়াছিলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে লোকমান্য তিলকের ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সপ্তম এডোয়ার্ডের সিংহাসন-আরোহণ উপলক্ষে মুক্তিলাভ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাগজ "কেশরী"তে বোমা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য আবার তাঁহার দ্বীপান্তর দণ্ড হয় এবং ছয় বৎসর কাল তিনি মান্দালয়ের কারাগারে যাপন করেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে "বন্দে মাতরম্"-এ প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের

জন্য শ্রীঅরবিন্দ রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হন, কিন্তু সরকার পক্ষ প্রমাণ করিতে পারিলেন না যে, তিনিই সম্পাদক। 'এক ঢিলে দুই পাখী মারবার' উদ্দেশ্যে সরকারপক্ষ হইতে সুপ্রসিদ্ধ নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষ্য দিতে আদেশ করা হয়। বিপিনবাবু সাক্ষ্য দিলে শ্রীঅরবিন্দের দণ্ড, আর সাক্ষ্য না দিলে নিজের দণ্ড। বিপিনবাবু সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলেন, ফলে তাঁহার ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাকর অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসুর ছয় মাস কঠোর কারাদণ্ড হইল এবং অম্লান বদনে তিনি তাহা ভোগ করিলেন।* তখনকার দিনে নিয়ম ছিল মুদ্রাকরের নামে কাগজ ছাপা হইত, কিন্তু সম্পাদকের নাম গোপন থাকিত।

শ্রীঅরবিন্দের এই মামলায় দেশময় সাড়া পড়িয়া যায় এবং এই উপলক্ষেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"-শীর্ষক সুবিদিত কবিতা দেশনেতার উদ্দেশ্যে লিখেন। কেহ তখন বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই যে, কবির অভ্রান্ত দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সত্য পরিস্ফুট হইয়াছিল। কবি নিজেও বোধ হয় অনুমান করিতে পারেন নাই যে, কর্ম্মী, ত্যাগী, দেশমাতার পূজারী অরবিন্দের সম্বন্ধে সেদিন তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে পণ্ডিচারীতে যোগী শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া আবার তাহাই বলিবেন—"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের কারাদর্শন হইল না, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার কারাগারের ভীষণ-মধুর অভিজ্ঞতা

* অপূর্ব্বকৃষ্ণ পরে বহু বৎসর "অমৃত বাজার পত্রিকা"র মুদ্রাকর ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি শ্রীঅরবিন্দকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

লাভ ঘটিল। ঘটনাটা এমনই আকস্মিক ভাবে ঘটিল যে, শ্রীঅরবিন্দ নিজেই অনুমান করিতে পারেন নাই যে এত শীঘ্র তাঁহার অবস্থা বিপর্যয় ঘটিবে। এ সম্বন্ধে তিনি "কারাকাহিনী"তে লিখিয়াছেন :—

"১৯০৮ সনের ১লা মে, শুক্রবার আমি "বন্দে মাতরম্" অফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুইটি ইয়ুরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সে দিন "এম্পায়ার" কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিশ কমিশনার বলিয়াছেন, আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখন যে আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিশের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লব-প্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত-নেতা। জানিতাম না যে, এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসর কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটী নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া, নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে।"

রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দকে নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে যুবক সম্প্রদায়ই প্রধান বস্তুতঃ শ্রীঅরবিন্দ তাহাদেরই নেতা ছিলেন। আধুনিক যুগে প্রায়

সকল দেশেই জাতীয় অভ্যুত্থানে তরুণগণই পুরোভাগে থাকে, কারণ তাহাদের পিছনের টান নাই, অতীতের সংস্কার নাই, ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতায় তাহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত। তাহাদের মত অন্য কোন সম্প্রদায়ই উচ্ছল প্রাণস্পর্শে জাগিতে পারে না; এই কারণেই তাহাদের ত্যাগের ক্ষমতা অপরিমেয়। তাহারাই অম্লান বদনে দুঃখকে বরণ করিতে পারে, সহাস্য বদনে জীবনের সকল সম্পদ বিসর্জ্জন করিতে পারে।

কিন্তু উচ্ছল প্রাণশক্তিই কর্ম্মে সাফল্য দেয় না, স্থির বুদ্ধির সহায়তা না থাকিলে প্রাণ-প্রবাহের অপচয় ঘটিতে পারে, কর্ম্মশক্তি বিপথে নিয়োজিত হইতে পারে। জাতীয় আন্দোলনে বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর ধারণা হইল যে, সশস্ত্র বিপ্লবদ্বারা দেশের স্বাধীনতালাভ সহজসাধ্য হইবে—অন্ততঃ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া অচিরেই জাতীয় দাবী আদায় করা যাইবে। তাহাদের এই উৎকট পন্থা গ্রহণ করার আর একটী কারণ এই যে, তখনকার দিনে শাসকসম্প্রদায় বিবেচনাশূন্য হইয়া দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, এবং ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গদিগের নিকট শুধু উপেক্ষা নহে অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতেও হইত, এবং অনেক স্থলে বিচারালয়েও তাহার কোন প্রতিকার পাওয়া যাইত না।

এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন অনেকেই ছিলেন জাতীয়দলের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী, কাজেই শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী। বিশেষতঃ তাঁহাদের নেতা বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর এবং অন্যতম নেতা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুধু "যুগান্তরে"র পরিচালক নহে "বন্দে মাতরম্"-এও শ্রীঅরবিন্দের সহকর্ম্মী ছিলেন। কাজেই

পুলিশের স্বতঃই সন্দেহ হইয়াছিল যে রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়দলের প্রকাশ্য নেতা, তেমনি তিনি বিপ্লববাদী-দলেরও গুপ্ত নেতা। বিচারকালে সরকারী কৌঁসুলি নর্টন সাহেব আগাগোড়া এই যুক্তি দ্বারাই শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের হাস্যোদ্দীপক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মজঃফরপুরে হত্যাকাণ্ডের পরই যেই মাণিকতলায় বোমার কারখানা বাহির হইয়া পড়িল, অমনি বিপ্লবীদলের সহিত শ্রীঅরবিন্দ ধৃত হইলেন এবং অপর সকলের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধেও বিপ্লব ও হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইল। এই অভিনব অভিযোগে শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় স্থিতধী ব্যক্তিও অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ "কারাকাহিনী"তে তাঁহার গ্রেপ্তার ও আনুষঙ্গিক ঘটনার মনোরম বিবরণ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগানের যে হাস্যোদ্দীপক কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বনায়ও হাসিতে হয়। প্রথমেই ক্রেগানের হুকুমে তাঁহার হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দেওয়া হইল, কিছুক্ষণ পরে তাহা খুলিয়া লওয়া হইল। শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, "ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্ত্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্রস্বভাববিশিষ্ট আইন ভঙ্গকারী, আমাদেব প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্রকথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদবাবু (অন্যতম পুলিশ কর্ম্মচারী) তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি নাকি বি, এ, পাশ করিয়াছেন? এরূপ বাসায়, এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই

অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?' আমি বলিলাম, 'আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।' সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, 'তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়াছেন?' দেশহিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ ও দারিদ্র্যব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।"

অবশ্য ইহার পরে, এমন কি দীর্ঘ এক বৎসর কারাবাসেও শ্রীঅরবিন্দ কাহারও নিকট কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার পান নাই, বরং জেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সহিত যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি তাহার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে বড়ই আনন্দ হয়। অবশ্য দুর্ব্ব্যবহার পাইলেও তিনি বিচলিত হইতেন না। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা"য় লিখিয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দকে যখন বিচারালয় হইতে কার্য্যবশতঃ বাহিরে লইবার সময়ে প্রহরীরা বন্ধন করিয়া লইয়া যাইত, তাহা দেখিয়া সকলের যেন ধৈর্য্যরক্ষা করা কষ্টসাধ্য হইত—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ একেবারে অবিচল, মুহূর্ত্তের জন্যও কোনদিন তাঁহার ভাবান্তর দেখা যায় নাই। বিচারের সময়ও সঙ্গিগণ তাঁহার অবিচল ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন—কোন দিকেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন যোগাসনে বসিয়া আছেন।

"কারাকাহিনী"তে তাঁহার স্বলিখিত বিচারের সরস বিবরণ একটা পড়িবার জিনিষ—তিনি নিম্ন আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট, সরকারী কৌঁসুলি নর্টন সাহেব এবং সাক্ষীদের যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে বিচার প্রহসনটী সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। অবশেষে এক বৎসর যাবৎ দীর্ঘ বিচারের পর তিনি সম্পূর্ণরূপে

নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তিনি কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তিনি কারাদ্বারের বাহিরে আসিলেন। তিনি যে মুক্তি পাইবেন তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বিচার উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ এক মহৎব্যক্তির সাহায্য পাইয়াছিলেন, যিনি পরে দেশের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া শুধু ভারতখ্যাত নয় জগৎখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, যাঁহাকে পরে দেশবাসী নাম দিয়াছিল দেশবন্ধু। চিত্তরঞ্জনই যেন ভগবানের যন্ত্রীরূপে শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিলাভে সহায়তা করিলেন। শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার হইবার সংবাদ প্রচারিত হইতেই, বিচারে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের সাহায্যার্থ, অযাচিত ভাবে বহু অর্থ আসিয়াছিল। তাঁহার ভগিনী সরোজিনী দেবী তাঁহার পক্ষ সমর্থনের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন শ্রীঅরবিন্দের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনের সে সময় তেমন পসার প্রতিপত্তি ছিল না, কাজেই প্রায় এক বৎসরকাল বলিতে গেলে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রীঅরবিন্দের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। এই মহত্ত্বেই তাঁহার ভাবী মহত্ত্ব ও ত্যাগের সূচনা, যাহার জন্য আজও প্রতি ভারতবাসী শ্রদ্ধাভরে তাঁহার কথা স্মরণ করে।

এই বিচার উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন শুধু ত্যাগ ও মহত্ত্বের পরিচয় দেন নাই, তাহার আইন-জ্ঞান ও বাগ্মিতায়ও সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। বিচার শেষে জজ ও এসেসরদিগের নিকট শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি যে ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন, তাহাতে

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-আদর্শ অতি চমৎকাররূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। ঐ কথাগুলি যেন বার বার আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করে :—

"Long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant seas and lands." (এই বিতণ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হইবার দীর্ঘকাল পরে, তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে, মানুষ তাঁহাকে স্বদেশ প্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী, মানবপ্রেমিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে। তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে তাঁহার বাণী ধ্বনিত হইবে শুধু এ দেশে নয়, সাগরপারে দূর-দূরান্তরে।) *

এই ঘটনার পূর্ব্ব হইতে শ্রীঅরবিন্দ চিত্তরঞ্জনের সহিত গভীর প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ভাবের ঐক্য ছিল যে, চিত্তরঞ্জনের সুবিখ্যাত কাব্য "সাগর সঙ্গীত"-এর ইংরাজী কাব্যানুবাদ করিয়াছিলেন অনুপম ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ নিজেই। তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শেরও এমন ঐক্য ছিল যে, দেশবন্ধুর তিরোধানের পর শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, তিলকের মৃত্যুর পর একমাত্র চিত্তরঞ্জনেরই ভারতে স্বরাজ স্থাপনা করিবার ক্ষমতা ছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসের পরে স্বরাজ্যদলের

---

* চিত্তরঞ্জনের সম্পূর্ণ বক্তৃতাটী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের "Life-Work of Sri Aurobindo" পুস্তকে পাওয়া যাইবে। তাহাতে মামলারও চুম্বক আছে।

প্রচার উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন মাদ্রাজ প্রদেশে ভ্রমণ কালে পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজনীতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন।

সরকারপক্ষ শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব-ষড়যন্ত্রের সহিত সংস্রব প্রমাণ করিবার জন্য যে সাক্ষ্য-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন করিতে চিত্তরঞ্জন যে আশ্চর্য্য বিচার বুদ্ধি ও আইনজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। নর্টন সাহেব কোন প্রকার যুক্তিযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাইয়া, পরোক্ষভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বৃটিশবিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়াই শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন এবং জাতীয়দল গঠন করিয়া দেশকে বিপ্লবে উত্তেজিত করিতেছিলেন। নর্টন সাহেব এই উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দের বহু চিঠিপত্র, প্রবন্ধাদি, ও বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বারীন্দ্রকুমারের লেখা বলিয়া একখানি পোষ্টকার্ড। উহাতে লেখা ছিল, এখনই মিষ্টান্ন ছড়াইবার সময়। ঐ কার্ডখানি পুলিশ নাকি পথিমধ্যে আটক করিয়াছিল এবং নর্টন প্রমাণ করিতে চাহেন "মিষ্টান্ন"র অর্থ বোমা! এই অদ্ভুত যুক্তি গ্রহণ করা দূরের কথা চিত্তরঞ্জনের ব্যাখ্যায় এসেসরগণের সিদ্ধান্ত হইল ঐ চিঠি একেবারেই জাল। জজ ওরূপ সিদ্ধান্ত না করিলেও, অভিমত প্রকাশ করেন যে ঐ সাক্ষ্যের কোনই মূল্য নাই।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক কার্য্যাবলীর বিবরণ ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ছিল না। তবে রাজার সাক্ষী নরেন গোঁসাই জেলে শ্রীঅরবিন্দের সহিত মেলা-মেশা করিয়া তাঁহাকে জড়াইবার চেষ্টায় ছিল। সে কি ভাবে শ্রীঅরবিন্দের

ও অপর সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিত তাহার বিবরণ "কারাকাহিনী"তে পাওয়া যায়। কিন্তু গোসাই জেলে নিহত হওয়ায়, তাহার উক্তি আইন-অনুসারে গ্রাহ্য হইল না।

অপর পক্ষে সরকারী কৌঁসুলির যুক্তিধূমজাল উড়াইয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করিলেন যে, এপর্য্যন্ত রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ যাহা করিয়াছেন তাহা কোন মতেই বে আইনী নহে। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা বে-আইনী হইতে পারে না। দেশপ্রেম কোন আইন অনুসারেই দূষ্য হইতে পারে না। জজ বীচক্রফ্‌ট্‌ রায়ে ঐ যুক্তিই মানিয়া লইলেন। সতীর্থের বিচারে শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কারাগারে ভগবদ্দর্শন

জেলে শ্রীঅরবিন্দ মাত্র এক বৎসর ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁহার জীবনের পূর্ণ রূপান্তর ঘটিল, যাহার জন্য রাজনীতিক নেতা, দেশপ্রেমিক অরবিন্দ, ভগবৎ-প্রেমিক মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ হইলেন। এই রূপান্তর আপাতদৃষ্টিতে অভিনব ও আকস্মিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা শ্রীঅরবিন্দেব সত্তার পরিচয় রাখেন তাঁহাবা জানেন যে বাল্যকাল হইতেই তিনি যেন প্রচ্ছন্ন যোগী। দেশপ্রেমের ন্যায় ভগবৎ জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইযাছিল। তিনি লৌকিক ভাবে ভগবান সম্বন্ধে ধারণা বা চিন্তা করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার জীবনের মুখ্য আদর্শ হইয়াছিল ভগবানেব সহিত নিবিড় যোগ স্থাপন করা, তাঁহাকে বিশ্বের প্রতি অণুপবমাণুব মধ্যে পর্যন্ত উপলব্ধি করা। কিন্তু এতদিন তিনি এই চরম উপলব্ধির সুযোগ পান নাই, কারাগারের নির্জ্জনতায়—অধিকাংশ সময়েই তাঁহাকে নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিতে হইয়াছিল—তিনি সে-সুযোগ পূর্ণভাবে পাইলেন। বলা চলে ভগবানই তাঁহাকে সে সুযোগ দিলেন। ভগবান বাসুদেবের কারাগারে জন্ম হইয়াছিল—কারাগারেই শ্রীঅরবিন্দ বাসুদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন, তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। *

* কারাগারে ভগবদ্দর্শন লইয়া তখনকার দিনেও ব্যক্তিবিশেষরাও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক নটরাজন সম্পাদিত

এই মহৎ সম্ভাবনার আভাস অন্তরে অনুভব করিয়া শ্রীঅরবিন্দ শান্ত হৃদয়ে কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি "কারাকাহিনী"তে লিখিয়াছেন, "বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রম বাস। অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম ; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্ম্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন-কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার। আমার জীবনে এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্য বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে, আমার হিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই না উপকার করুন, অনিষ্টকারীগণ—শত্রু কাহাকে বলিব, শত্রু আমার আর নাই—শত্রুই অধিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনিষ্ট করিতে গেলেন ইষ্টই হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম।"

ভগবদ্দর্শনের প্রেরণা বহু পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত

"সোশ্যাল রিফরমার" নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক এবং সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী"-তে এ সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা প্রকাশিত হইত। শ্রীঅরবিন্দ "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" ইহার যে উপযুক্ত জবাব দিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে উপভোগ্য। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ উল্লেখ করেন, 'বক্সার জেলে বিপিনচন্দ্রের এবং নির্ব্বাসনে কৃষ্ণকুমার মিত্রের ভগবৎ উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা প্রকাশ করেন। উহা কি তাঁহাদের উভয়েরই মানসিক ভ্রম ?' বিপিনচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দ কারাগারে যাইবার পূর্ব্বেই কারাবাস ভোগ করিয়াছিলেন।

হইয়াছিল। বরোদায় থাকিতে তাঁহাকে আমরা জ্ঞান-তপস্বীরূপে দেখিয়াছি, কিন্তু তখনই তিনি প্রচ্ছন্নভাবে যোগপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বারীন্দ্রকুমারের লেখায় আমরা জানিতে পারি যে, একদা তিনি নর্ম্মদাতীরে ব্রহ্মানন্দ নামে মহাযোগীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই যোগী কখনও কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তিনি পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

বরোদায় লেলে নামক এক মহারাষ্ট্রীয় যোগী শ্রীঅরবিন্দের যোগপথে প্রথম সহায়ক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা" পুস্তকে লেলের কথা আছে। লেলে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং বারীন্দ্রকুমার তাঁহাকে মাণিকতলার বোমার কারখানা দেখাইয়াছিলেন। লেলে বারীন্দ্রকুমার ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টায় বিরত হইতে বলিযাছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহাদের দুর্ভোগ হইবে। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার বীরত্বভরে ঐ সাবধান বাণী উপেক্ষা করিয়াছিলেন। লেলে কলিকাতা ত্যাগ করিবার কিছুকাল পরেই পুলিশ বোমার কারখানায় হানা দেয়। ইহার পর লেলের সহিত শ্রীঅরবিন্দের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কয়েক বৎসর হইল লেলে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

কলিকাতায় আসিয়া রাজনীতিক কর্ম্মের আবর্ত্তের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি জাতীয় জাগরণের উৎস বলিয়া মনে করিতেন। স্থরাট হইতে ফিরিবার পথে বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, যে-সময়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম হইতে দলে দলে উচ্চশিক্ষিত লোক আসিয়া ঐ নিরক্ষর সন্ন্যাসীর পদতলে লুণ্ঠিত হইল, সেই সময়েই ভারতের

মুক্তির কার্য্য সুরু হইল। বহু লেখায় শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরেব মৃত্তিকা তাঁহার বাটীতে ছিল। খানাতল্লাসীর সময় ইহা লইয়া যে মজার ব্যাপার হইয়াছিল "কারাকাহিনী"তে শ্রীঅরবিন্দ তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

"খানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধ চিত্তে নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়।"

জাতীয় জাগরণে যে শ্রীঅরবিন্দ ভাগবত শক্তির বিকাশ দেখিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কারাগারে যাইবার পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় তিনি আবেগ ভরে সেই কথা বলেন। উপরোক্ত বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় (১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী) তিনি বলেন যে, অনাদৃত, দুর্ব্বল বাঙ্গলা জাগ্রত হইয়াছে কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল। "জাতীয়তা একটা রাজনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি নহে, জাতীয়তা ভগবান-সম্ভূত ধর্ম্ম। জাতীয়তা কখনই বিনষ্ট হইবে না, ভাগবত শক্তিতেই জাতীয়তা টিকিয়া থাকিবে—যে কোন প্রকার অস্ত্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হউক না কেন। জাতীয়তা অমর, কারণ ইহা মানবীয় জিনিষ নহে। ভগবানই বাংলায় কাজ করিতেছেন। ভগবানকে মারা যায় না, ভগবানকে

জেলে পাঠান যায় না।" এতদিন তিনি নানা অবস্থার ভিতর ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইবার কারাবাস উপলক্ষে তিনি পূর্ণ ভাগবত সত্তায় নিমজ্জিত হইলেন।

গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে নীত হইবার পর হইতেই শ্রীঅরবিন্দের নূতন সাধনা আরম্ভ হইল। তাঁহার সহকর্ম্মিগণ জানেন যে, শ্রীঅরবিন্দ বরাবরই অত্যন্ত শান্ত, দারুণ সঙ্কটেও অবিচল। এবারকার জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় তাহার ধৈর্য্য আরও প্রকট হইল। তিন দিন হাজতবাসের পর আদালতে নীত হইলে তিনি তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে বলেন, "বাড়ীতে বল কোন ভয় যেন করে না, আমার নির্দ্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে।" অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন, "আমার মনে তখন হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহা হইবেই। প্রথম নির্জ্জন কারাবাসে মন একটু বিচলিত হয়, কিন্তু তিন দিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানর ফলে নিশ্চল শান্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে।"

এই প্রকারে কারাগারে তাহার যোগারম্ভ হইল। বিচারাধীন আসামী হইলেও তাঁহার ও আর সকলের প্রতি নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ হইল, কারণ পুলিশের চোখে তাঁহারা ভয়ঙ্কর মানুষ। কারাবাসের চিত্র আমরা শ্রীঅরবিন্দ ও অপর কয়েকজনের লেখায় পাই। "কারাকাহিনী"তে শ্রীঅরবিন্দ জেলের বাসস্থান, স্নান, আহার প্রভৃতি ব্যবস্থার যে সরস রহস্যপূর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই অমানুষিক ক্লেশভোগে তিনি একটুও কাতর হন নাই। পাঠকের মনে হয়, যিনি বাল্যকাল হইতে বিলাতের স্বাধীন হাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলেন তিনি কি করিয়া তখনকার দিনের কারাগারের নিকৃষ্ট জীবনেও হৃষ্ট ছিলেন! আমরা দেখিয়াছি

যে, বরোদায থাকিতেই তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিতেন। বাংলায় আসিযা তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বরং বরোদায যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু এখানে তিনি "বন্দেমাতরম" হইতে অতি সামান্য টাকা লইতেন এবং ক্ষুধাতে গেলে শাকভাতে জীবন ধারণ করিতেন। বলিতেন যে, যে দেশের অর্দ্ধেক লোক অর্দ্ধাহারে থাকে সে দেশে শাকভাত খাওয়াই উচিত। তাঁহার এই দারিদ্র্যব্রত লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার সময়ে ক্রেগান বিস্মিত হইয়া বলিযাছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত লোক এই অবস্থায কি করিয়া থাকেন।

কিন্তু তখনকার দিনে কারাগার কি করিয়া মানুষকে অমানুষ করিত, কয়েদীকে পশু অপেক্ষাও দুঃসহ জীবন যাপন করিতে হইত তাহা পাঠ করিয়া আধুনিকযুগের লোকও হযত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাহা লইয়াই কত রহস্য করিয়াছেন। যথা, তিনি লিখিয়াছেন, "শোবার ঘরের পার্শ্বে পায়খানা রাখা স্থানে স্থানে বিলাতী সভ্যতার অঙ্গ বিশেষ, কিন্তু একটী ক্ষুদ্র ঘরে শোবার ঘর, খাবার ঘর ও পাযখানা—ইহাকেই too much of a good thing বলে। আমরা কু-অভ্যাসগ্রস্ত ভারতবাসী, সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে পৌঁছা আমাদের পক্ষে কষ্টকর।"

কয়েদীদের স্নান করিবার নামমাত্র ব্যবস্থা ছিল, সে সম্বন্ধে তিনি লিখিযাছেন, "ইংরাজেরা বলে ভাগবৎ-প্রেম ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা প্রাযই সমান ও দুর্লভ সদ্‌গুণ, তাহাদের জেলে এই জাতীয় প্রবাদের যাথার্থ্য রক্ষণার্থ অথবা অতিরিক্ত স্নানসুখে কয়েদীর অনিচ্ছাজনিত তপস্যার রসভঙ্গ ভযে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।" কিছুদিন পরে পানীয় জলের কষ্ট কিঞ্চিৎ

লাঘব হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "তাহার আগেই আমি তৃষ্ণার সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর সংগ্রামে পিপাসামুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম।" দুইখানি কম্বলে শুইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যখন গরমের ক্লেশ অসহ্য হইয়া আর থাকা যাইত না, তখন মাটীতে গড়াইয়া শরীর শীতল করিয়া আরাম লাভ করিতাম। মাতা বসুন্ধরার শীতল উৎসঙ্গ স্পর্শের কি সুখ তাহা তখন বুঝিতাম। তবে জেলে সেই উৎসঙ্গ স্পর্শ বড় কোমল নয়, তদ্বারা নিদ্রার আগমন বাধাপ্রাপ্ত হইত বলিয়া কম্বলের শরণ লইতে হইত।"

অতঃপর তিনি লিখিতেছেন, "আলিপুর গবর্ণমেণ্ট হোটেলের যে বর্ণনা করিলাম......তাহা নিজের কষ্টভোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য নয়......। যেসব কষ্টের কারণ দেখাইয়াছি, সেসব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দয়াদৃষ্টি ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পরে—কি উপায়ে পরে বলিব—মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়। যখন সর্ব্বপ্রথম জেলের বিচিত্র পোষাক পরিয়া আমার পিঞ্জরে ঢুকিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম তখন এই ভাবই মনে প্রকাশ পাইল। মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমি ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বিচিত্র ও রহস্যময় চরিত্র অনেকদিন আগেই বুঝিয়া লইযাছিলাম, সেইজন্য আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত বা দুঃখিত হইলাম না।"

ইহাকেই বলে ভাগ্যচক্র! যিনি সিভিল সার্ভিসে চাকুরি লইলে বহুলোককে এইরূপ কারাগারে পাঠাইতেন, তিনিই স্বয়ং

কারাগারে এই ভীষণ অবস্থা বৎসরকাল ভোগ করিলেন! মহামতি রাণাডে একদা তাঁহাকে এই কারা-সংস্কারের ভার লইতে বলিয়াছিলেন। সত্যই স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে সহস্র সহস্র নেতা ও কর্ম্মী এই কারাযন্ত্রণা ভোগ না করিলে ভারতের কারাগারের ভীষণতা দূর হইতে কত যুগ লাগিত কে বলিতে পারে!

শ্রীঅরবিন্দ বৃটিশ চরিত্র সম্বন্ধে স্থানে স্থানে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা জাতিগত বিদ্বেষপ্রণোদিত হইয়া নহে—যে জাতি জগতে সভ্য বলিয়া পরিচয় দেয় সেই জাতির ব্যবস্থায় ভারতীয় কারাগারে এইরূপ অমানুষিক রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়াই। অপরদিকে তিনি জেলের কর্ত্তৃপক্ষ ও সাধারণ কয়েদীদের নিকট হইতে যে সদয় ব্যবহার পাইয়াছিলেন তাহার মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কাহিনীটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

"আলিপুরের একজন নিরপরাধীর কথা বলি। এব্যক্তি ডাকাতিতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত। জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ধার ধারে না, ধর্ম্ম-সম্বলের মধ্যে ভগবানে আস্থা এবং আর্য্যশিক্ষা-সুলভ ধৈর্য্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ইহাতে বিদ্যমান। এই বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের নয়নে সর্ব্বদা প্রশান্ত সরল মৈত্রীভাব বিরাজিত, মুখে সর্ব্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ। সময় সময় নিরপরাধ কষ্টভোগের কথা পাড়েন, স্ত্রীছেলেদের কথা বলেন, কবে ভগবান কারামুক্তি দিয়া স্ত্রীছেলেদের মুখদর্শন করাইবেন, এই ভাবও প্রকাশ করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে নিরাশ বা অধীর দেখি নাই। ভগবানের কৃপাপেক্ষায় ধীরভাবে জেলের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। বৃদ্ধের যত চেষ্টা ও

ভাবনা নিজের জন্য নহে, পরের সুখসুবিধা সংক্রান্ত। দয়া ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তাঁহার কথায় কথায় প্রকাশ পায়, পরসেবা তাঁহার স্বভাবধর্ম্ম। নম্রতায় এই সকল সদ্‌গুণ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমা হইতে সহস্রগুণ উচ্চহৃদয় বুঝিয়া এই নম্রতায় আমি সর্ব্বদা লজ্জিত হইতাম, বৃদ্ধের সেবাগ্রহণ করিতে সঙ্কোচ হইত, কিন্তু তিনি ছাড়েন না, তিনি সর্ব্বদা আমার সুখসোয়াস্তির জন্য চিন্তিত।"

এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ লিখিতেছেন, "এই অবনতির দিনেও ভারতবর্ষের চাষার মধ্যে—আমরা যাহাকে অশিক্ষিত ছোটলোক বলি,—তাহাদের মধ্যে এইরূপ হিন্দুসন্তান পাওয়া যায়, ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের গৌরব, আর্য্যশিক্ষার অতুল গুণপ্রকাশ এবং ইহাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাজনক। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী ও অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় এই দুইটী শ্রেণীতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত, ইহাদের মিলনেই ভবিষ্যৎ আর্য্যজাতি গঠিত হইবে।"

অচিরেই তিনি নরের মধ্যে নারায়ণ প্রত্যক্ষ করিবার অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। জেলে প্রবেশ করিবার পরই তাঁহার যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গীস্বরূপ, যেন নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত।.. ...উঠানের দেওয়ালের গায়ে একটী বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরঞ্জক নীলিমায় প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় ডিগ্রীর ছয়টী ঘরের সাম্‌নে যে শাস্ত্রী ঘুরিয়া থাকে, তাহার মুখ ও পদশব্দ অনেকবার পরিচিত বন্ধুর ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দিয়া

গরু চরাইতে লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল নিত্য প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের নির্জ্জন কারাবাসে অপূর্ব্ব প্রেমশিক্ষা পাইলাম। এইখানে আসিবার আগে মানুষের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং পশুপক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেমস্রোত প্রায়ই বহিত না। মনে আছে রবিবাবুর একটি কবিতায় মহিষের উপর গ্রাম্যবালকের গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে, সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতেই তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিকতা-দোষ দেখিয়াছিলাম। আলিপুরে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্ব্বপ্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান পাইতে পারে, গরু পাখী পিপীলিকা পর্য্যন্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দ স্ফুরণে মানুষের প্রাণ অস্থির হইতে পারে। *

এই প্রেমের অভিজ্ঞতা বাসুদেবের বিরাটরূপ প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ব্বাভাষ। কিরূপে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি হইল তাহা তিনি নিজেই চমৎকার ভাষায় লিখিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য দিতে গেলে মাধুর্য্য ও মহিমা নষ্ট হইবে বলিয়া সমস্তটাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"এই নির্জ্জন কারাবাসে কালযাপনের উপায়স্বরূপ পুস্তক বা অন্য কোন বস্তু ব্যতীত কয়েকদিন থাকিতে হইয়াছিল। পরে এমারসন সাহেব আসিয়া আমাকে বাড়ী হইতে ধুতি, জামা ও

* কিরূপে লাল বড় বড় পিপীলিকার দংশনে বেদনা অনুভব না করিয়া অন্য-প্রকার অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকুমারকে লিখিত একখানি পত্রে লিখিয়াছেন। পত্রখানি দিলীপ-কুমারের কাব্যগ্রন্থ "অনামী"তে আছে।

পড়িবার বই আনাইবার অনুমতি দিয়া যান। আমি কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে কালি কলম ও জেলের ছাপান চিঠির কাগজ আনাইয়া আমার পূজনীয় মেসো মহাশয় "সঞ্জীবনী"র সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদককে (৺কৃষ্ণকুমার মিত্র) ধুতি, জামা এবং পড়িবার বইএর মধ্যে গীতা ও উপনিষদ পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম। এই পুস্তকদ্বয় আমার হাতে পৌঁছিতে দুই-চারি দিন লাগে। তাহার পূর্ব্বে নির্জ্জন কারাবাসের মহত্ত্ব বুঝিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলাম। কেন এইরূপ কারাবাসে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিরও ধ্বংস হয় এবং তাহা অচিরে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম এবং সেই অবস্থায়ই ভগবানের অসীম দয়া এবং তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইবার কি দুর্লভ সুবিধা হয় তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইল।

"কারাবাসের পূর্ব্বে আমার সকালে একঘণ্টা ও সন্ধ্যাবেলায় একঘণ্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জ্জন কারাবাসে আর কোনও কার্য্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্রপথে ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা সংযত এবং একলক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনমতে দেড়ঘণ্টা ও দুইঘণ্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত।

"প্রথমে নানা চিন্তা লইয়া থাকিতাম। তাহার পরে সেই মানুষের আলাপরহিত চিন্তার বিষয়শূন্য অসহনীয় অকর্ম্মণ্যতায় মন ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি রহিত হইতে লাগিল। এমন অবস্থা হইতে লাগিল যে সহস্র অস্পষ্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশপথ নিরুদ্ধ; দুএকটি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন

করিতেছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম।"

অতঃপর তিনি বর্ণনা করিয়াছেন কিরূপে তিনি নানা বিষয়ে মনোনিবেশের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। "আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না, বরং সেই তীব্র বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকর্ম্মণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল।" তিনি লাল ও কাল পিপীলিকার যুদ্ধ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অত্যাচারপীড়িতদের বাঁচাইলেন। "তথাপি দীর্ঘ দিনার্দ্ধ যাপন করিবার উপায় আর জুটিতেছিল না। মনকে বুঝাইয়া দিলাম, জোর করিয়া চিন্তা আনিলাম, কিন্তু দিন দিন মন বিদ্রোহী হইতে লাগিল, হাহাকার করিতে লাগিল। কাল যেন তাহার উপর অসহ্য ভাব হইয়া পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাকিয়াও নড়িবার শক্তি রহিত।" পূর্ব্বে কতবার একাকী চিন্তায় কালযাপন করিয়াছেন—কিন্তু অল্পদিনের নির্জ্জনতায় কি আকুলতা! "কথা আছে, যে নির্জ্জনতা সহ্য করিতে পারে, সে হয় দেবতা নয় পশু— এই সংযম মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কথায় আমি আগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না; এখন বুঝিলাম সত্য সত্যই যোগাভ্যস্ত সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়।"

কি করিয়া এই ভীষণ অবস্থায় তিনি অবিচল হইলেন তাহা বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "ইতালীয় রাজহত্যাকারী ব্রেসীর ভীষণ পরিণাম মনে পড়িল। তাঁহার নিষ্ঠুর বিচারকগণ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া সপ্ত বৎসরের নির্জ্জন কারাবাসে দণ্ডিত

করিয়াছিলেন। এক বৎসরও অতিবাহিত না হইতেই ব্রেসী উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে এতদিন সহ্য করিলেন ত! আমার মনের দৃঢ়তা কি এতই কম?

"তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন। প্রথমতঃ, কিরূপ মনের গতিতে নির্জ্জন কারাবাসের কয়েদী উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ কারাবাসের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া আমাকে ইয়ুরোপীয় জেল-প্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন, এবং যাহাতে আমার সাধ্যমত আমি দেশের লোককে ও জগৎকে এই বর্ব্বরতা হইতে ফিরাইয়া দয়ানুমোদিত জেল-প্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেষ্টা করি তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বহুপূর্ব্বে মহামতি রাণাডে তাঁহাকে কারা-সংস্কারের ভার লইতে বলিয়াছিলেন সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর লিখিতেছেন, "ভগবানের দ্বিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, আমার মনের এই দুর্ব্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থাপ্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও নির্জ্জনতা সমান হওয়া উচিত!' বাস্তবিক অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধ হয় দশ বৎসর একাকী থাকিলেও মন টলিবে না। মঙ্গলময় অমঙ্গল দ্বারাও পরম মঙ্গল ঘটান।

"তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তিসিদ্ধি বা আনন্দ দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া কার্য্যে লাগান আমার যোগলিপ্সার

একমাত্র উদ্দেশ্য। যে দিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘীভূত হইতে লাগিল, সেদিন হইতে আমি জগতের ঘটনা সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চয্য অনন্ত মঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি।"

অবশেষে এইরূপে ভগবানের করুণা অনুভব করিলেন :—"এইরূপ ভাবে মনের নিশ্চেষ্টতায় পীড়িত হইয়া কয়েকদিন কষ্টে কালযাপন করিলাম। একদিন অপরাহ্নে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তাই আসিতে লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তাসকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন মনে পড়িল যে বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং লুপ্ত বা এক মুহূর্ত্তও ভ্রষ্ট হয় নাই, ববং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব্ব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তখন আমি উন্মত্ততাভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল, সমস্ত শরীবময় এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে পূর্ব্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল।"

তিনি শুধু ব্যক্তিগতভাবে শান্তিলাভ করিলেন না, শীঘ্রই ভগবানের সর্ব্বময়ত্ব উপলব্ধি করিলেন। এই সময়ে ডাঃ ডেলী

তাঁহার সকালে বিকালে একটু বাহিরে বেড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে উপনিষদের গভীর ভাবোদ্দীপক, অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্রসকল আবৃত্তি করিতেন এবং সর্ব্বঘটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। "বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এইরূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচ্চ প্রাচীর, লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্য্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিষপত্র যেন আর অচেতন নহে, যেন সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইত। মনুষ্য, গাভী, পিপীলিকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে, গাহিতেছে, কথা বলিতেছে—অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া; ভিতরে এক মহান্ নির্ম্মল নির্লিপ্ত আত্মা শান্তিময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

"এক একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন; এবং সেই মাধুর্য্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। সর্ব্বদা বোধ হইতে লাগিল যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে। এই ভাব বিকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নির্ম্মল মহতী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সর্ব্বজীবের উপর প্রেমস্রোত বহিতে লাগিল। প্রেমের সহিত

দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব আমার রজঃ প্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইল এবং নির্ম্মল শান্তিলাভ গভীর হইল। মোকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম হইতেই দূর হইয়া গিয়াছিল। এখন বিপরীতভাব মনে স্থান পাইল। ভগবান মঙ্গলময়, আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগৃহে আনিয়াছেন, কারামুক্তি ও অভিযোগ নিশ্চয়ই খণ্ডন হইবে, এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া গেল। ইহার পরে অনেকদিন আমায় জেলের কোনও কষ্টভোগ করিতে হয় নাই।”

ইহাই হইল শ্রীঅরবিন্দের ভূমা, বিশ্বাত্মা, সচ্চিদানন্দ, মহৎ আত্মার উপলব্ধি। তখন হইতেই তিনি মহৎ আত্মা দ্বারা বিধৃত হইলেন। কারাগারে. আসিবার পূর্ব্বেই শান্ত আত্মার উপলব্ধিতে তাঁহার সত্তা গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে সচ্চিদানন্দের উপলব্ধিতে পূর্ণ আনন্দ স্ফুরণ হইল। কারাগার হইতে বাহির হইয়াই শ্রীঅরবিন্দ গীতার বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহার প্রথম প্রকাশ হইতেছে “ধর্ম্মে” লিখিত “গীতার ভূমিকা” এবং যাহার শ্রেষ্ঠদান পণ্ডিচারীতে লিখিত গীতার মহাভাষ্য—“Essays on the Gita”. এ সম্বন্ধে তিনি উত্তরপাড়া অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

“তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয় নি, পরন্তু অনুভূতি উপলব্ধির ভিতর দিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যারা তাঁর কাজ করবার

আকাঙ্ক্ষা করে তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান—রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্যে কর্ম্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নির্ব্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চনীচ, শত্রুমিত্র, জয়পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে, অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না।"

তাঁহাকে যখন সেলের বাহিরে বেড়াইতে দেওয়া হইল তখনকার অনুভূতি বর্ণনা করিয়া বলেন, "যখন আমি বেড়াতাম সেই সময়ে তাঁর শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ করল। যে-জেল আমাকে মানব-জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই, আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব।" *

এইরূপে তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে বাসুদেবকে দেখিলেন, যাহার বর্ণনা আমরা পূর্ব্বেই "কারাকাহিনী"তে পাইয়াছি। এমন কি জেলের কয়েদীদের—সেই সব তমসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপব্যবহৃত দেহের মধ্যে তিনি নারায়ণকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি পুনর্ব্বার ভগবৎ-বাণী পাইলেন :—"পুনরায় ভগবান আমাকে বললেন, 'দেখ, কি সব লোকের মাঝে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি আমার একটু কাজ করবার জন্যে। যে জাতকে আমি তুলতে চাই এই হচ্ছে তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই।"

বিচারালয়েও তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট, সরকারী উকিল প্রভৃতি সকলের মধ্যে বাসুদেব, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন

* উত্তরপাড়া অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের অনুবাদ।

এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থনে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাবে বুঝিলেন তাহাও নারায়ণের নির্দ্দেশ। আবার নির্জ্জন কারাবাসে গভীরতর উপলব্ধি :—"এখন দিনের পর দিন আমি মনের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে, শরীরের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। সে সব আমার কাছে জীবন্ত অনুভূতি হয়ে উঠল, আমার সম্মুখে এমন সব জিনিষ উন্মুক্ত হ'ল জড়বিজ্ঞান যাদের কোন ব্যাখ্যাই দিতে পারে না।"

উত্তরপাড়া অভিভাষণে আমরা শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ধারার একটা স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাই। তিনি বলেন, "বহুদিন পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার কয়েক বৎসর আগে বরোদায় থাকার সময়ে আমি ভগবানকে চেয়েছিলাম এবং দেশের কাজের মধ্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সেই সময়ে যখন আমি ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, তাঁর উপর যে জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল তা বলতে পারি না। আমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী নাস্তিক, ভগবান আদৌ আছেন কিনা সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম না। আমি তাঁর বিদ্যমানতা অনুভব করতাম না। তত্রাপি কি যেন আমাকে বেদের সত্যের দিকে, গীতার সত্যের দিকে, হিন্দুধর্ম্মের সত্যের দিকে আকর্ষণ করত। আমি অনুভব করতাম যে এই যোগের মধ্যে, বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম্মের মধ্যে মহাশক্তিশালী সত্য নিশ্চয়ই আছে।

"তাই যখন আমি যোগের দিকে ফিরলাম, সঙ্কল্প করলাম যে যোগসাধনা করব, দেখব আমার ধারণা সত্য কিনা, তখন আমি এই ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম, ভগবানকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, 'যদি তুমি থাক, তুমি আমার মর্ম্মের কথা জান।

তুমি জান, আমি মুক্তি চাই না, অপরে যা চায় এমন কোন জিনিষই আমি চাই না; আমি শুধু চাই, এই যে ভারতের লোক-সকলকে আমি ভালবাসি, যেন এদের জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি।'

"যোগের সিদ্ধির জন্যে আমি অনেক দিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম এবং শেষ পর্য্যন্ত আমি তা কতকটা লাভ করেছিলাম, কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশী চাইতাম তাতে সন্তুষ্ট হতে পারি নি। তারপর জেলের নিঃসঙ্গতার মধ্যে, নির্জ্জন সেলের মধ্যে, আবার সেটা পাইলাম। আমি বললাম, 'দাও আমাকে তোমার অদেশ। আমি জানি না কি কাজ আমাকে করতে হবে, কেমন করে করতে হবে। আমাকে একটা বাণী দাও।'

"যোগ সাধনার ভিতর দিয়ে দুইটী বাণী এল। প্রথম বাণীটী হ'ল, 'আমি তোমাকে একটা কাজ দিয়েছি এবং সেটি হচ্ছে এই জাতিকে তুলতে সাহায্য করা। শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন তোমাকে জেলের বাইরে যেতে হবে।'

"দ্বিতীয় বাণীটী এল এইরূপ :—'এই এক বৎসর নির্জ্জন বাসে তোমাকে কিছু দেখান হয়েছে, এমন কিছু যা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিল এবং তা হচ্ছে হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা। এই ধর্ম্মটিকে আমি জগতের সামনে তুলে ধরছি; ঋষি, সন্ত, অবতারদের ভিতর দিয়ে এই ধর্ম্মটীকে আমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তুলছি; আর এখন ইহা যাচ্ছে জাতি সকলের মধ্যে আমার কাজ সম্পন্ন করতে। আমার বাণী প্রচার করবার জন্যেই আমি এই জাতিটাকে তুলছি। এইটীই সনাতন ধর্ম্ম, তুমি এই ধর্ম্মকে আগে বাস্তবিক পক্ষে জানতে না, কিন্তু এখন আমি এটী তোমার কাছে প্রকাশ করেছি। তোমার

মধ্যে যে অবিশ্বাসী ছিল, নাস্তিক ছিল তাহার উত্তর দেওয়া হয়েছে, কারণ আমি তোমাকে প্রমাণ দিয়েছি, অন্তরে ও বাহিরে, স্থূলে ও সূক্ষ্মে প্রমাণ দিয়েছি এবং সে প্রমাণে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। যখন তুমি বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে সর্ব্বদা এই বাণীই শোনাবে যে, সনাতন ধর্ম্মের জন্যেই তারা উঠ্‌ছে, নিজেদের জন্যে নয় পরন্তু সমস্ত জগতের জন্যেই তারা উঠ্‌ছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জন্যে………"

কি অমোঘ বাণী! যখন শ্রীঅরবিন্দ এই বাণী প্রাপ্ত হন তখন বোধ হয় কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে ভারত শীঘ্র স্বাধীনতা লাভ করিবে, কিন্তু আজ স্বাধীনতা লাভে সমগ্র ভারত উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আজ সকল নেতাই বলিতেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতাই জগতের রূপান্তরে সহায়তা করিবে।

এই বাণী—আদেশই—শ্রীঅরবিন্দের জীবনকে পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই আদেশ অনুসারেই তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ পণ্ডিচারীতে সাধনায় মগ্ন এবং তাহার মধ্যে পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করিতেছেন। পূর্ণ উপলব্ধি এবং আদর্শে অখণ্ড বিশ্বাস না জন্মিলে কেহ এরূপভাবে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গভীর সাধনায় মগ্ন হইতে পারে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন এ সাধনা তাঁহার নিজের মুক্তির জন্য নহে, ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যোগপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন নিজের মুক্তির জন্য নহে, ভারতকে জাগ্রত করিবার জন্য। এই ত্রিশ বৎসর যাবৎ তাঁহার অখণ্ড যোগসাধনা চলিয়াছে, মানব জীবনকে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করিবার জন্য।

* শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের অনুবাদ।

অতি-আধুনিক মানুষের বর্ত্তমানে যে মনোভাব এককালে শ্রীঅরবিন্দের সেইরূপ মনোভাবই ছিল। আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের মত তিনি সংশয়বাদী ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিজীবীর ন্যায় তিনি সংশয়বাদ লইয়া গর্ব্ব করিতেন না, তাহাকেই চরম জ্ঞান বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার বুদ্ধি ছিল গভীর, তাঁহার হৃদয় ছিল অবারিত—সত্য গ্রহণে উন্মুখ। তাই তাঁহার পূর্ণভাবে সত্য উপলব্ধি হইল নিজের সাধনা দ্বারা, কোন অলৌকিক উপায়ে নহে। ভগবানই প্রচ্ছন্নভাবে ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পরম জ্ঞান দিলেন। জ্ঞানের উদয়ে ভক্তি অবিচল হইল, তাহাকে কর্ম্মে বিকাশ করিবার সঙ্কল্প লইয়া তিনি জেলের বাহিরে আসিলেন। কিন্তু অচিরেই পূর্ণ শক্তিবিকাশের জন্য তিনি পূর্ণযোগ গ্রহণ করিলেন। ইহাই তাঁহার বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইবার কারণ। পূর্ণ সাধনা ত বাহিরের প্রাকৃতিক কর্ম্ম-ঝঞ্ঝার মধ্যে হয় না।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা ত্যাগের পূর্ব্বে কয়েকমাস

প্রায় চারি বৎসর শ্রীঅরবিন্দ বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে ছিলেন, তাহার মধ্যে পূর্ণ এক বৎসর জেলে কাটিয়া গেল। জেল হইতে বাহির হইয়া তিনি দেশবাসীর নিকট বিপুল অভিনন্দন পাইলেন, কিন্তু দেখিলেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নাই। গবর্ণমেণ্টের প্রচণ্ড দমননীতিতে সকলেই সন্ত্রস্থ। কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বাংলার নয় জন নেতা নির্ব্বাসন ভোগ করিতেছেন। তিলক কারাগারে, বিপিনচন্দ্র বিলাতে এবং অন্যান্য নেতারা কেহ কারাগারে, কেহ বা সরিয়া পড়িয়াছেন। ডাঃ মুঞ্জে, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন কোন প্রকারে জাতীয় দলের আদর্শ আঁকড়াইয়া আছেন। মধ্যপন্থীদল আসর জমাইয়া রাখিয়াছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা স্যর রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করিয়া মাদ্রাজে জাতীয়দল-বর্জ্জিত কংগ্রেস করিয়াছেন। ও-দিকে বিপ্লববাদও প্রচ্ছন্নভাবে চলিয়াছে; বোমার হিড়িকে যুবক সমাজ বিভ্রান্ত। জাতীয় আন্দোলনে খুব কম লোকই খোলা-খুলিভাবে যোগ দিতেছেন।

তথাপি জাতীয়দলের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে যথাসম্ভব সংহত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ পুনরুদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে জাতীয়দলের মুখপত্র "বন্দে মাতরম্"-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট উহার প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। "যুগান্তর", "সন্ধ্যা", "নবশক্তি" প্রভৃতি কাগজগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আর পূর্ব্বকার মত রাজনীতিক প্রচার কার্য্য করিতে রাজি হইলেন না, জেলে তাঁহার যে গভীর উপলব্ধি হইয়াছিল তাহারই প্রেরণায় তিনি জাতীয় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। একদিকে তিনি বাংলাকে সনাতনধর্ম্মে, ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া কর্ত্তব্যপালন, জাতীয় ধর্ম্মরক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন, অপরদিকে তদানীন্তন অবস্থায় যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ বর্জ্জন করিয়া ঐকান্তিক ভাবে জাতীয় সংগঠন কার্য্যে দেশবাসীকে প্রেরণা দিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ইংরাজি "কর্ম্মযোগিন্" ও বাংলা "ধর্ম্ম" নামক সাপ্তাহিকদ্বয় নিজেই চালাইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে "বন্দে মাতরম্" যেমন জাতিকে প্রেরণা দিত, তেমনি এই দুইখানি সাপ্তাহিক জাতীয় পাঞ্চজন্য নিনাদ করিতে লাগিল। "কর্ম্মযোগিন্"-এর প্রচ্ছদপট ছিল শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্থ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য পালনে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দও বিভ্রান্ত, অবসন্ন জাতিকে প্রেরণা দিতে লাগিলেন যে সে যেন তমঃ আচ্ছন্ন না হইয়া পড়ে—সত্যে বিশ্বাস থাকিলে, আকাঙ্ক্ষা অবিচল থাকিলে শত বিপত্তিতেও জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। কিন্তু তখন রুদ্রের নৃত্য চলিয়াছে। একদিকে বিপ্লবের বিষাণ, অপর দিকে দমননীতির বিভীষিকা—শ্রীঅরবিন্দের বাণী শুনিবার অবস্থা জাতির ছিল না। তিনিও আদেশ পাইলেন যে, কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গভীরতর সাধনার জন্য তাঁহাকে সুদূরে যাইতে হইবে।

অনেকে মনে করেন যে শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতিক ঝড়-ঝাপটা

সহ্য করিতে না পারিয়া বাংলা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সমস্ত জীবনে তিনি কিরূপে স্বেচ্ছায় বারবার দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, কারাগারের অসহ্য ক্লেশ তিনি অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে পুনর্ব্বার কর্ত্তব্য পালনের জন্য রাজরোষের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইতেছিলেন তাহা "ধর্ম্মে" প্রকাশিত নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় প্যারাগ্রাফটী হইতে বুঝা যায় :—

"আমাদের পুলিশ বন্ধুগণ রটনা করিয়াছেন যে, আবার নির্ব্বাসনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে, এইবার নয়জন নহে, চব্বিশ জনকে মোটরকারে, রেলে, Guide জাহাজে গবর্ণমেণ্টের খরচে নানাপ্রদেশে ও বিবিধ জেলে ঘুরিয়া আসিবার জন্য প্রস্থান করিতে হইবে। পুলিশের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন। আমরা কখনও বুঝিতে পারি নাই, নির্ব্বাসন এমন কি ভয়ঙ্কর জিনিষ যে লোকে নির্ব্বাসনের নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য্য, কর্ত্তব্য, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়ে। চিদাম্বরম্ * প্রভৃতি কর্ম্মবীর বয়কট প্রচার দোষে যে কঠিন দণ্ড হাসিমুখে শিরোধার্য্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই দণ্ড লঘু, অতি অকিঞ্চিৎকর। বাহিরে পরিশ্রম করিতেছিলাম, নানা

* চিদাম্বরম পিলে মাদ্রাজের সুবিখ্যাত জাতীয় নেতা। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বয়কট প্রচারের জন্য ইঁহার সাত বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হয়। জেলে ইঁহার প্রতি অতি জঘন্য কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার করা হয়। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোকে গমন করিয়াছেন।

দুশ্চিন্তার মধ্যে দেশসেবার চেষ্টা করিতেছিলাম, না হয় ভগবান লর্ড মিণ্টো ও মর্লীকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন, যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, নির্জ্জনে আমার চিন্তা কর, ধ্যান কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লিখ, জ্ঞানসঞ্চয় কর, জ্ঞানবিস্তার কর। জনতায় থাকার রস আস্বাদন করিতেছিলে, নির্জ্জনতার রস আস্বাদন কর। এই এমন কি ভয়ানক কথা যে ভয়ে কাতর হইতে হয়? কয়েকদিন প্রিয়জনের মুখ দেখিতে পাইব না—বিলাতে বেড়াইতে গেলে তাহা হয়, অথচ লোকে বিলাতে বেড়াইতে যায়। ধরুন অখাদ্য খাইয়া গ্রীষ্ম ও শীতে কষ্ট পাইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে। বাড়ীতে বসিয়াও রোগের হাত হইতে নিস্তার নাই, বাড়ীতেও অসুখ হয়, মরণ হয়, অদৃষ্ট লিখিত আয়ুক্রম কেহ অন্যথা করিতে পারে না। আর হিন্দুর পক্ষে মরণের ভীষণতা নাই। দেহ গেল, পুরাণ বস্ত্র গেল, আত্মা মরে না। সহস্রবার জন্মিয়াছি, সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিব। ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপন করিতে পারিলাম না, ভারতের স্বাধীনতা ভোগ করিতে আসিব। কেহ আমাকে বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের? সস্তায় ইতিহাসে অমর নাম লিখাইলাম, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত, অথচ কষ্ট নাই, অথচ সামান্য শরীর ক্লেশে মুক্তি ভুক্তি পাইলাম। এই ত' কথা। ট্রান্সভালের কুলীদের * মহৎভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতরভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়।”

পরবর্ত্তী প্যারাগ্রাফে ভারতের স্বাধীনতায় অখণ্ড বিশ্বাসভরে

* ঐ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অধিকার লাভ করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চালাইতেছিলেন।

লিখিয়াছেন,......"যাহা হউক চব্বিশ জনকে নির্ব্বাসন করুন বা একশ জনকে নির্ব্বাসন করুন, অরবিন্দ ঘোষকে নির্ব্বাসন করুন বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীকে নির্ব্বাসন করুন, কালচক্রের গতি থামিবার নয়।"

"ধর্ম্ম" প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালের ৭ই ভাদ্র হইতে। উহাতে বরাবরই সম্পাদকরূপে শ্রীঅরবিন্দের নাম থাকিত। ঐ সালের ২৩শে ফাল্গুন হইতে যে কয়েকখানি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার নাম ছিল না। বোধহয় ঐ সময়ে তিনি পণ্ডিচারী প্রস্থানের পূর্ব্বে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিতেছিলেন। যাহা হউক উপরোক্ত উক্তিটী প্রকাশিত হয় ২৬শে পৌষ তারিখের "ধর্ম্মে"—তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের বহুপূর্ব্বে। তখনই গুজব রটিয়াছিল তাঁহাকে নির্ব্বাসনে পাঠান হইবে।

যাঁহার মনে এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প তিনি যে কোন রাজনীতিক কারণে স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিবেন তাহা একেবারেই অসম্ভব। তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে ভারত-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গভীরতর সাধনায় মগ্ন হইতে হইবে। যদি তাঁহার নেতৃত্বের অহমিকা থাকিত তাহা হইলে তিনি এইরূপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি নেতৃত্বের লালসায় বরোদায় সুখের জীবন ত্যাগ করিয়া বাংলায় আসেন নাই, আসিয়াছিলেন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশমাতাকে সেবা করিবার জন্য, দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার প্রেরণা দিবার জন্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানেও নানা বিঘ্নের ভিতর দিয়া জাতীয় আন্দোলন চলিবে

এবং অচিরে তাহা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কার্য্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই।

তিনি পণ্ডিচারী যাইবার পরও জাতীয় কংগ্রেস বারবার তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছে, তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছে, কয়েকজন জাতীয় নেতা বিভিন্ন সময়ে তাঁহার নিকট গিয়া রাজনীতিতে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তখন জাতীয় আন্দোলন ব্যাপক ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই আবার আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান লইতে পারিতেন। কিন্তু সময় হয় নাই, তাঁহার সাধনা পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। যদি তিনি নেতৃত্ব-অভিলাষী, যশোলোলুপ হইতেন, তাহা চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ বহুকাল পূর্ব্বে বুঝিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "আছ জাগি' পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন।"

যে কয়মাস তিনি বাংলায় ছিলেন সেই সময়ে তিনি লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা জাতির অধ্যাত্ম চেতনা জাগাইবার কার্য্যে ব্রতী হইলেন বটে, কিন্তু অচিরে রাজনীতিক্ষেত্রেও আবার তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইল। সুরাট কংগ্রেসের পর জাতীয়দল কংগ্রেসের সংস্রব একরূপ ত্যাগ করিয়াছিল এবং সেই সুযোগে মধ্যপন্থীদল রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলি করায়ত্ত করিয়াছিল। কাজেই শ্রীঅরবিন্দ অচিরেই জাতীয়দল পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন এবং বলিতে গেলে নেতৃত্বের ভার একা তাঁহাকেই লইতে হইল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যেমন মেদিনীপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনে মধ্যপন্থী-দলের সহিত জাতীয়দলের শক্তি পরীক্ষা হইয়াছিল, তেমনি ১৯০৯

খৃষ্টাব্দে হইল সম্মেলনের হুগ্‌লী অধিবেশনে। সেপ্টেম্বর মাসে ঐখানে সম্মেলন হইবার কথা। অভ্যর্থনা সমিতিতে স্থানীয় মধ্যপন্থী নেতারা যে সকল প্রস্তাবের খস্‌ড়া রচনা করিলেন তাহা জাতীয়দলের আদর্শের ঘোর পরিপন্থী। প্রতিনিধি নির্ব্বাচনেও তাঁহারা এমন ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে তরুণগণ, বিশেষতঃ ছাত্রেরা যোগদান করিতে না পারে। এমন কি তাঁহারা চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না যাহাতে শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই "ধর্ম্মে" লিখিয়াছিলেন :—

"বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে যাহাতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ কোন জেলাসমিতি দ্বারা হুগ্‌লী অধিবেশনে প্রতিনিধি নিযুক্ত না হন কয়জন পরম দেশহিতৈষী সেজন্য গোপনে চেষ্টা করিয়াছে। এই জঘন্য নীতি এখনও আমাদের রাজনীতিতে স্থান পায় ইহা বড় দুঃখের কথা। অরবিন্দ বাবুকে যদি বয়কটই করিতে হয় করুন। তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, তিনি দুঃখিত হইবেন না। তিনি কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করেন নাই, পূর্ব্বে অনেকদিন স্বপথে একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতেও যদি একাকী যাইতে হয় ভয় করিবেন না। কিন্তু যদি এই মতই গৃহীত হয় যে, দেশের হিতের জন্য বা আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অরবিন্দ বাবুর সংশ্রব বর্জ্জনীয়, প্রকাশ্যে দেশের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই মত প্রচারে কুণ্ঠিত হন কেন? এ গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দ্বারা আপনাদের বা দেশের কি হিত সাধিত হইবে, তাহা বুঝা যায় না। ইতিমধ্যেই ডায়মণ্ড হারবার হইতে অরবিন্দবাবু প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তোমাদের কন্‌ভেনসন্ নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে হুগ্‌লী অধিবেশন হইতেছে না, যে কোন সভা যে কোন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

করিতে পারে। ফলতঃ গুপ্তনীতি যেমন জঘন্য, তেমনি নিষ্ফল। কপটতার অভাব ইংরাজদের রাজনীতিক জীবনে একটা মহান গুণ; তাহারা যাহা করিতে হয় সাহসের সহিত সকলের সমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে, আর্য্যভাবে করে। ভারতের রাজনীতিক জীবনে এই মহান গুণের অবতারণা করিতে হইবে। চাণক্যনীতি গণতন্ত্রে পোষায়, প্রজাতন্ত্রে কেবল ভীরুতা ও স্বাধীনতা রক্ষণের অযোগ্যতা আনয়ন করে।”

জ্যোতিষ বাবুর পুস্তকে আমরা পাই (তিনি এই সম্মেলনের একজন কর্ম্মী ছিলেন) যে, শ্রীঅরবিন্দ দৃঢ়তার সহিত মধ্যপন্থীগণের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেন। তিনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচনপত্র নিজের প্রেসে ছাপাইয়া প্রতিনিধির ২১ বৎসর বয়সের গণ্ডী উঠাইয়া সাহসভরে রিস্‌লে সাকুর্লার অমান্য করিয়া ছাত্রদিগকে রাজনীতিতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন, অভ্যর্থনা সমিতির ছাত্রপ্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নিষেধ উপেক্ষা করেন এবং জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন অধ্যাপকদিগকে পরামর্শ দেন যে তাঁহারা যেন নানাস্থানে সভা করিয়া সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সহায়তা করেন। তিনি হুগ্‌লীর জাতীয়দলকে নির্দ্দেশ দেন যে ছাত্রদের লইয়া স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হউক (অভ্যর্থনা সমিতি তাহাও নিষেধ করিয়াছিলেন)। অভ্যর্থনা সমিতি যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে বলিয়া ছাপাইয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দ প্রতি প্রস্তাবের পাশে জাতীয়দলের প্রস্তাব লিখিয়া পুনরায় উহা ছাপাইয়া জাতীয়দলের প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিতরণ করেন। এইরূপে তিনি সদলবলে সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার এই দৃঢ়তা ও তৎপরতায় সম্মেলনে খুব উৎসাহ হইল।

মধ্যপন্থীদল নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জনতার ধিক্কার ধ্বনিতে তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল। শ্রীঅরবিন্দের চেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হইল এবং অবশেষে জাতীয় দলের প্রস্তাবগুলিই সম্মেলনে গৃহীত হইল।

জ্যোতিষবাবু দেখাইয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দের কার্য্যের ফলে যেমন মধ্যপন্থীদল জাতীয়দলের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, তেমনি তাঁহারই চেষ্টায় দলাদলি ঘটিল না—যেমন মেদিনীপুরে হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষ দলকেও অবশেষে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে হইল।

১৩১৬ সালের ২৮শে ভাদ্র তারিখের "ধর্ম্মে" শ্রীঅরবিন্দ "হুগ্‌লীর পরিণাম" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখেন, "বঙ্গদেশ যে জাতীয়ভাবে পূর্ণ হইয়াছে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন জাতীয়পক্ষের দুর্ব্বলতা ও সংখ্যার অল্পতাই অনুভূত হইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া এই বর্ষব্যাপী দলন ও নিগ্রহে এই দলের কি অদ্ভুত শক্তিবৃদ্ধি ও তরুণদলের হৃদয়ে কি গভীর জাতীয়ভাব ও দৃঢ় সাহস জন্মিয়াছে তাহা দেখিয়া প্রাণ আনন্দিত ও প্রফুল্ল হইল।" অতঃপর তিনি নবীনদলের "শৃঙ্খলা ও নেতাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতার" উল্লেখ করিয়া মধ্যপন্থীদলের মনোভাব বিশ্লেষণ করেন এবং জাতীয়দল কর্ত্তৃক কংগ্রেসে মিলনের চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া লিখেন, "এই অবস্থায় একতা অসম্ভব, কিন্তু যে ক্ষীণ আশা এখনও বিদ্যমান, তাহাই জাতীয়পক্ষ ধরিয়া আছেন, সেই আশায়, সংখ্যায় অধিক হইলেও, সর্ব্ববিষয়ে মধ্যপন্থীদিগের নিকট ইচ্ছা করিয়া হার মানিয়াছেন। এইরূপ ত্যাগস্বীকার ও আত্মসংযম সবল পক্ষই দেখাইতে পারে।"

অতঃপর তিনি জাতীয়দলের উদ্দেশ্যে লিখেন, "কিন্তু আমরা এই ক্ষীণ আশার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। কবে কোন্ অতর্কিত দুর্বিপাকে বঙ্গদেশের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের জাতীয়পক্ষ আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বঙ্গদেশ ভারতের নেতা, বঙ্গদেশের দৃঢ়তা, সাহস ও কর্ম্মকুশলতায় সমস্ত ভারতের উদ্ধার হইবে, নচেৎ হওয়া অসম্ভব। অতএব আমরা জাতীয়দলকে আহ্বান করিতেছি, এখন কার্য্যক্ষেত্রে আবার অবতরণ করি, ভয়, আলস্য, নিশ্চেষ্টতা দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাধকের সাজে না। দেশময় জাতীয় ভাব প্রবল ভাবে জাগ্রত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্মদ্বারা প্রকৃত আর্য্যসন্তানরূপে পরিচয় দিতে না পারিলে সেই জাগরণ, সেই প্রাবল্য, সেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ স্থায়ী হইবে না।"

সুরাট কংগ্রেসের পর বাংলাই জাতীয়দলের আশাস্থল ছিল, কারণ মধ্যপন্থীদল একেবারেই সরকার-ঘেঁষা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার পরিচালনা করিতে একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। "ধর্ম্মে"র দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা জানিতে পারি যে, মধ্যপন্থীদল মাদ্রাজ কন্‌ভেন্‌সনে সম্মিলিত হইয়া "জাতীয় মহাসভা নাম ধারণ পূর্ব্বক বয়কট বর্জ্জন দ্বারা বঙ্গদেশের মুখে চূণকালি মাখাইয়াছিল, বাংলাদেশের মধ্যপন্থী নেতাগণ নীরবে এই লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সহ্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।"

ঐ সংখ্যায় অপর এক প্যারাগ্রাফে শ্রীঅরবিন্দ লিখেন, "শাসন-সংস্কারের ছায়ায় যে ভেদ-নীতি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে

লর্ড মর্লি তাহা রোপণ করিয়াছেন, দেশহিতৈষী গোখ্‌লে মহাশয় জল সিঞ্চন করিয়া সযত্নে পালন করিতেছেন।" "লর্ড মর্লির দ্বিতীয় চেষ্টা, রাজনীতিক ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে পৃথক করা। ইহাই ভেদ-নীতির দ্বিতীয় অঙ্গ, শাসন-সংস্কারের দ্বিতীয় বিষময় ফল।" অতঃপর তিনি লিখেন, "এই সংস্কারে বঙ্গবাসীর লেশমাত্র আস্থা নাই। যদি কয়েকজন বড়লোক এই নূতন শাসন-প্রণালীতে যোগদান করিবার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া দেশের প্রকৃত হিত ভুলিয়া যান, তাহাতে দেশের কোন অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর ন্যায় সর্ব্বজনপূজিত নেতা এই বিষবৃক্ষে জল সেচন করিলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বুঝিতে হইবে।"

কিন্তু মধ্যপন্থীদলের মনোভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। যদিও সুরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ গোখ্‌লের মত বয়কট নীতির নিন্দা করেন নাই, তথাপি হুগ্‌লী প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন জাতীয়দলকে অধীর ও অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "বয়কট বিষরহিত প্রেমময় স্বদেশীতে পরিণত করাও নেতাদের স্থির অভিসন্ধি। স্বয়ং সভাপতি (বৈকুণ্ঠনাথ সেন) মহাশয় শেক্সপীয়রকে প্রমাণ করিয়া বয়কট নাম বয়কট করিবার পরামর্শ দিলেন, পাছে মর্লি-মডারেট মিলনমন্দিরে বিদ্বেষবহ্নি প্রবেশ করিয়া সব ভস্মসাৎ করে।"

এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ মধ্যপন্থীদলের "পর-নির্ভরতা ও জড়ত্বের" বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়া জাতীয়দলকে কর্ত্তব্য সাধনে আহ্বান করিলেন :—"এই অবস্থায় যাঁহারা দেশের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা ভয়ের পরিচয় রাখেন না, ভগবান ও

বঙ্গজননী ভিন্ন কাহাকেও জানেন না ও মানেন না, তাঁহারা অগ্রসর না হইলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে।" ঝালকাঠিতে বরিশাল জেলা সম্মেলনের অধিবেশনেও তিনি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর দেশের যেন আগেকার মত সাড়া দিবার ক্ষমতা ছিল না। একা তিনি কি করিবেন? একদিকে মধ্যপন্থীদলের বিপক্ষতা, অন্যদিকে জাতীয়দলে নেতার অভাব। এমন কি সংবাদপত্রগুলি বয়কট আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ভয় পাইত। জাতীয়দলের দৈনিক সংবাদপত্রের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ লিখেন, "সেদিন কলেজ স্কোয়ারে এক স্বদেশী সভা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ও বক্তৃতার সারাংশ একটী সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পত্রিকার কর্ত্তাগণ প্রকাশ করিতে অসম্মত হন। সেই সভায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং ঘন ঘন বয়কটের উল্লেখ হইয়াছিল, ইহাতে বোধ হয় কর্ত্তাগণ ভীত ও বিরক্ত হইলেন। সে ভয় ও বিরক্তি স্বাভাবিক, আজকালকার দিনে বয়কট নামের যত কম উল্লেখ হয়, ততই ব্যক্তিগত মঙ্গল সম্ভব।"

শুধু তাহাই নয়, ৭ই আগষ্ট স্বদেশী উৎসব উপলক্ষে কলেজ স্কোয়ার হইতে মিছিল বাহির হইবার কথা লইয়া গোল হইয়াছিল। "কলেজ স্কোয়ারের নামে কর্ত্তারা এত ভীত হইয়াছিলন যে সেইদিন সভাপতি সভাপতিপদ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অগত্যা মিছিল পান্তির মাঠ হইতে বাহির হইবার ব্যবস্থা হইল।" এমন কি ৩০শে আশ্বিন "রাখীবন্ধন" দিবসে কর্ত্তারা জাতীয় ঘোষণাপত্র পাঠের কথা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া,

শ্রীঅরবিন্দ "ধর্ম্মে"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেন, "আমরা বঙ্গভঙ্গের কুফল নিবারণ করিব, জাতীয় একতা সংরক্ষণ করিব, এই পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিব, এই কথাও ঘোষণা করিতে যদি সাহসে না কুলায়, তাহা হইলে ৭ই আগষ্টের ও ৩০শে আশ্বিনের অনুষ্ঠান বন্ধ কর। এতটুকু তেজ ও সাহস যদি না থাকে, তাহা হইলে জাতীয় জাগরণ ও উন্নতির চেষ্টা বিফল বুঝিতে হইবে, বৃথা তাহার বাহ্যিক আড়ম্বর করা মিথ্যাচার মাত্র।"

কিন্তু দেশের ভাগ্যচক্র অন্যদিকে ঘুরিতেছে। "মধ্যপন্থীদল তাঁহাদের চিরবাঞ্ছিত শাসন-সংস্কার পাইয়াছেন, কিন্তু সেই লাভে হর্ষোৎফুল্ল না হইয়া শোকসন্তপ্ত হইতেছে।" তথাপি তাঁহাদের চেতনা নাই। ওদিকে সন্ত্রাসবাদীদের দলনের সুযোগে পূর্ণভাবে পীড়ন নীতি চলিয়াছে। এই দারুণ রাজনৈতিক দুর্য্যোগে শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন :—

"বঙ্গবাসী, অনেকদিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ; যে সব জাগরণ হইয়াছিল, যে নবপ্রাণ-সংস্কারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ম্রিয়মাণ অবস্থায় অর্দ্ধনির্ব্বাণ প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় অল্প অল্প জ্বলিতেছে। এখন সঙ্কটাবস্থা, যদি বাঁচাইতে চাও, মিথ্যা ভয়, মিথ্যা কূটনীতি ও আত্মরক্ষার চেষ্টা বর্জ্জন করিয়া কেবলই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবার সম্মিলিত হইয়া কার্য্যে লাগ। যে মিলনের আশায় এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম, সে আশা ব্যর্থ। মধ্যপন্থীদল জাতীয়পক্ষের সহিত মিলিত হইতে চায় না, গ্রাস করিতে চায়। সেইরূপ মিলনের ফলে যদি দেশের হিত হইত, আমরা বাধা দিতাম না। যাঁহারা সত্য-প্রিয়, মহান্ আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, ভগবান ও ধর্ম্মকে

একমাত্র সহায় বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁহারা না হয় সরিয়া যাইতেন, যাঁহারা কূটনীতির আশ্রয় লইতে সম্মত, তাঁহারা মধ্যপন্থী-দলের সহিত যোগদান করিয়া, মেহ্‌তার আধিপত্য, মর্লির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দেশের হিত করিতেন। কিন্তু সেইরূপ কূট-নীতিতে ভারতের উদ্ধার হইবার নহে। ধর্ম্মের বলে, সাহসের বলে, সত্যের বলে ভারত উঠিবে। যাঁহারা জাতীয়তার মহান্ আদর্শের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জননীকে আবার জগতের শীর্ষস্থানীয়, শক্তিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী, বিশ্বমঙ্গলকারিণী ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া মানবজাতির সম্মুখে প্রকাশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা মিলিত হউন, ধর্ম্মবলে, ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকার্য্য আরম্ভ করুন। মায়ের সন্তান! আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়াছ, আবার ধর্ম্মপথে এস। কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বলে যেন কার্য্য না কর, সকলে মিলিয়া এক প্রতিজ্ঞা, এক পন্থা, এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যাহা ধর্ম্মসঙ্গত, যাহাতে দেশের হিত অবশ্যম্ভাবী, তাহাই করিতে শিখ।" ("ধর্ম্ম", ১২ই পৌষ, ১৩১৬)

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দমননীতির প্রকোপে দেশবাসীর আর জাগিবার উপায় রহিল না। গবর্ণমেণ্ট এমন আইন প্রবর্ত্তিত করিলেন যাহাতে সকল প্রকার সভাসমিতি বন্ধ করা যাইত। ইহাই হইতেছে "শাসন-সংস্কারের নবযুগের প্রথম অবতারণা।" গবর্ণমেণ্টের ধারণা হইয়াছিল যে, এই উপায়ে রাজনীতিক হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ প্রশমিত হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ব্যর্থতা দেখাইয়া শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন, "যাহাতে এই রাজনীতিক হত্যা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি দেশ হইতে উঠিয়া যায়, আমরাও সেই চেষ্টা করিতে চাই। কিন্তু তাহার একমাত্র উপায়, বৈধ উপায় দ্বারা ভারতের

রাজনীতিক উন্নতি ও স্বাধীনতা সাধিত হইতে পারে, ইহাই কার্য্যেতে দেখান। কেবল মুখে এই শিক্ষা দিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, কার্য্যেতেও বুঝাইতে হইবে। সেই পুণ্যকার্য্যে তোমরাই বাধা দিতে পার। কিন্তু তাহাতে যেমন আমাদের বিনাশ হইবে, তোমাদের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা।"

রাজনীতিক আন্দোলন একেবারে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি কেন এই রাজনীতিক অনাচার? "এতদিন কি সভাসমিতি বন্ধ ছিল না? চরমপন্থীদলের সভাসমিতি অনেক দিন লোপ পাইয়াছে, মধ্যপন্থী নেতাগণও নির্ব্বাসনের পরে আর সভাসমিতিতে যোগদান করা বন্ধ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কলেজ স্কোয়ারে যে স্বদেশী সভা হয়, তাহাতে কোন বিখ্যাত বক্তা উপস্থিত হন না, দর্শকমণ্ডলীও সংখ্যায় মগণ্য। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ জেল হইতে আসিবার পরে কয়েকদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন বটে, তিনিও হুগ্‌লী প্রাদেশিক সভার পরে নীরব হইয়া পড়িয়াছেন।......সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে হত্যা ও ডাকাইতির বৃদ্ধি দিন দিন হইতেছে। তাহাই স্বাভাবিক, ভিতরে বহ্নি থাকিলে অবাধ নির্গমনেই তাহা নিরাপদে ক্ষয় হয়, নির্গমনের পথ বন্ধ করায় তাহার তেজ বৃদ্ধি হয়, ফলে নির্গমনের পথ খুলিয়া প্রতিরোধককে বিনাশ করিতে বাহির হয়।"

এই অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন, "এখন বিবেচ্য এই, এই অবস্থায় জাতীয়পক্ষ কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? আমরা আইনের ভিতর আমাদের রাজনীতিক কার্য্য আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত আছি। আইনের গণ্ডী যদি এত সঙ্কীর্ণ হয় যে তাহার ভিতরে প্রকাশ্য আন্দোলন আর চলে না, তাহা হইলে আমাদের কি উপায় রহিয়াছে? এক উপায়, নীরবে এই সমস্ত

ভ্রান্তনীতির ফল অপেক্ষা করা। আমরা জানি, গবর্ণমেণ্টও জানে যে, ভারতবাসীর স্বাধীনতার আশা নির্ব্বাপিত হয় নাই, মস্তকে নিগ্রহদণ্ডের প্রহার করায় অসন্তোষ প্রেমে পরিণত হয় নাই। প্রজার স্পৃহা, প্রজার অসন্তোষ নিজের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গুমরিয়া রহিয়াছে। এখনও বিপ্লবকারীগণ লোকের মন গুপ্ত হত্যা ও বল প্রয়োগের পথে টানিতে পারে নাই, কিন্তু কবে টানিতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একবার সেই অনর্থ ঘটিলে গবর্ণমেণ্টের বিপদ ও দেশের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। আমরা এই আশঙ্কায় এবং দেশের নবজীবন রক্ষার আশায় জাতীয়পক্ষকে সুশৃঙ্খল করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে স্বাধীনতা লাভের নির্দ্দোষ পন্থা দেখাইতে পারিলে গুপ্ত হত্যা দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। এখন বুঝিলাম ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেই উপায় অবলম্বন করিতে দিবে না।”

এই মন্তব্য ৪ঠা মাঘের “ধর্ম্মে” প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায়ই “আমাদের আশা” শীর্ষক এক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখেন :—“দুই বৎসর নিপীড়ন, দুর্ব্বলতা ও পরাজয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধ্যে শক্তির উৎস অন্বেষণ করিতে শিখিতেছে। বক্তৃতার উত্তেজনা নহে, ম্লেচ্ছদত্ত বিদ্যা নহে, সভাসমিতির ভাব সঞ্চারিণী শক্তি নহে, সংবাদপত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে, নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর, অবিচলিত, অভ্রান্ত, শুদ্ধ, সুখদুঃখজয়ী, পাপপুণ্যবর্জ্জিত শক্তি সম্ভূত হয়, সেই মহাসৃষ্টিকারিণী, মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী, ঐশ্বর্য্যদায়িনী মহালক্ষ্মী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই তেজের সংযোজনে একীভূতা চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে

ও জগতের কল্যাণে কৃতোদ্যম হইবেন। ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্যমাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের সভ্যতার শক্তি প্রদর্শন এবং জগতময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার। আমরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে, সভাসমিতির বলে, বক্তৃতার জোরে, বাহুবলে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসন আদায় করিতে পারিতাম, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্য-ভাব-যুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহির্মুখী শক্তিকে অন্তর্মুখী করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বারবার বলিতেন, শক্তিকে অন্তর্মুখী কর, কিন্তু সময়ের দোষে তখন কেহ তাহা করিতে পারে নাই, স্বয়ং করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভগবান আজ তাহা ঘটাইয়াছেন। ভারতের শক্তি অন্তর্মুখী হইয়াছে। যখন আবার বহির্মুখী হইবে, আর সেই স্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সেই ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃত স্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।"

ইহাই হইল শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক জীবন ত্যাগ করিয়া পূর্ণভাবে যোগজীবন গ্রহণের ইঙ্গিত, তাঁহার পূর্ণ সাধনার উদ্দেশ্য। যে প্রেরণায় তিনি বরোদা হইতে আসিয়া ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রেরণার ঊর্দ্ধগতিতে তিনি পণ্ডিচারীতে সাধনামগ্ন হইলেন। সেই সাধনার ফলে তিনি মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর—জ্ঞান, শক্তি, শ্রী ও দিব্যপরিপূর্ণতার স্বরূপ উপলব্ধি—পৃথিবীতে পরাপ্রকৃতির বিকাশের

ক্ষণের প্রতীক্ষায় আছেন এবং মানবকে পার্থিব সত্তার ঊর্দ্ধে দিব্যসত্তা উপলব্ধি করিবার ও তাহার সাহায্যে মানবজীবনকে পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করিবার পথ প্রদর্শন করিতেছেন। কলিকাতায় থাকিতেই তিনি এই মহাসম্ভাবনার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন, কাজেই লৌকিক বুদ্ধিবশে পার্থিব কোন আদর্শকেই শ্রেয় মনে করেন নাই। দিব্য ইঙ্গিতেই তিনি পণ্ডিচারী প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

পণ্ডিচারী প্রস্থান

বাংলা ১৩১৬ সালের শেষ ভাগে (১৯১০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে) শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতা ও চন্দননগরে অবস্থান করেন, এবং মাসখানেক পরে সমুদ্রপথে পণ্ডিচারী যাত্রা করেন। তখন তাঁহার সঙ্গী ছিলেন চারজন—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৺সৌরীন্দ্রনাথ বসু ও ৺বিজয়কুমার নাগ। চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ কয়েকদিন শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের বাটীতে অবস্থান করেন। সেই সময় হইতে মতিবাবুর জীবনের যে গভীর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা তিনি "জীবন-সঙ্গিনী" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মতিবাবুর লেখায় শ্রীঅরবিন্দের যোগী মূর্ত্তিটী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।*

বাংলার কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কেন শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারীতে প্রস্থান করিলেন, পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার অবর্ত্তমানেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিবে এবং তাহা ক্রমশঃ সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইবে। যে-বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন তাহার অমোঘ শক্তি তিনি ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন

* বর্ত্তমানে শ্রীযুত মতিলাল রায়ের সহিত শ্রীঅরবিন্দের কোন সম্বন্ধ নাই। রায় মহাশয় সম্পূর্ণভাবে নিজপথে চলিতেছেন।

এবং বুঝিয়াছিলেন কালক্রমে তাহা বিরাট মহীরুহে পরিণত হইবে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি চাহিয়াছিলেন জাতির জীবনে ভাগবত শক্তির বিকাশ—মানব জীবনের, মানব স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন—মানুষের সম্মুখে ভাগবত আদর্শ স্থাপন করা। তিনি শুধু ব্যক্তিগত ভাবে ভাগবত উপলব্ধি, যোগসিদ্ধি চাহেন নাই; পরে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি বহুপূর্ব্বেই বাঁধা সড়ক ধরিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারিতেন।

এই অভিনব সাধনা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ স্বেচ্ছায় বাংলা ত্যাগ করিলেন, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিলেন। সংসার তিনি কোন দিনই করেন নাই—গার্হস্থ্য জীবনেও তিনি ছিলেন যোগী। বিবাহ করিলেও দীর্ঘকাল পত্নীর সহিত বসবাস করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। সংসারীর জীবন কোন দিনই তাঁহার আদর্শ ছিল না। তাঁহার পত্নীকে সেই অভিনব পথের পথিক হইতে তিনি কিরূপে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পত্নীকে লিখিত তিনখানি পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। আলিপুরের বোমার মামলায় পুলিশ এই তিনখানি পত্র দাখিল করে—উদ্দেশ্য ছিল ইহা প্রমাণ করা যে তিনি নিগূঢ় ভাবে বিপ্লববাদের আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন—বিপ্লববাদ যেন তাঁহার মজ্জাগত! কিন্তু বিচারে প্রমাণিত হইল তাহা সশস্ত্র বিপ্লববাদের আদর্শ নহে। তাঁহার লেখায় এই আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছিল: "আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছিনা, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের

উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের গতি কোনদিকে তাহাও তাঁহার নিজের মধুর ভাষায় পত্নীর নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম চিঠিখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন: "তুমি বোধ হয় টের পেয়েছ যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। ...পাঁচজনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগ্‌লামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিযা কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগ্‌লী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন?

"আমার তিনটী পাগ্‌লামী আছে। প্রথম পাগ্‌লামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের; যাহা পরিবারের ভরণ পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। ......এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ

আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়। কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে?......"

যিনি বরোদায় থাকিতে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াও কোনদিন এক পয়সা বিলাসে ব্যয় করেন নাই, যিনি সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি এত ত্যাগেও তৃপ্ত নহেন! তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহারই মতন অম্লান বদনে অভাব ও দুঃখ ভোগ করিতেন, তিনি কোনদিন তাঁহাদের ধনী আত্মীয়দিগকে অভাবের কথা জানিতে দেন নাই। পরে একেবারে রিক্ত অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারী গমন করেন; সেখানে প্রথমে কি অভাবের মধ্যে তাঁহাদের দিন কাটাইতে হইয়াছে তাহার কিছু পরিচয় মতিবাবু ও বারীন্দ্র-কুমারের লেখায় পাওয়া যায়। আজ পণ্ডিচারী আশ্রমে শ্রী ও সমৃদ্ধি পরিস্ফুট—কিন্তু সে-সমৃদ্ধির মধ্যে আজও শ্রীঅরবিন্দ নির্লিপ্ত। কোনদিন তাঁহার কিছু চাহিদা ছিল না, আজও নাই।

পণ্ডিচারীতে দারুণ রিক্ততার ভিতরও তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গীদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার হৃদয়ের অপরিসীম মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের পরিচয় আমরা "কারাকাহিনী"তে পাইয়াছি। দেশপূজ্য নেতারূপে যখন তিনি কারাগারে তখন সঙ্গীদের সহিত একত্র বাসকালে কোনদিন কাহাকেও কোনরূপ ব্যবধান বুঝিতে দেন নাই, বরং সকলের সহিত ঠাট্টা তামাসায় যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

তাঁহার জনৈক সঙ্গী কারাগারের এই কাহিনীটী লিখিয়াছেন:

কানাইলাল দত্ত রাত্রে নানারূপ উপদ্রব করিয়া সঙ্গীদের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেন। একদা তিনি কাহারও এক টিন বিস্কুট গোপনে হস্তগত করিয়া তাহা উদরসাৎ করিতেছিলেন এবং মহা আনন্দে টিনটী বাজাইতেছিলেন। এই উৎপাতে শ্রীঅরবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহাকে জাগ্রত দেখিয়া কানাইলাল তাড়াতাড়ি কয়েকখানি বিস্কুট তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন—শ্রীঅরবিন্দও রহস্যভরে তাহা লইয়া তাড়াতাড়ি চাদরের মধ্যে লুকাইলেন!

অনেকে দুঃখ করেন, এমন লোক কেন সব ছাড়িয়া অত দূরে গেলেন? সত্যই তিনি অতি সাধারণভাবে সকলের সহিত মিশিয়াছিলেন, কিন্তু গতানুগতিক জীবনযাপন করা, শুধু মানবীয় মহত্ত্ব দেখান ত তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না? যে-প্রেরণা তাঁহাকে সুদূর পণ্ডিচারী লইয়া গিয়াছিল তাহার আভাস তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বহু পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন। উপরোক্ত পত্রখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন: "দ্বিতীয় পাগ্‌লামীটা সম্প্রতি ঘাড়ে চেপেছে। পাগ্‌লামীটা এই, যে, কোন-মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন করিতে হইবে। আজকালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক!—তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দু ধর্ম্ম বলে, নিজের শরীরের, নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা

নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকে সেই পথে নিয়ে যাই।......"

পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিবার পথ তিনি কারাগারে পাইলেন—ভগবান স্বয়ং তাঁহার সহায়ক হইলেন। কিন্তু শুধু ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়া তিনি তৃপ্ত হইলেন না—তিনি জগতে ভাগবত-জীবনের অভিব্যক্তি করিবার সাধনায় এই সুদীর্ঘকাল মগ্ন রহিয়াছেন। স্বদেশ প্রেমও তাঁহাকে বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। তাঁহার স্বদেশ প্রেমকে লৌকিক বলা অন্যায়—তাহা ঐশ্বরিক প্রেমেরই রূপান্তর মাত্র। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লিখিয়াছিলেন : "তৃতীয় পাগ্‌লামী এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিযা জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। · ..."

স্বদেশকে যে তিনি ভগবানের বিগ্রহরূপে দেখিতেন তাহা "ধর্ম্মে" 'সাধনার পথ' নামক প্রবন্ধেও প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "এমন যুগও আসে যখন মানুষ ভগবানকে না চাহিলেও ভগবান মানুষকে না চাহিয়া থাকিতে পারেন না। তখন তিনি তাঁহার পরম প্রেমস্বরূপ প্রকট করিয়া আপনা হইতে সম্পূর্ণরূপে মানুষের নিকট আসিয়া ধরা দেন। আজ সেই শুভদিন আসিয়াছে —হে ক্ষুদ্র, হে ক্লান্ত, হে বিমুখ, তুমি বোধ হয় ভগবানকে চাওনা, কিন্তু আজ তিনি যে তোমার দ্বারে ভিখারীরূপে দণ্ডায়মান—স্বদেশমূর্ত্তি ধরিয়া, সেবামাত্র চাহিতেছেন।"

সত্যই কি অগ্নিগর্ভ মন্ত্র তিনি জাতিকে শুনাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বাংলা ত্যাগের পর দুই যুগ ধরিয়া সহস্র সহস্র নরনারী

আত্মত্যাগ করিয়াছে, দুঃখকষ্ট, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিয়াছে; ভারত শত শত ত্যাগী নেতার আবির্ভাব দেখিয়াছে; আব্রহ্ম হিমাচল জাগ্রত হইয়াছে, ভারতের গণদেবতা জাগ্রত হইয়াছে।

কিন্তু তিনি নিজে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভেই ভারতের চরম সার্থকতা হইবে না, ভারতের সত্তা বিকশিত হইবে আরও গভীরতর সাধনায়। তাই তিনি ভারতের নেতৃবর্গের আহ্বান বারংবার উপেক্ষা করিয়া সাধনা পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রাচীন ভারতে মানবসত্তার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হইয়াছিল—ভাবী ভারতে মানবসত্তার দিব্যবিকাশ সম্ভাবনা হইবে, ইহাই হইল শ্রীঅরবিন্দের সাধনা।

যাঁহার নিকট শ্রীঅরবিন্দ সর্ব্বপ্রথমে এই মহান্ আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তিনি ইহজীবনে দীর্ঘকাল শ্রীঅরবিন্দের সাথী হইতে পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ বাংলা ত্যাগ করিবার নয় বৎসর পরে—১৩২৫ সালের ২রা পৌষ—মৃণালিনী পরলোকগত অধ্যক্ষ গিরিশ চন্দ্র বসুর বাটীতে দেহত্যাগ করেন।

নবম অধ্যায়

পণ্ডিচারী যোগাশ্রমে

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারীতে পদার্পণ করিলেন। প্রথমে সঙ্গে ছিলেন সুরেশচন্দ্র ও বিজয়কুমার; নলিনীকান্ত কয়েকমাস পরে আসিয়া যোগদান করেন; এবং তারও পরে আসেন সৌরীন্দ্রনাথ। পূর্ব্ব-জীবনের সহিত যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইল, নবজীবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হইল। পণ্ডিচারীর নির্জ্জনতায় শ্রীঅরবিন্দের নীরব সাধনা সুরু হইল। কর্ম্মক্ষেত্রের পূর্ণ কোলাহল হইতে পূর্ণ নিস্তব্ধতা! কিন্তু ইহা সেই বরোদার জ্ঞান-তপস্যার নিস্তব্ধতা নহে—জীবনকল্লোলের বহু উর্দ্ধে, পৃথিবীর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ঘূর্ণির বাহিরে শান্ত সনাতন বিশ্বাত্মিকা সত্তার সহিত নিবিড় পরিচয়,—যেন নির্ঝরিণী পৃথ্বীর লীলাবৈচিত্র্য উপভোগ করিয়া, ধরাকে সরস করিয়া মহার্ণবের অসীমতায় আত্মহারা হইল! পণ্ডিচারীর সাগরতীরেই শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।

সহায়-সম্পদহীনতা, দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা, রাজরোষের ক্ষুব্ধ আস্ফালন, কিছুই শ্রীঅরবিন্দকে বিচলিত করিতে পারিল না। দক্ষিণ-ভারতের জাতীয়দলের কয়েকজন নেতা তখন পণ্ডিচারীতে স্বেচ্ছানির্ব্বাসনে ছিলেন; তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দকে পাইয়া হৃষ্ট হইলেন এবং মনে করিলেন ওখান হইতে তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে প্রাণসঞ্চার করিবেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ পাইয়াছেন মহত্তর আহ্বান

—রাজনীতিক কর্ম্মদ্বারা, এমন কি দেশের মুক্তিসাধনায়ও সে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তিনি নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারিলেন না।

অচিরেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস হইতে বার বার আহ্বান আসিতে লাগিল। বহু নেতা পণ্ডিচারী গিয়া তাঁহাকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন, কংগ্রেস তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিল, কিন্তু কিছুই তাঁহাকে মহৎ সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। কালক্রমে তাঁহার রাজনীতিক জীবনের সঙ্গীদিগের কারাজীবন শেষ হইল; তাঁহারা আকুল আগ্রহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু বুঝিলেন যে পূর্ব্বজীবনের পুনরাবর্ত্তন সম্ভব নহে। যাঁহারা তাঁহার মহান্ আদর্শের মর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন তাঁহারা সেখানেই রহিয়া গেলেন, অপর সকলে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের উৎকণ্ঠা রহিয়া গেল—বুঝি বা তিনি কি অঘটন ঘটান, কোন্ মন্ত্রবলে আবার বিপ্লববাদের নব অধ্যায় সুরু করেন! কাজেই তাঁহার আশ্রমের চারিদিকে দিবারাত্র পুলিশের গুপ্তচরদিগের সজাগ দৃষ্টি রহিল—কখন তিনি কি করিয়া বসেন, যেন তিনি লেনিন বা ডি-ভ্যালেরার মত আচম্বিতে কি একটা রাজনীতিক কাণ্ডকারখানা করিবেন! অন্তর্জগতে, মানব হৃদয়কন্দরে তিনি কিসের বিপ্লব সাধন-ব্রতে ব্রতী তাহার হদিস গুপ্তচরেরা পাইবে কি করিয়া? গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষান্ত হইল না, প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল যে তিনি রাজনীতিক কারণেই ফরাসীরাজ্য পণ্ডিচারীতে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি বাংলা ত্যাগ করিবার পরই ইংরাজী "কর্ম্মযোগিন্"-এ লিখিত এক

প্রবন্ধের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু হইল; তাঁহার অবর্ত্তমানে মুদ্রাকর মনমোহন ঘোষ ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিন্তু আইন-অনুযায়ী বিচারে হাইকোর্ট রায় দিলেন যে প্রবন্ধটী রাজদ্রোহমূলক নহে। মুদ্রাকর মুক্তিলাভ করিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ "মাদ্রাজ মেল" কাগজে এক পত্রে প্রমাণ করিলেন যে, তিনি বাংলায় থাকিতে গবর্ণমেণ্টের এরূপ মামলা করিবার মতলব ছিল না, তিনি পণ্ডিচারী চলিয়া আসিলেন বলিয়াই এই বিচার প্রহসন হইল!

পণ্ডিচারীতে প্রথম অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে অনেক দিন আর্থিক অভাবের মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে, কিন্তু এই কষ্টসাধ্য জীবন তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করেন নাই, অবস্থা বিপর্য্যয়ে এইরূপ ঘটিয়াছিল। তিনি বহির্জীবনে অহৈতুক কৃচ্ছ্রসাধনে কোন দিনই বিশেষ জোর দেন নাই, তবে ঘটনাচক্রে যে অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহাতেও ক্ষণিকের তরে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। নতুবা কারাজীবনের অসীম ক্লেশেও শান্ত হৃদয়ে ছিলেন কি করিয়া? একদিকে যেমন যোগীদের ন্যায় তিনি শীতোষ্ণাদি প্রাকৃতিক বৈষম্যের উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন, অপরদিকে তিনি জীবনের সকল স্তরে, এমন কি দেহেও, সৌন্দর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশে বিমুখ ছিলেন না। সত্যং শিবং সুন্দরমের উপলব্ধি জীবনের সকল স্তরে না হইলে জীবনের ছন্দোময় বিকাশ হইবে কি করিয়া?

অচিরে পণ্ডিচারীতে বাহিরের দৈন্য দূর হইয়া শ্রী ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আশ্রমের অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর হইল—অবশ্য তখনও আশ্রম রীতিমত ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। বোধ হয় প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম গড়িবার উদ্দেশ্য ছিল না—ভাগবত প্রেরণায়ই আশ্রম

গড়িয়া উঠিতে লাগিল। আপনা হইতে অনেক লোক আশ্রমে আশ্রয় লইতে লাগিলেন। (শ্রীঅরবিন্দ কখনও কাহাকেও আহ্বান করেন নাই, প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় গিয়াছেন)। তখনও শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সঙ্গীদের অন্তরঙ্গ সখা, শিক্ষক ও গুরু ছিলেন, সকলের সহিত মেলামেশা করিযা তাঁহাদের জীবন মধুময় করিতেন। আর তাঁহাদের জ্ঞানসাধনায় সহায়তা করিতেন। বাহির হইতে পূর্ব্বসঙ্গীরা মাঝে মাঝে পণ্ডিচারী যাতায়াত করিতেন এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণা লাভ করিয়া তৃপ্ত হইতেন।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ সাধারণের মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলিযা দিলেন। "আর্য্য" প্রকাশিত হইল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট—শ্রীঅরবিন্দের ৪২তম জন্মদিনে। জগতের তখন এক সন্ধিক্ষণ। ইউরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতে কুরুক্ষেত্রের প্রারম্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম সখা অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিবার উপলক্ষে মানবজাতির জন্য অপূর্ব্ব জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, যাহা সহস্রাধিক বৎসর ভারতের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তেমনি শ্রীঅরবিন্দ জগতের মহাকুরুক্ষেত্রের প্রারম্ভে মানবজাতির ভাবী বিবর্ত্তন সম্বন্ধে অব্যর্থ ইঙ্গিত করিলেন। তিনি অকুণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, মানবজাতিকে হয় দিব্যজীবনের আদর্শ গ্রহণ কবিতে হইবে, নতুবা তাহাব পাশবিকতায় পুনরাবর্ত্তন অনিবার্য্য। তিনি দুই চারি কথায় একটা বিশেষ বাণী দিলেন না, আধুনিক মানবমনের উপযোগী ভাষায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া, ধর্ম্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি করিলেন এবং মানব-ইতিহাসের ধারা আলোচনা করিয়া দিব্য আদর্শের ভিত্তি স্থাপনা করিলেন। কি বিচিত্র সে প্রবন্ধগুলি! শুধু

বিপুল জ্ঞান নহে, গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক—মানব মনের, মানব জীবনের, মানবসমাজের, মানবজাতির নিগূঢ় বিশ্লেষণ। সাধারণ লোক এই লেখাগুলির উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু একদিন দেশবিদেশে যে ইহা পরম সমাদর লাভ করিবে, সকল দেশের সুধীবৃন্দ আকুল আগ্রহে ইহা পাঠ করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীঅরবিন্দ প্রচার বিষয়ে একেবারে উদাসীন বলিয়া এই লেখাগুলির মধ্যে শুধু গীতা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ণ সাত বৎসর ধরিয়া মাসের পর মাস শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্য" লিখিয়াছেন; বলিতে গেলে একাই ইহার পাতাগুলি পূর্ণ করিয়াছেন। আর কত বিষয়েই না কত প্রবন্ধ!—বেদ-রহস্য, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিব্য-জীবনের আদর্শ; যোগ-সমন্বয়ের প্রণালী, ভারত-সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহামিলনের আদর্শ, মানব সমাজের বিবর্ত্তনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ—ইহা ছাড়া সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে কত হৃদয়গ্রাহী আলোচনা। "আর্য্য" শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মহাগ্রন্থ নহে, যোগ-জীবনের রহস্য-জ্ঞাপক নহে, ধর্ম্মালোচনা নহে—ইহা মানব-ইতিহাস অনুধাবন করিবার পরম সহায়। সাধারণ রাজনীতিক আলোচনা "আর্য্যে" স্থান পায় নাই, কিন্তু তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার যে অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ আছে তাহার তুলনা নাই। প্রায় বিশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বের সেই ইঙ্গিতগুলি আজকালকার বাস্তব ঘটনা।

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারী গমনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীমা মীরা ও মঁসিয়ে পল্ রিসারের পণ্ডিচারীতে আগমন। ইহারা আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য পৃথিবীর নানাদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন,

সেই উপলক্ষে পণ্ডিচারী আসিয়া শ্রীঅরবিন্দকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। পল্ রিসার নিজে পণ্ডিত; শ্রীঅরবিন্দের উপর তাঁহার কি গভীর শ্রদ্ধা তাহার পরিচয় পাওয়া যায় দিলীপকুমারের লেখায়। ফ্রান্সের সহর নীসে দিলীপকুমারের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বর্ত্তমান যুগের মহামানব বলিয়াছিলেন। (ঐ আলাপকাহিনীটি ১৩৩৬ সালের "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল।)

শ্রীমা মীরার কথা বাহিরের অল্পলোকেই জানেন। তাঁহার ভাগবত-উপলব্ধির জন্য কি ব্যাকুলতা তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ফরাসী ভাষায় লিখিত তাঁহার প্রার্থনাস্তবকে। এইগুলি তিনি ইউরোপে থাকিবার সময়ে লিখিয়াছিলেন; দিলীপকুমার ইহার অনেকগুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন এবং বাংলায়ও কাব্যসুষমা বিতরণ করিয়াছেন; "অনামী"তে সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমার সাধনা কি গভীর ও বিচিত্র তাহার পরিচয় তিনিই দিতে পারেন, তবে বাল্যকাল হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্য ও মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাই যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি কোনদিন তিলমাত্র আত্মপ্রচার করেন নাই, সাধারণ লোকের সহিত মিশেন নাই, কাজেই বাহিরের লোক তাঁহাকে জানিবে কি করিয়া? তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক লেখাগুলির কথা শুধু আশ্রমবাসীরাই জানেন। শ্রীমা ফরাসীদুহিতা হইলেও কি সুন্দর ইংরাজী লিখেন তাহার পরিচয়ও বাহিরের লোক পান নাই। এমন কি "আর্য্যে" কোন্ লেখাগুলি তাঁহার তাহাও জানিবার উপায় নাই—তিনি এমনই আত্মগোপন করিয়াছেন!

শ্রীমা ও পল্ রিসার পণ্ডিচারী আসার পর "আর্য্য" সম্পাদনে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। "আর্য্য"র প্রথম কয়েক সংখ্যায় প্রচ্ছদপটে লেখা থাকিত: Editors—Aurobindo Ghose—Paul & Mira Richard। যুদ্ধের হিড়িকে শীঘ্রই তাঁহাদের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল এবং বাধ্যতামূলক নিয়মানুসারে পল্ রিসার সৈন্যদলে যোগদান করিলেন। উঁহারা পণ্ডিচারী থাকিতে "আর্য্য"র একটী ফরাসী সংস্করণ বাহির হইত, উঁহারা চলিয়া যাইবার পর তাহা বন্ধ হইল। "আর্য্য"র সমস্ত ভার একা শ্রীঅরবিন্দের উপর পড়িল।

যুদ্ধ অবসানের দুই বৎসর পরে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, তাঁহারা আবার পণ্ডিচারীতে আসিলেন এবং তখন হইতে শ্রীমা আশ্রমে রহিলেন। পল্ রিসারও কিছুদিন ছিলেন, পরে তিনি এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তিনি প্রাচ্যের সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরাজীতে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং এককালে এদেশে সেগুলি সমাদৃত হইয়াছিল।

শ্রীমার আগমনের পর হইতেই ধীরে ধীরে আশ্রম গড়িয়া উঠিতে লাগিল। দেশ দেশান্তর হইতে সাধক সাধিকাগণ আসিতে লাগিলেন। অতগুলি সাধনার্থীর ভরণপোষণের ব্যাপার ও দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ সহজ ব্যাপার নহে। একা শ্রীমা সমস্ত পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। শুধু বহির্জীবন নয়, সাধকদিগের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ ও সাধনার সহায়তায় শ্রীমা ব্রতী হইলেন। শ্রীঅরবিন্দের গভীরতর সাধনার জন্য আশ্রমের বহির্জীবনের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিল না—বৎসরের মধ্যে মাত্র তিনদিন তাঁহার দর্শন লাভ হইয়া থাকে। সকলের জীবন শ্রীমার স্নেহযত্নে পুষ্ট হইল।

আশ্রমের প্রসার ও পরিচালনার জন্য কি বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা সহজেই বুঝা যায়, অথচ শ্রীঅরবিন্দ বা আশ্রমের অপর কেহ কোনদিন কাহারও নিকট অর্থসাহায্য চাহেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় আশ্রম গড়িয়া উঠিবার সহিত অযাচিত ভাবে অর্থ আসিতে লাগিল। যেখানে এককালে ছিল দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা সেখানে আসিল সচ্ছলতা। কেহ কেহ আশ্রমে আসিলেন স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, অনেকে আসিলেন নিঃস্ব অবস্থায়। কিন্তু ভাগবত সাধনায় ধনবৈষম্যের স্থান নাই—বহির্জীবনে অর্থের যতটুকু প্রয়োজন নিরপেক্ষভাবে তাহা সাধিত হয়। যেখানে ভাগবত কার্য্য সুরু হইয়াছে, সেখানে যে এরূপ ভাবে ভাগবত শক্তির ঐশ্বর্য্য বিকশিত হইবে তাহাতে হয়ত বৈষয়িক লোক বিস্মিত হইতে পারে, কিন্তু ভাগবত মহিমার মর্ম্ম যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা রহস্য উত্তমরূপে বুঝিবেন।

দশম অধ্যায়

ভাগবত জীবনের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম সম্বন্ধে ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীতে লিখিত একখানি পুস্তিকা আছে। তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা কি সে সম্বন্ধে লেখা আছে :

"শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা প্রাচীন ঋষিদের এই শিক্ষা হইতে আরম্ভ যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাতদৃষ্ট রূপের অন্তরালে আছে একটি সত্য বস্তু—এক সত্তা ও এক চেতনা, সকল জিনিষের অদ্বিতীয় ও শাশ্বত আত্মা। সকল সত্তা সেই অদ্বিতীয় আত্মা বা স্বরূপের মধ্যে একীভূত—কিন্তু মনে, প্রাণে, দেহে তাহারা পৃথগ্‌ভূত, চেতনার এক বিচ্ছিন্নতার জন্য, তাহাদের সত্যস্বরূপ ও বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞানতার জন্য। আন্তঃকরণিক এক সাধনাদ্বারা এই ভেদাত্মক চেতনার আবরণটী দূর করা যায় ; সত্যকার স্বরূপকে, আমাদের ও সকলের ভিতরে রহিয়াছেন যে ভগবান তাঁহার সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়া যায়।"

কথাটা হয়ত অনেকের কাণে নূতন শুনাইবে না, কারণ আমরা অনেকেই সেই প্রাচীন উক্তির সহিত পরিচিত : 'সমস্তই ব্রহ্ম', 'এক তিনি বহুধা বিভক্ত হইয়াছেন।' কিন্তু উক্তি শুনা বা মনে ধারণা করা এক জিনিষ, আর তাহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা আর এক জিনিষ। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে, 'সমস্তই ব্রহ্ম', তাহা হইলে তাঁহার কল্পনাচক্ষে পরিচিত বিশ্বের রূপ ফুটিয়া

উঠিবে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে আমরা বিশ্বের কতটুকু জানি? এমন কি বহুদর্শী, বহুঅভিজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বের কতটুকু সন্ধান রাখেন? জ্ঞান-সমুদ্রের এই অপরিমেয়তা বুঝিয়াই নিউটনের ন্যায় বৈজ্ঞানিক বলিযাছিলেন, 'আমি সমুদ্রবেলায় উপলখণ্ড আহরণ করিতেছি মাত্র।' আশ্চর্য্যের বিষয়, আধুনিক জড়বাদের গুরু ডারউইনের পর্য্যন্ত অবশেষে এই উপলব্ধি হইযাছিল যে, শুধু জীবজন্তু, উদ্ভিদাদি ও তাহাদেব কঙ্কালের তথ্য ঘাটাঘাঁটি করিয়া তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দয্য উপভোগ করিবার প্রেরণা হারাইয়াছেন।

বাস্তবিক সাধারণ মানুষ, এমন কি অধিকাংশ বুদ্ধিজীবির অবস্থা অনেকটা কূপমণ্ডুকের ন্যায়। আমাদেব স্ব স্ব মনের কূপের উপর যতটুকু আকাশ তাহারই পরিচয় আমরা রাখি; বৃহদাকাশের খবব আমরা কতটুকু জানি? আমাদের মধ্যে যাঁহারা দার্শনিক তাঁহারা চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে একটা ধাবণা করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত আমাদের একটা যুক্তিযুক্ত ধারণা দিতে পাবেন, কিন্তু সত্যোপলব্ধি ত শুধু ধারণায় হয় না। পর্ব্বত না দেখিয়া, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাঠ করিয়া যেমন তাহার বিষয়ে সত্য জ্ঞান জন্মে না, তেমনি বিশ্বের অন্তরাত্মার নিবিড় পরিচয় না পাইলে আমরা কিছুতেই বিশ্বরহস্য উপলব্ধি করিতে পারি না—বড় জোর pantheist বা ব্যাপকভাবী দার্শনিকের মত একটা ধারণা করিতে পারি মাত্র।

বিশ্ব সম্বন্ধে এই অস্পষ্ট ধারণার জন্য আমাদের মনে হয়ত প্রায়ই এই প্রশ্ন জাগে—এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? এ সকল আসিল কোথা হইতে? তুমি কে, কোথা হইতে আসিলে—কস্তং কুতোঽয়াতঃ? আমরা অনেকেই বলি ভগবান বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে

বিজড়িত রহিয়াছেন, সমস্তই তাঁহারই বিকাশ—যেমন মাকড়সা নিজের দেহনিঃসৃত রস হইতে জাল বুনে, তেমনি ভগবান সৃষ্টি-জাল বুনিয়াছেন। আবার আমরা কেহ কেহ বলি, তিনি সৃষ্টি কার্য্য শেষ করিয়া (ছয় দিনে হউক, ছয় বৎসরে হউক বা যে কোন সংখ্যক দিনে বা বৎসরে হউক), অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন, এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এতাবৎকাল সৃষ্ট জীবগণ, বিশেষতঃ মানুষ, অন্ধভাবে জীবন-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা দেখিয়া মজা উপভোগ করিতেছেন—যেমন আমরা হাস্যরসাত্মক নাটক উপভোগ করি। আবার কেহ কেহ বলেন তিনি মঙ্গলময়, তিনিই আমাদের মাতা, পিতা, ইত্যাদি, তিনি সকলই মঙ্গলের জন্য করিতেছেন। এই প্রকারে মানুস ভগবান সম্বন্ধে কতরূপ ধারণা করিয়াছে, তাঁহার সহিত কতরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, কতভাবে তাঁহাকে পূজা করিয়াছে। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে নিরাকার, 'অবাঙ্‌মনসো-গোচরম্' ধারণা করিয়া বলিয়াছে যে, তিনি প্রাকৃতিক জগতের, মানুষের হাসিকান্না, ভোগ দুঃখের জগতের বাহিরে—মানুষ কোন এক গূঢ় উপায়ে তাঁহার পরিচয় পাইতে পারে।

এ সম্বন্ধে বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ "Who ?"—"কে ?" নামে একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা "কর্ম্মযোগিন্"-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রশ্নটী তিনি অনুপমভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন :

"এ সব লীলা তাঁহার, আড়াল ছায়া—
তাও সে তাঁহারি ;
শুধু কোথায় বা তাঁর ধাম ? কী নামে
জান্‌বে তাঁর নর ?

তিনি স্বয়ম্ভূ—না বিষ্ণু? তিনি
পুরুষ—বা নারী?
তিনি দেহী—না বিদেহী? যুগ্ম—
কিম্বা একেশ্বর?

এই চিরন্তন প্রশ্নগুলির উত্তরও শ্রীঅরবিন্দ কবিতায় দিয়াছেন: "সকল মাধুরী —তাঁর আনন্দেরি স্মিত সম্ভাষণ"; "ধরার চরম কল্পলোকের তরে ঘোষেণ তিনি রণ"; "নাহি সৌরজগৎ মাঝে মিলে অন্ত আদি তাঁর"; "ছিল অমা যেদিন অন্ধ—অতল গহ্বরে অমার, আসীন ছিলেন তিনি তাহার মাঝে একক মহাকায়"; আবার, "তিনি প্রভু মোদের অসীম চিরপ্রেমিক সুমহান"; কিন্তু—

"প্রাণের এতই কাছে,—শুধু মোদের
নেই সে দিঠি হায়!
মোদের মস্ত গরব—আড়ম্বরে
মুগ্ধ দু নয়ান
বাঁধি চিন্তা সসীম দিয়ে মোরা
মুক্ত আপনায়।"

চিন্তা দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা আমরা ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্ব বুঝিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হয় হৃদয়ে। হৃদয়েই তাহাকে আমরা চিরপ্রেমিক বলিয়া বুঝিতে পারি, অথচ শুধু হৃদয়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে আমরা বৈষ্ণবসুলভ প্রেমমাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারিব, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু না মেলিলে তাঁহার বিশ্বরহস্য বুঝিব কি করিয়া, বিশ্বলীলায় যোগ দিব কি করিয়া? আবার আমরা ব্যক্তিগত ভাবে

* দিলীপ কুমারের কাব্যানুবাদ—"অনামী" (৪৯—৫২)

হয়ত তাঁহার প্রেমে বিভোর রহিলাম, হয়ত জ্ঞানে তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব উপলব্ধি করিলাম, কিন্তু পূর্ণভাবে তাঁহার সহিত যুক্ত না হইলে, কিরূপে অকপট হৃদয়ে, স্বচ্ছন্দ মনে সৃষ্টিলীলায় তাঁহার সাথী হইব? আর কি বিচিত্র সৃষ্টিই না তাঁহার! কি ভীষণ মধুরের সমাবেশ! তাঁহার রহস্য কি দুর্জ্ঞেয়! যিনি সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্, পরম মঙ্গলময়, তিনি কি করিয়া অমঙ্গলের মধ্যে বিকাশ পাইলেন? যিনি আনন্দময়, তিনি সৃষ্টিতে কেন দুঃখকে বরণ করিলেন? যিনি পরম চেতনা, তিনি কেন এবং কি করিয়া অচেতনের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন? ইহা কি মায়াবীর মায়া? মায়াবী কেন মায়া সৃষ্টি করিয়া নিজের সৃষ্ট জীবকে বিড়ম্বিত করিবেন? তাহাতে তাঁহার কি লাভ? অবশ্য যোগিগণ এমন চেতনা উপলব্ধি করিতে পারেন যাহাতে দুঃখও তাঁহাদের নিকট আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়—যেমন জেলের ভিতরে লাল পিঁপড়ার কামড়ে শ্রীঅরবিন্দ যন্ত্রণা বোধ না করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোকের ত ঐরূপ উপলব্ধি হয় না।

জগতে এই দুরপনেয় দুঃখকষ্ট, ভেদদ্বন্দ্ব দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ বৈদান্তিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন 'ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা'। বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়াছিলেন 'তন্‌হা' (তৃষ্ণা) নিবারণ করিতে— আদর্শ দিয়াছিলেন নির্ব্বাণের। সত্য, এই উপায়ে ব্যক্তিগত সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে—কিন্তু বিরাট জগতের সমস্যা? আমার সমস্যার না হয় সমাধান হইল, আমি তুরীয় সমাধিতে মগ্ন হইলাম, আমি জগতকে মিথ্যা জ্ঞান করিলাম, মায়ার বাঁধন কাটিলাম, নির্লিপ্ত হইলাম—আমার পরিত্রাণ হইল, আমি মুক্তি পাইলাম; কিন্তু জগৎ ত সেই হাসিকান্না, দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্য দিয়া চলিল।

ইহা সম্ভবপর নহে যে কোটি কোটি লোক এই ভাবে ভবসাগর পার হইবে!

আর সত্যই ভগবান সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, প্রভু, বিভু, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী—কিন্তু সত্য ভগবান কেন অহৈতুক মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিলেন? ইহার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? আধুনিক মানুষ এই হেঁয়ালীতে বিভ্রান্ত হইয়া ধরিয়া লইয়াছে যে, এই সকল তথ্য লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ কি? জগৎটা যেমন দেখিতেছ তেমনি উপভোগ কর—উপভোগের জন্য তাহাকে যতটুকু বুঝিবার দরকার ততটুকু বুঝিবার চেষ্টা কর। কেহ কেহ ধারণা করিলেন জগৎ যন্ত্রবৎ, কোন অজ্ঞেয় কারণে, অজ্ঞেয়ভাবে ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। অন্ধপ্রকৃতিই ইহার নিয়ন্তা। জড়ই মূল সত্তা—চেতনা জড়েরই অভিব্যক্তি। কেহ কেহ বলিলেন, ভগবান হয়ত আছেন, হয়ত নাই; কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, প্রয়োজনই বা কি!—জীবনই আমাদের পরিচালিত করিবে।

জীবনের নিদর্শন কি?—আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম। বলং বলং বাহুবলম্। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। নিম্নস্তরের জীবগণ যেমন হানাহানি করিয়া জীবনের পরিচয় দেয়, মানুষকেও তেমনি সংগ্রাম করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু এই চিরন্তন সংঘর্ষের ফল?—শ্রীঅরবিন্দ বেদের ভাষায় বলিয়াছেন, "the eater eating being eaten"—খাদক খাদ্যে পরিণত হইতেছে। সংগ্রাম সংঘর্ষই কি মানব ধর্ম্ম? মানুষের মধ্যে কি প্রেম, করুণা প্রভৃতি কোমল বৃত্তি নাই? অবশ্য আদিম মানুষ সংঘর্ষেই জীবন কাটাইত। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত সংঘর্ষ, সবলের দুর্ব্বলকে নিধন; তাহার পর গোষ্ঠি ও সমাজগত সংঘর্ষ; এখন তাহার পরিণতি হইয়াছে

জাতিগত সংঘর্ষে। কিন্তু সংঘর্ষের ব্যাপকতার সহিত মানব প্রেমের উদ্ভব হইতেছে ইহাও সুস্পষ্ট। এমন কি, অপর জাতির সহিত সংঘর্ষ করিতে হইলে নিজ জাতিকে প্রেমের ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে শুধু দ্বন্দ্ব নয়, প্রেমের মধ্য দিয়াও এতকাল মানুষ, তাহার সমাজ, জাতি, দেশ, সাম্রাজ্য ও ধর্ম্ম এসবের উত্থানপতন হইয়াছে।

প্রেমের উপলব্ধি করাই কি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ নহে? মানব-ইতিহাসে আমরা দেখি যে দারুণ সংঘর্ষ ও বিপ্লবের মধ্যেও এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হইয়াছে যাঁহারা প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছেন, প্রেমের জীবন যাপন করিয়াছেন;—মানুষের নিছক জীবধর্ম্মের জীবনের উপর যে আনন্দময় জীবন আছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন, প্রেমের আদর্শ স্থাপন কবিয়া মানুষকে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছেন—এমন কি মানুষের আদিম হিংস্র অজ্ঞানতায় আদর্শের জন্য আত্মাহুতি দিয়াছেন। তাঁহারাই যুগে যুগে মানুষকে ঐক্যের পথ দেখাইয়াছেন—মানুষের এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের পূর্ণোপলব্ধির সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে (বিশেষ করিয়া ভারতের বুদ্ধ) পূর্ণ অহিংসার আদর্শ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রেরণায় বহু জাতিকে জাগাইয়াছেন। সুতরাং দেখা গেল যে নিম্ন জীবজগতের ধর্ম্ম পূরাপূরিভাবে মানব ধর্ম্ম নহে—মানুষ একেবারে জীবজগতের নিয়মাধীন—'যন্ত্রারূঢ়াণিবৎ মায়য়া' নহে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে জীবজগতে কি ব্রহ্ম নাই? জড়জগৎ কি ব্রহ্মের বিকাশ ক্ষেত্র নহে? নিম্ন প্রকৃতি কি ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত নহে? কোন কোন প্রাচীন ধর্ম্মধ্বজী, নীতিবিৎ এসম্বন্ধে বেপরোয়া

ছিলেন ; তাঁহারা নিম্নজীবের দূরের কথা, নারীর আত্মা আছে ইহা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু আধুনিক মানুষ এইরূপ 'সাফ জবাবে' তুষ্ট নহে। ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ফল। বিজ্ঞান কোন মনগড়া, ছেঁদো কথায় তৃপ্ত নহে। সে জিনিষকে বুদ্ধির কষ্টি-পাথরে যাচাই না করিয়া, পূরাপূরিভাবে পরখ না করিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না। তাই বিজ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা জড়জগৎ ও জীবজগতের গভীর স্তর পর্য্যন্ত বুদ্ধির আলোকপাত করিয়াছে, আমাদের চক্ষের সাম্‌নে অণুপরমাণুর পর্য্যন্ত রহস্য বিকাশ করিতেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা হইতেছে ইন্দ্রিয়-জীবী বুদ্ধি। দৃশ্যজগৎ ছাড়া সে কিছুই আমল দিতে চাহে না ; মাত্র ইদানীং সে চেতনা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়াছে। বিজ্ঞান দৃশ্যজগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছে, কিন্তু ইহারা 'কি ও কেন' এ সম্বন্ধে কোন খোঁজ করিতে চায় নাই। ব্যবহারিক জগতে হয়ত এ প্রশ্নের কোন মূল্য নাই, কিন্তু জ্ঞানজগতে যে আছে তাহার প্রমাণ এই যে, বিজ্ঞানেরই অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র শুধু ব্যবহারিক জগৎ নহে। তবু শুধু বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞান জড়জগতের গভীর খাতে নামিয়া তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হারাইয়াছে। জড়ের বিশ্লেষণ করিতে করিতে বিজ্ঞান এমন অবস্থায় আসিয়াছে, যেখানে 'ততঃ কিম্?'—এই প্রশ্নের আর যুক্তিযুক্ত উত্তর পাওয়া যায় না—অবস্থাটা, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, যেন 'জড়ের মায়া', 'অঘটনঘটনপটীয়সীর লীলা'!

এই অবস্থায়, বিশেষতঃ বাস্তব জগতের যখন এত উন্নতি হইয়াছে, এত ভোগসুখের উপায় হইয়াছে, তখন সাধারণ

মানুষের মনে হইতে পারে অত তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ কি, সৃষ্টির ব্যবহারিক স্তর (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় utilisable crust) লইয়া থাকিলেই হইল! খাও দাও, স্ফূর্তি কর, সমাজের নূতন রূপ দিতে চেষ্টা কর, দেশসেবা কর, জনসেবা কর, নয়া সাম্রাজ্য গঠনেব চেষ্টা কর কিংবা সাম্রাজ্য ধ্বংস করিযা এক মহাজাতি সৃষ্টির চেষ্টা কর, বিশ্বপ্রেমে মানবহৃদয়কে সরস কর—যদি কিছুতেই কিছু না হয আব একবার বিজ্ঞানের চরম বিকাশ দেখাইয়া মহামারণ যজ্ঞ কর! ইহাই হইল বর্ত্তমান জগতের অবস্থা। কিন্তু মানব-হৃদয়ের অবস্থা কি? মানসিক গ্লানির অন্ত নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই, চিরস্থায়ীভাবে আরাম উপভোগ করিব তাহার উপায় দেখা যাইতেছে না, সর্ব্বদাই শঙ্কা হারাই, হারাই! ও-দিকে বুদ্ধি-বিকাশের, যুক্তিতর্কের যুগেও হিংসাদ্বেষের হলাহলে জগৎ ছাইয়া গিয়াছে। যুক্তি মানুষকে সর্ব্বনাশা বুদ্ধি হইতে বক্ষা করিতে পারিতেছে না। মহাপ্রলয়ের আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু!—'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ',—কোনরূপে যদি সৃষ্টি ও সভ্যতা রক্ষা করা যায়!

কোথায় সেই বিজ্ঞানের আশা-মরীচিকা—ধরায় স্বর্গ নামিয়া আসিবে, বিজ্ঞান-প্রসূত সভ্যতা ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিবে, ব্যাধি-জরা-মুক্ত হইয়া মানুষ বিজ্ঞানালোকে জীবন কাটাইবে, বিজ্ঞানোচিতভাবে শিক্ষিত হইয়া বৈজ্ঞানিক 'রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্' ভোগ করিবে—ভগবানের প্রয়োজন হইবে না, সম্পূর্ণ কুসংস্কার মুক্ত হইয়া মানুষ বিজ্ঞানকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া মুক্ত, জ্ঞানী-জীবন যাপন করিবে! ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি ছেঁদো কথার ধার বিজ্ঞান ধারে না, বিজ্ঞানই ছাঁচে ফেলিয়া ব্যক্তি গঠন করিবে!

অবশ্য তাহা বিজ্ঞানময় পুরুষ নহে—খানিকটা মানুষী মানুষ, খানিকটা যান্ত্রিক মানুষ।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে মানবজাতি গঠিত হইবে তাহার আশা বর্ত্তমান অবস্থায় সুদূরপরাহত বলিলেই হয়। তাহার কারণ মানুষের মানুষী বুদ্ধি। বিজ্ঞানালোক প্রাপ্ত মানুষের মধ্যেও সেই সনাতন আদিম প্রবৃত্তিগুলি জাগ্রত হইয়া,—অধুনা ব্যাপক ভাবে জাগ্রত হইয়া,—মানুষের সৃষ্টিকে যেন মহাপ্রলয়ের দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যে আধুনিক মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিত, সেই মানুষ আজ যেন নৃশংসতায় বর্ব্বর যুগের মানুষকে হারাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। পরন্তু বিজ্ঞানের সহায়তায় বর্ব্বরতা হইয়া উঠিয়াছে ব্যাপক, যান্ত্রিক ও ভয়াবহ। ন্যায়ধর্ম্ম, আইন-শৃঙ্খলা প্রভৃতি সভ্যযুগের রীতিনীতি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

ইহাই হইল মানবজাতির ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ক্ষণ! এইরূপ এক অবস্থায়—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইয়ুরোপে মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে—শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও তাহার মীমাংসা সুরু করিয়াছিলেন; মানবজাতিকে অভ্রান্ত ইঙ্গিত দিয়াছিলেন দিব্যজীবনের—হয় মানুষকে এই জীবনের সন্ধান করিতে হইবে, নতুবা মানুষের এ পর্য্যন্ত যে বিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাই চরম এবং তাহার পরে হয়ত মহানির্ব্বাণ! কিন্তু মানুষ যদি সৃষ্টির চরম প্রেরণা অনুসারে চলিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে দিব্যজীবন লাভ করিতেই হইবে।

এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সৃষ্টির বিবর্ত্তন নিরূপণ করিয়াছেন এবং তাহার গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাই আমরা দেখি যে, "Life Divine" বা দিব্য-

জীবন শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে তিনি 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'—ব্রহ্ম কি? —সেই সনাতন প্রশ্ন হইতে স্থরু করেন নাই; স্থরু করিয়াছেন দৃশ্যমান জগৎ কি তাহা হইতে—বৈজ্ঞানিকের মতন প্রশ্ন করিয়াছেন জড় প্রকৃতি কি, বিকশিত করিয়াছেন তাহার পিছনের রহস্য, প্রকট করিয়াছেন জড়ের মৌন চেতনা। শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলাতে ছিলেন তখন দারুণ জড়বাদের যুগ, কাজেই জড়বাদের সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় হইয়াছিল—এবং ইহার ফলেই উত্তরকালে তিনি ব্রহ্মবাদের সহিত জড়বাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, যাহা পূর্ব্বে কেহই এভাবে চেষ্টা করেন নাই।

পণ্ডিচারী আসিবার পূর্ব্বেই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল। তিনি "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্মে" যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝা যায় যে, অধ্যাত্মজ্ঞান তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল। উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি ইংরাজী ও বাংলায় যে হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা সেই জ্ঞানের পরিচায়ক। জেলে থাকিতে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা ব্রহ্মোপলব্ধি। কিন্তু এই উপলব্ধিতে তিনি তৃপ্ত রহিলেন না, এই উপলব্ধি হইল মানবের দিব্যরূপান্তরের সাধনার, পূর্ণযোগের ভিত্তি। তিনি পরম জ্ঞান, পরম প্রেম, পরম শান্তির আধারের পূর্ণ সত্তাকে মানব-আধারে বিকাশ করিবার ব্রতে ব্রতী হইলেন এবং তাঁহার সংকল্প হইল দিব্যের তুরীয় আলোকে মানবজীবনকে আলোকিত করিয়া দিব্যশক্তির সহায়তায় তাহার রূপান্তর করা। মানব যুগে যুগে যে মহান্ স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহা জীবন-সত্যে পরিণত করা হইল তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহাই তাঁহার পণ্ডিচারীর নিভৃত সাধনার রহস্য।

একাদশ অধ্যায়

সৃষ্টিক্রম রহস্য

জন্মিয়াই আমাদের প্রথম পরিচয় হয় পৃথিবীর সহিত। জড়ই আমাদের প্রথম অবলম্বন। জড়ের ভিত্তির উপরই আমাদের জীবন বিকশিত হইতে থাকে। জড়দেহের সেবাই আমাদের প্রথম কার্য্য। জড়ের আধারে যে প্রাণশক্তি আছে তাহাই আমাদের জীবনকে পরিচালিত করে, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা প্রথমে থাকি অনবহিত, তাহার স্বরূপ কি তাহা আমরা জানি না। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের মনঃশক্তির বিকাশ হয়, কিন্তু মন কিরূপে কার্য্য করে সে বিষয়েও আমাদের অনেকদিন হুঁস হয় না; বুদ্ধির বিকাশের সহিত আমাদের মনের ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য পড়ে।

সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা জড়, প্রাণ ও মনের লীলা বৈচিত্র্য বুঝিতে পারি। পৃথিবীই জড়সৃষ্টির প্রতীক। পৃথিবীর বৈচিত্র্যই জড়শক্তির লীলা। কিন্তু এই লীলার আরও বৈচিত্র্য ঘটিল প্রাণ শক্তির বিকাশে। জড় পৃথিবীতে বিকাশ পাইল উদ্ভিদাদি প্রাণধর্ম্মী জড়ের বিভিন্নরূপ; তাহার পরে উদ্ভূত হইল জড়-দেহধারী পূর্ণ প্রাণধর্ম্মী প্রাণিগণ। কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর নিছক জড়ত্ব ছিল এবং কত যুগে প্রাণ বিকশিত হইয়াছে কে তাহা নির্ণয় করিবে? প্রাণশক্তির বিকাশেই পৃথিবীর মোহনরূপ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সৃষ্টির স্তরে স্তরে বিকশিত হইল কত বৈচিত্র্য, কত না

সুষমা—যাহা মানুষের নয়নকে মুগ্ধ করে, হৃদয়কে পূর্ণ করে। পৃথিবীর দেহে কতই না রহস্য—আরও কত গভীর রহস্য নভে, যেখানে পৃথিবীর গোষ্ঠিভুক্ত গ্রহাদি বিচরণ করিতেছে। আমরা যাহাকে জড় বলি তাহাও কত সুন্দর, কত মহিমামণ্ডিত তাহা কবির দৃষ্টিতে ধবা পড়িয়াছে, আর বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণে তাহার রহস্য কিছু কিছু জানা গিয়াছে।

কিন্তু আরও বিস্ময়কর কি নহে জড়ে প্রাণশক্তির লীলা? কি অদ্ভুত এই প্রাণশক্তি এবং কতই বিচিত্র ইহার অজস্র আধার—তাহাদের গঠন, রূপ, প্রকাশভঙ্গিমা, প্রকৃতি। এমিবা হইতে মানুষ পর্য্যন্ত কতপ্রকারের জীব ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে, সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত ছাইয়া আছে—কত কোটি বৎসর ধরিয়া তাহাদের বিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাদের কত সহস্র অবলুপ্ত হইয়াছে, এই অভিনব ইতিহাস আলোচনা করিলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

এই জড় ও প্রাণী রাজ্যের প্রতিটী স্তরের, অসংখ্য শ্রেণীর, তাহাদের অনন্ত বৈচিত্র্যের বিষয় গবেষণা করিয়া কত বৈজ্ঞানিক জীবন কাটাইয়াছেন! তাঁহারাই জড়জগৎ ও জীবজগতের রহস্যের সন্ধান দিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক পিপীলিকা ও কীটপতঙ্গের জীবন-বেদ যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়—এই একটী শ্রেণীর মধ্যে জীবনলীলার কি অভিনব বৈচিত্র্য, সৃষ্টিতে তাহাদের কত রকমের গতিভঙ্গী, এমন কি মানুষের জীবনযাত্রার সহিত, তাহার ভালমন্দের সহিত কি নিগূঢ় সম্বন্ধ। আবার ভূতত্ত্ব, সমুদ্রতত্ত্ব, নভস্তত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ কত গবেষণা করিয়াছেন। ইহার যে-কোন একটী বিষয় লইয়াই এক জীবন কাটান যায়।

প্রকৃতির এই লীলা জীবজগতে প্রথমে কাহার চেতনায় প্রকটিত হইল, কে ইহার রহস্য সন্ধান করিল, রস গ্রহণ করিল? সহজ উত্তর—মানুষের। মনোধর্ম্মবিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি বোধ হয় আপন সৃষ্টিতে আপনি বিভোর ছিলেন—মানুষের মনোমুকুরে নিজের সত্তা দেখিলেন। মানসিক চেতনা বিকাশের ফলেই প্রকৃতির স্বীয় সৃষ্টি উপভোগ করিবার ক্ষমতা জন্মিল। মন বিকাশের পূর্ব্বে প্রকৃতি ছিলেন যেন যন্ত্রবৎ—মানুষের মধ্যে হইলেন সজ্ঞান। এইজন্যই শ্রীঅরবিন্দ মানুষকে বলিয়াছেন "মনোময় পুরুষ"। পুরুষ শুধু সচেতন, সজ্ঞান নহে, কর্ত্তা, ভোক্তা, আবার দ্রষ্টাও। মনঃশক্তিরই জড়শক্তি ও প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হইল। মানুষ প্রকৃতিকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও উপভোগ করিবার ক্ষমতা পাইল। আত্মা যেন খানিকটা স্বাধিকার পাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং অহংরূপে সৃষ্টি উপভোগ ও বৈচিত্র্য ঘটাইবার শক্তি পাইল।

সৃষ্টির ক্রমবিকাশে আর একটী ব্যাপার প্রতীয়মান হয় যে, যে-ধর্ম্মের বিবর্ত্তন হইল, সে ধর্ম্ম নিম্নধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইলেও নিম্নধর্ম্মের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব জন্মিল। জড় হইতে প্রাণ বিকশিত হইল, কিন্তু প্রাণশক্তি খানিকটা কর্ত্তৃত্ব পাইল জড়শক্তির উপর—প্রাণশক্তিই জড়শক্তিকে লীলায়িত করিল। বিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধায়নের গতি অনুসারে ছন্দোবিকাশেরও তারতম্য দেখা যায়। যেমন নিম্নস্তরের পাণী অনেকটা জড়ধর্ম্মী। জড়েব যেখানে প্রাণে প্রথম বিকাশ, সেখানে উভয়ের ধর্ম্ম ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। প্রাণীজগতেও বিবর্ত্তনের তারতম্য অনুসারে শক্তির তারতম্য ঘটে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণী নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর উপর কর্ত্তৃত্ব করে—অনেকস্থলে তাহাদের ভক্ষক ভোজ্যের সম্বন্ধ। ইহাকেই ডারউইন জীবনসংগ্রাম

এবং সবলের জীবন যুদ্ধে টিকিয়া থাকা বলিয়াছেন। জড়জগৎ ও প্রাণজগৎ সংঘর্ষের ক্ষেত্র। জড়জগতে যে শক্তি অন্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রাণজগতে তাহা স্ফূর্ত্ত, কিন্তু অন্ধ আবেগ তখনও তাহার গতি নির্ণয় করে।

প্রাণশক্তির এই অন্ধ আবেগ আমরা মানবজীবনেও কম অনুভব করি না। আমরা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প, পর্ব্বতশিখর হইতে তুষার স্তূপের স্খলন, মহাসাগরে প্রলয় বাত্যা দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা কি কম বিস্ময়কর ব্যক্তি-বিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রাণশক্তির অন্ধ আবেগ? একটা তাইমুর লঙ্গ, একটা জঙ্গীস খাঁ, একটা নীরোর প্রলয় তাণ্ডব কি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ অপেক্ষা কম ভীষণ? আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত ভয়াবহ সন্দেহ নাই, কিন্তু রণক্ষেত্রের উন্মাদনা, হত্যাতাণ্ডব কি কম ভীষণ? বজ্র নির্ঘোষ চমকপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা কি কম চমকপ্রদ অসুরের অট্টহাস্য?

শুধু মানুষের জগতে কেন, মানুষের নিম্নস্তরে যে প্রাণীজগৎ সেখানেও প্রাণশক্তির লীলা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হই। মানুষ জড়শক্তির বৈচিত্র্য উপভোগ করিবার জন্য যেমন এভারেষ্ট-শীর্ষ পর্য্যন্ত ধাওয়া করে, সমুদ্রের অতলে, ডুব দেয়, তেমনি আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে অভিযান করে প্রাণীজগতে প্রাণশক্তির ভীষণ লীলামাধুর্য্য উপভোগ করিবার জন্য।

প্রাণীজগতে আর একটী জিনিষ আমাদের বিস্ময়োদ্রেক করে, তাহা হইতেছে মনঃশক্তির বিকাশ। মানুষ মনঃশক্তি বিশিষ্ট ও বুদ্ধিজীবি বলিয়া গর্ব্ব করে, কিন্তু পশুজগতে আমরা যে বুদ্ধির পরিচয় পাই তাহাও কি কম বিস্ময়কর? [illegible]ং কোন কোন স্থলে

ইন্দ্রিয়শক্তিতে পশু মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বহুকাল পূর্ব্বে "ধর্ম্মে" প্রাকাম্য-শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "স্থূল শরীরের ইন্দ্রিয় সকল, বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ মানুষ যতদিন স্থূল দেহের শক্তিদ্বারা আবদ্ধ থাকে, ততদিন বুদ্ধির বিকাশে সে পশুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, নচেৎ ইন্দ্রিয়ের প্রাখর্য্যে এবং মনের অভ্রান্ত ক্রিয়াতে—এক কথায় প্রাকাম্যসিদ্ধিতে—পশু উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞানবিদগণ যাহাকে instinct বলেন, তাহা এই প্রাকাম্য।"

কাজেই মানুষকে যে "মনোময় পুরুষ" বলা হয় তাহা শুধু তাহার মনন ক্রিয়ার জন্য নহে। মন ছাড়া মানুষের আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহার জন্যই সে মানুষ, এবং এই বৃত্তিগুলির তারতম্যের জন্য মানুষের মধ্যে তারতম্য ঘটে। উক্ত প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, "পশুর মধ্যে বুদ্ধির অত্যল্প বিকাশ হইয়াছে, অথচ এই জগতে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে এমন কোনও বৃত্তির দরকার যে পথপ্রদর্শক হইয়া সর্ব্বকার্য্যে কি অনুষ্ঠেয়, কি বর্জ্জনীয় তাহা দেখাইয়া দিবে। পশুর মনই এই কার্য্য করে। মানুষের মন কিছুই নির্ণয় করে না, বুদ্ধিই নিশ্চয়াত্মক, বুদ্ধিই নির্ণয় করে, মন কেবল সংস্কারসৃষ্টির যন্ত্র।"

অতএব বুঝা যায় যে, প্রাণশক্তি হইতেই মনঃশক্তি বিকশিত এবং মানুষের মধ্যে এই শক্তি পূর্ণভাবে প্রকটিত হওয়ায় উচ্চতর মানসিক বৃত্তিগুলি—-চিত্ত, বুদ্ধি, বিজ্ঞান প্রভৃতি—বিকশিত হইয়াছে। অনেক প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির অদ্ভুত বিকাশ দেখা যায়, এমন কি চিত্তের আভাস, স্মৃতিশক্তি, ভাবাবেগ প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়, তথাপি পশুকে প্রাণধর্ম্মী ছাড়া কিছু বলা যায় না। মানুষের জীবন-ইতিহাসে দেখা যায় যে, আদিম মানুষ বিশেষভাবে প্রাণধর্ম্মী ছিল।

প্রাণের আবেগেই সে সকল কার্য্য করিত, তাহার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ ছিল না। এই কারণেই এবং খানিকটা দেহগত সাদৃশ্যের জন্য ডারউইন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, মর্কটজাতীয় প্রাণীর বিবর্ত্তনে মানুষ উদ্ভূত হইয়াছে। এই তথ্য নিঃসন্দেহে এখনও প্রমাণিত হয় নাই--এখনও প্রমাণ সংগ্রহ চলিতেছে ;—প্রকৃতির সৃষ্টির লীলায় কবে, কি ভাবে মানুষ উদ্ভূত হইল তাহা নির্ণয় করা সহজ কথা নহে। তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, বহু বৃত্তিতে এখনও পশুর সহিত মানুষের সাদৃশ্য রহিয়াছে। পশুর বৃত্তিগুলি কালক্রমে মানুষের মধ্যে সংস্কৃত হইয়াছে—ইহা সভ্যতার ফল।

কিন্তু এখনও কি মানবজাতির পূর্ণ রূপান্তর হইয়াছে বলা চলে? মানুষের মনঃশক্তির অদ্ভুত বিকাশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও যে আমাদের মন বহুল পরিমাণে জড় ও প্রাণধর্ম্মী তাহা আমরা একটু আত্মবিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারি। প্রাণের আবেগে যখন আমাদের রিপুগুলি গর্জ্জিয়া উঠে তখনই দেখি আমাদের ভিতর পশুস্বভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। মানুষ সভ্য হইয়াছে বলিয়া খুব বড়াই করে, কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি, দল বা জাতি প্রাণের অন্ধ আবেগে মাতিয়া উঠে তখন তাহাতে পশুর ন্যায় হিংস্রস্বভাব ফুটিয়া উঠে। এ দৃশ্য আজও বিরল নয়—আমরা তথাকথিত বহু সভ্যদেশে এই দৃশ্যই দেখিতেছি। বরং পশুর মানুষের মত বুদ্ধির উৎকর্ষতা না হওয়ায় তাহার প্রাণবৃত্তির বিকাশ সীমাবদ্ধ, কিন্তু মানুষ বুদ্ধির সহায়তায় বিজ্ঞানালোক পাইয়া প্রাণের অন্ধ আবেগ চরিতার্থ করিবার নানারূপ চমকপ্রদ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে—যাহার ভীষণতা আমরা বিংশ শতাব্দীতেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

এখনও রহিয়া রহিয়া প্রাণের আবেগে মানবজাতি আলোড়িত হইলেও, যুগে যুগে মনঃশক্তির ক্রমবিকাশে যে পার্থিব জীবনের রূপান্তর হইতেছে—মানুষের রসবোধ ও সৃষ্টিশক্তির যে অভিনব বিকাশ হইয়াছে, এমন কি সে দেবত্ব লাভের স্বপ্ন দেখিয়াছে—ইহা কে অস্বীকার করিবে? এই মানুষই ধরায় স্বর্গস্থাপনের কল্পনা করিয়াছে। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিদের ধ্যাননেত্রে দেবতাদিগের মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছে! কতকাল পূর্ব্বে উপনিষদের স্রষ্টাগণ আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কত দেশে কত ঈশ্বর-বেত্তা, মানব-প্রেমিক, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, দার্শনিক, কবি ও শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছে! যুগে যুগে কত লোকের ধ্যান, সাধনা, চিন্তা, কর্ম্মের ফলে আজ জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির উন্নতি হইয়া মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ করিয়াছে। জাতির উন্নতির জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে কত নরনারী আত্মত্যাগ করিয়াছে—আদর্শের জন্য দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে। এই সৃষ্টিশক্তি ও ত্যাগধর্ম্ম মানুষকে মানুষ করিয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির কর্ত্তৃত্বলাভ মানুষের প্রধান কীর্ত্তি নয়, প্রধানকীর্ত্তি আত্মোপলব্ধি ও আত্মশক্তির বিকাশ।

তাই মানুষ শুধু বাহিরের পরিচয়, বিশ্বের বহিঃরূপের পরিচয় পাইয়া তৃপ্ত হয় নাই, সে অন্তর্লোকের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। সে যদি অন্তর-সন্ধানী না হইত তাহা হইলে সে সাধারণ জীবন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত; তাহার জীবনে বৈচিত্র্য ঘটিত না। সৃষ্টি হইত অনেকটা একঢালা, যন্ত্রবৎ। তাহাতে প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইত, বুদ্ধির কৌশল দেখা যাইত, কিন্তু আত্মার আনন্দের সন্ধান মিলিত না—মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র থাকিত ঊষর। মানুষ অন্তর্লোকের

দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সন্ধান পাইয়াছে "রসো বৈ সঃ"। সে সৃষ্টিতে আনন্দের আস্বাদন করিয়াছে। এ আনন্দ প্রাণের উচ্ছ্বাস, ইন্দ্রিয়ের উল্লাস, মানসিক বৃত্তিগুলির তৃপ্তি অপেক্ষা আরও নিবিড়। সে উপলব্ধি করিয়াছে পার্থিব আনন্দ, সেই উর্দ্ধের আনন্দের রূপান্তর, সেই আনন্দই হইতেছে সকল আনন্দের উৎস। মানুষের চেতনা গভীর ও উর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া সেই আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে।

এই রসভোগের, আনন্দ উপভোগের ক্ষমতাই মানুষের জীবনকে রূপান্তরিত করিয়াছে। তাই মানুষ নিছক ব্যবহারিক বুদ্ধিতে তৃপ্ত থাকিতে চায় না। এমন কি যাহারা একান্তভাবে ব্যবহারিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া গতানুগতিক জীবন ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে চাহে না, তাহাদের জীবনেও এমন ক্ষণ আসে যখন তাহারা অজানার হাতছানিতে সাড়া দেয়, কি এক অজানার সন্ধানে তাহাদের মন আকুল হইয়া উঠে—আপনাকে ভোগ করিয়া তাহারা আর তৃপ্ত থাকিতে পারে না, চায় আপনাকে বিলাইয়া দিতে, কোন এক নিবিড়তার মধ্যে ডুব দিতে। তখন মানুষের চিত্তে জাগে ধ্যান, হৃদয়ে গুঞ্জরিত হয় প্রার্থনা। মানুষ বুঝে দেহ, প্রাণ, মন সব কিছু নয়—তাহাদের সার্থকতা পূর্ণভাবে উপলব্ধি হয় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই অজ্ঞেয় আনন্দের উৎস খুলিয়া যায়।

মানুষের দৃষ্টিতে তখন ফুটিয়া উঠে বহিঃপ্রকৃতির পিছনে এক সূক্ষ্ম প্রকৃতি। মানুষ উপলব্ধি করে যে স্থূলের পিছনে রহিয়াছে সূক্ষ্ম—স্থূল সূক্ষ্মের রূপান্তর, স্থূলের কারণ সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মের বহিঃপ্রকাশ স্থূল। এই অন্তর্দৃষ্টির ফলে বৈদিক ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন প্রাকৃতিক শক্তির পিছনে সূক্ষ্ম দেবশক্তি, তাঁহাদের ধ্যাননেত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল দেবতাদিগের রূপ। তাঁহারা সূর্য্যে, চন্দ্রে, নভে, সমুদ্রে, পৃথ্বীতে

সর্ব্বত্রই অনুভব করিয়াছিলেন দেবশক্তির লীলা। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মানুষ হইতেছে দেবতার লীলাসাথী। ইহা শুধু ভারতের কল্পনা নহে, অল্প বিস্তর সকল প্রাচীন জাতিরই কল্পনা।

বৈজ্ঞানিক ইহাকে নিছক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন—কিন্তু এমন মানুষ খুব কম যিনি কল্পনার আশ্রয় না লইয়া চলিতে পারেন। আজও কি এই বৈজ্ঞানিক যুগে কল্পনা-পসারী কবির আদর কম? আজও কি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু দার্শনিক একেবারে অনাদৃত? মানুষ নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের সুখসুবিধায় জীবনকে পূর্ণ করিতে চাহে, কিন্তু অবসর সময়ে, অন্তরের নিরালায় নিছক ব্যবহারিক বুদ্ধি কি তাহার প্রাণ মন ভরাইতে পারে? যদি মানুষ নিছক ব্যবহারিক বুদ্ধিপরায়ণ হইত, তাহা হইলে গুহাবাসের বা বন্যজীবনের স্তরকে সে অতিক্রম করিয়া জীবনের বিচিত্র বিকাশ করিতে পারিত না। প্রকৃতিই তাহাকে সেইরূপে স্তরীভূত থাকিতে দেয় নাই—তাহার হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়াছে ঊর্দ্ধ বিবর্ত্তনের।

প্রকৃতির প্রেরণায় যেমন জড় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে প্রাণ, প্রাণ বিকসিত হইয়াছে মনে, তেমনি মনে ছায়া পড়িয়াছে, আবেশ আসিয়াছে ঊর্দ্ধমানসের। এই আবেশ যদি না আসিত তাহা হইলে মানুষ হয়ত পশুর স্তর হইতে একটু উন্নত হইত, মানুষের জীবন পশুজীবনের উন্নত সংস্করণ হইত, কিন্তু মানুষের কি বিশ্বের রসাস্বাদনের, বিশ্বজ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা হইত? মানুষ কি ভূমার সন্ধান করিত? আত্মপ্রসার করিয়া কি মহান আত্মার সন্ধান পাইত? এমন কি মানুষ দয়া, মায়া, প্রেম প্রভৃতি কোমল মানবীয় বৃত্তিগুলি বিকাশ করিতে পারিত? মানুষের ইতিহাসে কি শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বার্থত্যাগের নিদর্শন পাওয়া যাইত? মানুষ থাকিত নিম্ন

প্রকৃতির দাস, স্বল্পেতুষ্ট প্রাকৃতিক জীবমাত্র এবং মানবজীবন হইত অন্ধ প্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলি।

মানসিক শক্তির বিকাশেই ত মানুষের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছে। প্রাণের ত পূর্ণভাবে জড় নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা নাই—প্রাণ হইতেছে জড়ের সুপ্ত চেতনার বিকাশ। জড়কে ও প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ণ ক্ষমতা আছে মনের। সেই কারণেই জীবনলীলায় মনের আধিপত্য—"মনোময় পুরুষ" মানুষই জীবজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মনের শক্তিও পূর্ণ নয়—মন অনেক সময় প্রাণের আবেগে অন্ধশক্তিতে পরিণত হয়, বিচারবুদ্ধি হারাইয়া ফেলে; আবার জড়ের টানে স্বাধীনতা হারাইতে পারে। তাই দেখা যায় যে, মানসিক বৃত্তির অদ্ভুত বিকাশ সত্ত্বেও প্রাণের আবেগে মন দিশাহারা হইয়া পড়ে—বিচারবুদ্ধিদ্বারা গঠিত মানুষের ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্তই প্রাণের প্লাবনে ভাসিয়া যাইতে পারে। মানুষের ইতিহাস কি সভ্যতা ও বর্ব্বরতার দ্বন্দ্ব নহে? যখন বর্ব্বরতা জাগিয়া উঠে তখন মানুষের মনগড়া রীতিনীতি, আচার সব যায় ভাসিয়া। এই অতিসভ্য যুগে, বিজ্ঞানগর্ব্বী দেশগুলিতে বর্ব্বরতার পুনরাবর্ত্তন কি বিস্ময়কর নহে?

মানসিক শক্তির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিতে হইলে আশ্রয় লইতে হইবে অতিমানসের—শ্রীঅরবিন্দ যাহাকে বলিয়াছেন Supermind, Supramental। অতিমানসের সন্ধান মানুষের ইতিহাসে নূতন নহে। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা অতিমানসের সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারাই মানবজাতিকে নূতন আলোক দেখাইয়াছেন, ভবিষ্যৎ বিবর্ত্তনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র মানবজাতিকেই আশ্রয় লইতে হইবে অতিমানসের, যেমন এক্ষণে সে

বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় লইয়া জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অতিমানসই বুদ্ধির খণ্ডতা দূর করিয়া সমগ্রের, ভূমার সন্ধান দিতে পারে—খণ্ডশক্তিকে পূর্ণ, অভ্রান্ত শক্তিতে পরিণত করিতে পারে, মানব-জীবনের সত্য রূপান্তর সাধন করিতে পারে।

অতিমানসের সাধক হইতেছেন যোগী। তিনি শুধু দ্রষ্টা ও কবি নহেন, নিগূঢ় ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার অপূর্ব্ব শক্তি তাঁহার আয়ত্ত। সাধারণ মানুষের মত যোগীর দৃষ্টি শুধু বাহিরে নয়, তিনি বহির্বিশ্বপ্রকৃতির রস গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত নহেন, তাঁহার দৃষ্টি উর্দ্ধে, অন্তরে, জীবনের উৎসের দিকে। তিনি সাধারণের মত স্থূলে আবদ্ধ নহেন, তাঁহার গতি সূক্ষ্মে, কারণ জগতে। এই কারণেই বিশ্বের গূঢ় রহস্য যোগীর আয়ত্ত। তিনি বিশ্বলীলার রহস্য জানেন, আরও জানেন কোন্ প্রেরণায় লীলার গতিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হয়, রূপান্তরিত হয়। যোগীই ভাবী মানবজীবনের পথ প্রদর্শক, তিনিই পৃথিবীতে অতিমানব সৃষ্টির অগ্রণী। যোগী অন্ধশক্তির, অজ্ঞানতার ক্রীড়নক নহেন, তিনি পরাপ্রকৃতির যন্ত্র—পৃথ্বীতে পরাশক্তি বিকাশের আধার। এই কারণেই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন, সকল ভক্তের মধ্যে যোগীই আমার প্রিয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

কয়েকটী চিরন্তন সমস্যা

কি হৃদয়গ্রাহীভাবে শ্রীঅরবিন্দ সৃষ্টির বিবর্ত্তন আলোচনা করিয়াছেন! "আর্য্যে" তিনি মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর দিব্যজীবন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মাত্রেই তাহা পাঠে তন্ময় হইয়া যান—পাঠকের অন্তর্দৃষ্টিতে জ্ঞানের নূতন রাজ্য খুলিয়া যায়, সৃষ্টির সমস্ত রহস্যই যেন উদ্ঘাটিত হয়। অপর কোন দার্শনিকই এরূপ বিশদ ও মনোরম ভাবে সৃষ্টি-সমস্যা আলোচনা করেন নাই। কি গভীর তাঁহার দৃষ্টি, কি অগাধ তাঁহার পাণ্ডিত্য, কি অদ্ভুত তাঁহার মনীষা—ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

তিনি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বগুলির যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন তাহা যেমন সরল তেমনি আধুনিক কালের উপযোগী। আলোচনার যুক্তিমত্তায় বিমুগ্ধ হইতে হয়। তিনি বিশেষভাবে জড়বাদের আলোচনা করিয়াছেন, কারণ আধুনিক যুগে জড়বাদের আকর্ষণ বিশ্বব্যাপী বলিলেও চলে। আদর্শবাদী দার্শনিকের মত তিনি জড়বাদকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—বুঝাইয়াছেন যে, জড়ও ব্রহ্মের রূপ—জড়ের মধ্যেও ব্রহ্মচৈতন্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তিনি অকাট্য যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, জগৎকে স্বপ্ন, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলেই বিশ্বসমস্যার সমাধান হয় না—আমাদের চোখে যেরূপ জগৎ প্রতীয়মান হয় তাহাও ব্রহ্ম

সত্তার অন্তর্ভুক্ত; আমরা যে চেতনায় উহা দেখি তাহা আংশিক বটে, কিন্তু মিথ্যা নয়। ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব মানিলে, দার্শনিক যুক্তিতেও দৃশ্যজগতের সহিত তাঁহার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করা ছাড়া উপায় নাই।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিকও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যাহাকে আমরা জড় বলি তাহা শক্তিরই রূপ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সাধারণতঃ জড়শক্তিতেই আবদ্ধ; তিনি উহার গতিভঙ্গী নির্ণয়ে আগ্রহান্বিত। তিনি এই শক্তির সহিত প্রাণশক্তির ও মনঃশক্তির সম্বন্ধ নির্ণয়ে কুতূহলী নহেন। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকের জগৎ বিচ্ছিন্ন জগৎ —তিনি জগৎকে নানা ভাগে বিভক্ত করিযা প্রত্যেকটী বিশ্লেষণ করিতে উন্মুখ, তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে আগ্রহান্বিত নহেন। বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানলাভই তাঁহার লক্ষ্য। মায়াবাদী দার্শনিকের জগতও বিচ্ছিন্ন জগৎ, কারণ তিনি দৃশ্যজগতকে আমল দেন না, ইহা তাঁহার নিকট মায়া, স্বপ্ন, অবাস্তব, তাঁহার নিকট একমাত্র সত্য 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌' ব্রহ্ম।

জ্ঞানের বিকাশেই ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জড়শক্তিই একমাত্র শক্তি নহে। অবশ্য আমরা যাহাকে জড়শক্তি বলি তাহা আদৌ উপেক্ষণীয় নহে, তাহা প্রকৃতির একটা খামখেয়াল নহে। তাহাতেও যে চৈতন্যের স্ফুরণ হইয়াছে বিজ্ঞানই তাহা প্রমাণ করে। ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে এই চৈতন্যের উদ্ধ্বগতি হইয়াছে, রূপান্তরিত হইয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু দেখাইয়াছেন যে, যাহাকে আমরা জড়ধাতু বলি তাহাতেও আছে কেমন প্রাণের স্পন্দন, শীত-তাপের অনুভূতি, আকর্ষণ-প্রত্যাখ্যানের শক্তি। কিন্তু তাহা এত সূক্ষ্ম যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রেই সে অনুভূতি ধরা পড়ে। আচার্য্য বসু

আরও দেখাইয়াছেন যে, এই জড়-চেতনা উদ্ভিদে আরও সম্বিৎ লাভ করিয়াছে—উদ্ভিদের মধ্যে আরও প্রাণের লীলাছন্দ; এমন কি তাহাতে মানসিক বৃত্তির স্ফুরণের আভাস আচার্য্যের আশ্চর্য্য যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছে। আচার্য্য বসুর আবিষ্কার যখন প্রথম প্রকাশিত হইল, শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্যে"একটী বিশেষ প্রবন্ধে তাহার মনোরম আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং "দিব্য-জীবনে"ও চৈতন্যের বিবর্ত্তন বুঝাইতে তিনি এই আবিষ্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

এই চৈতন্যই ক্রমশঃ প্রাণীর মধ্যে প্রাণশক্তিরূপে বিকশিত হইয়াছে—জড়ের সুপ্তি কাটাইয়া প্রাণময় অজস্ররূপে বিকাশ পাইয়াছে। ক্রমশঃ ইহা মানসিক শক্তিরূপে সচেতন হইয়াছে—চৈতন্য মানুষের মধ্যে জাগ্রত, সজ্ঞান অবস্থায় আসিয়াছে। মানুষে স্ফুট হইয়াছে আত্মা, ব্যক্তিত্ব। জীবজগতে মানুষই হইতেছে আত্মস্থ, আর নিম্নস্তরের জীব প্রকৃতির ক্রীড়নক। কিন্তু মানুষও কি পূর্ণভাবে আত্মস্থ, প্রভু, বিভু?—সেও কি খানিকটা প্রকৃতির ক্রীড়নক নহে? মানুষ যতদিন পূর্ণভাবে আত্মবিকাশ না করিবে, ততদিন বলা চলিবে না যে সে প্রকৃতির দাস নহে। প্রকৃতি মানুষকে যে বৃত্তিগুলি দিয়াছেন, তাহাকে যে অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই তাহার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণেই গীতা বলিয়াছেন, 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহং কিম করিষ্যসি?' কিন্তু এমন মানুষও দেখা দিয়াছে যিনি এমন স্তরে পৌঁছিয়াছেন যেখানে প্রকৃতির আর অজ্ঞানতা, আবিলতা, অপূর্ণতা নাই—সে স্তরে আছে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আলোক, পূর্ণ শক্তি। চৈতন্যের বিবর্ত্তনেই এই অবস্থা মানুষ পাইতে পারে, এবং যে শক্তি এই বিবর্ত্তন ঘটায় তাহা হইতেছে যোগশক্তি। নিম্নে যে শক্তি অজ্ঞান, ঊর্দ্ধে তাহাই পূর্ণভাবে

আত্মপ্রতিষ্ঠ। প্রকৃতির এই দ্বিত্বের উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, 'দ্বে মে প্রকৃতি'—সাধক ঊর্দ্ধের প্রকৃতিকে বলিয়াছেন পরা প্রকৃতি।

ব্যবহারিক জীবনে, আপাতদৃষ্টিতে আমরা যেমন সত্তার অখণ্ডতা উপলব্ধি করিতে পারি না, তেমনি চৈতন্যশক্তির লীলা-বৈচিত্র্যও আমরা বুঝিতে পারি না। সৃষ্টিতে বিভিন্নরূপের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যলীলা চলিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা যদি উর্দ্ধের জ্ঞান লাভ করি, তাহা হইলে আমাদের মনে হয় নিম্নেব জ্ঞান অসার, অলীক। আমরা সহজে মানিতে চাহিনা যে, উর্দ্ধে যে শক্তি পূর্ণভাবে সজ্ঞান এবং সক্রিয়, তাহাই নিম্নে, বহির্বিকাশে অজ্ঞান, নিষ্ক্রিয়ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা যে সচ্চিদানন্দের অবতরণ; বিচিত্রভাবে আত্মবিকাশ তাহা উপলব্ধি করা কি সহজ কথা? যদি আমরা জ্ঞানীর দৃষ্টি লইয়া বিশ্বরহস্য বুঝিবাব চেষ্টা করি তাহা হইলে উপলব্ধি করিতে পারি যে, পূর্ণ চৈতন্যই যেন রূপবিকাশের জন্য, লীলাবৈচিত্র্যের জন্য আপনাকে অজ্ঞানতার মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বের প্রতি অণুতে রহিয়াছেন সেই সচ্চিদানন্দ—তিনি ত একেবারে আত্মভোলা হইতে পারেন না, ব্যাপক হইলেও ত আত্মার বিচ্যুতি ঘটেনা। তাই আমরা অনুভব করিতে পারি খণ্ডতার পশ্চাতে ভূমা, সীমার মধ্যে অসীমের লীলা—যাহা রবীন্দ্রনাথ কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন, "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্বর।" যোগী, ঋষি, সাধক যখন আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হন তখন উপলব্ধি করেন আনন্দময় এই বিশ্ব, আনন্দেই সব কিছু সৃষ্ট হইতেছে, সকলই আনন্দের তরঙ্গ। শুধু আনন্দ কেন, তিনি সমগ্র বিশ্বে অখণ্ড চৈতন্যের

বিকাশও দেখেন—কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও অর্দ্ধবিকশিত, কোথাও পূর্ণবিকশিত।

মানুষ সাধারণতঃ সমস্ত খণ্ডদৃষ্টিতে দেখে বলিয়া বিরোধের সৃষ্টি করে। মানুষ যদি জড়কে আশ্রয় করে তাহা হইলে জড়শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তির দিকে তাহার খেয়াল থাকে না। আবার যদি সে পূর্ণ চৈতন্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইলে জড়কে দিতে চাহে উড়াইয়া। কিন্তু মানুষের জীবনই কি শক্তিসমন্বয়ের সাক্ষ্য নয়? মানুষের মধ্যে রহিয়াছে জড়, প্রাণ ও মনের বিচিত্র বিকাশ। প্রাণ বিকাশ পায় জড়ের বক্ষে, মন বিকশিত হয় জড়ের ক্রোড়ে। প্রাণ বিকাশ পাইয়া জড়ের আধারকে বিনষ্ট করে না; মন পূর্ণতা পাইতে চাহে জড়ের ক্ষেত্রে, যাহাতে সে জড় ও প্রাণের রস পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারে। অতিমানসের বিকাশও এই কারণে জড়দেহে হওয়াই সম্ভব।

জড়ের মধ্যে যেমন প্রাণ ও মন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তেমনি অতিমানসও যে রহিয়াছে, ইহা শ্রীঅরবিন্দ বড় সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। প্রতি অণুতেই আছে অতিমানসের আভাস। ব্রহ্ম শুধু জড়ের আবরণ গ্রহণ করেন নাই, সেই আবরণেই তাঁহার চৈতন্য ও আনন্দ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাই ব্রহ্মের বিকাশ বৈচিত্র্য। কিন্তু এই আবরণ গ্রহণে তাঁহার সত্তার বিকৃতি ঘটেনা। তাহা যদি হইত তাহা হইলে বিবর্ত্তন সম্ভব হইত না—মানুষ তাহা হইলে খণ্ড থাকিয়া যাইত; অখণ্ডতার কল্পনাও করিতে পারিত না। আমরা খণ্ডদৃষ্টির জন্য এই তথ্য ভুলিয়া যাই বলিয়া বাহিরের রূপকে, বিকাশকে সর্ব্বস্ব মনে করি। জড়বাদী হইয়া আমরা প্রাকৃতিক সৃষ্টিতে বুদ্ধির পরিচয় পাই না। পূর্ব্বে জড়বাদী দার্শনিকগণ

কি বলিতেন না—যেমন যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃস্থত হয় তেমনি মস্তিষ্ক হইতে নিঃস্থত হয় চিন্তাধারা ?

উর্দ্ধসত্তা নিম্নসত্তায় আত্মগোপন করিয়াছে—খানিকটা আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছে, কিন্তু চিরতরে আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই। তাই লীলাবৈচিত্র্যে আবার উর্দ্ধায়ন হয়। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, প্রাণস্তর হইতে প্রাণশক্তি বিকশিত হইয়া জড়ে প্রাণের বিকাশ হইল, মনস্তর হইতে মনঃশক্তি বিকশিত হইয়া প্রাণে মনের বিকাশ হইল—এইরূপে স্থষ্টির ক্রমে অতিমানসস্তর হইতে অতিমানস শক্তি বিকশিত হইয়া মানুষের মনে অতিমানস স্থষ্ট হইবে। ইহাই ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব-রহস্য। ব্রহ্মের যদি এই কর্ত্তৃত্ব না থাকিত তাহা হইলে বিশ্বেই তিনি নিঃশেষ হইতেন—তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তা বা চেতনার হদিস্ পাওয়া যাইত না। সেই সত্তা ও চেতনা না থাকিলে বিশ্ব হইত যন্ত্রবৎ। ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে হয়ত তিনি আদিম অজ্ঞানতার তমসা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেন না। স্থষ্টির পূর্ব্বে তিনি যেমন ছিলেন—

"ছিল অমা যেদিন অন্ধ—অতল
গহ্বরে অমার,
আসীন ছিলেন তিনি তাহার মাঝে
একক—মহাকায়।" *

তেমনি থাকিতেন। জড়ের মধ্যে, কিংবা শূন্যে, থাকিতেন বিলীন ; বিশ্ববৈচিত্র্য স্থষ্টি হইত না, প্রাণের লীলাভঙ্গী দেখা যাইত না, "মনোময় পুরুষ" মানুষ স্থষ্ট হইত না, মানুষের কল্পলোক স্থষ্ট

* "Who ?"—দিলীপকুমারের কাব্যানুবাদ।—"অনামী"

হইত না, মানুষ পূর্ণতার স্বপ্ন দেখিতে পারিত না। ভগবান স্থষ্টিতে শুধু আত্মবিকাশ করেন নাই, শুধু স্থষ্টিকে ধারণ করিয়া নাই, নিজেই তাহাতে অজস্ররূপে ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিতেছেন, বিভূতিলীলা দেখাইতেছেন।

কিন্তু সকল স্থষ্টির উপর যে তাঁহার 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' সত্তা রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি না করিলেও জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। সব কিছু না থাকিলেও যিনি থাকিবেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ "The Vedantin's Prayer"—বৈদান্তিকের প্রার্থনা—কবিতা লিখিয়াছিলেন :—

"আত্মা মহীয়ান,
হৃদয়ের নীরবতার মাঝে যার স্তব্ধ ধ্যানভূমি,
জ্যোতিঃ অনির্ব্বাণ,
আছ শুধু তুমি!
হায়, তবে অন্ধকার কেন ছায় আমার নয়নে,
মেঘ উঠে ধূমি'
আলোর গগনে? ·····
এ রোল বিষম
স্তব্ধ কর—চাহি তব চিরন্তন স্বর শুনিবারে
পিপাসার্ত্তসম।
এ দীপ্ত মায়ায়
দূর কর—অনন্তের তটপ্রান্ত ভারাক্রান্ত করে
যাহা নিজ ভারে।······ *

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র সেনের (ইনি এখন বম্বে হাইকোর্টের জজ) কাব্যানুবাদ—"অনামী" ৩৮৩-৮৪

সত্যই সেই পরমধাম প্রাপ্ত হইলে মানুষ আর দ্বন্দ্ব কোলাহল পূর্ণ, ভেদবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন পৃথ্বীতে ফিরিয়া আসিতে চাহে না। এই কারণেই তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী মানবসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন—তিনি নিজেরই আত্মানন্দে বিভোর! ভগবানের সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব এমনি যে, মানুষ (খণ্ড আত্মা) তাঁহাকে যে ভাবে চায় সেই ভাবেই পায়—মানুষ দেবত্ব লাভ করে, আবার অসুরও আসুরিক শক্তিতে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। মহাদেবের বরেই না রাবণ বলীয়ান হইয়াছিল! বৃত্রাসুর সম্বন্ধেও স্বয়ং ব্রহ্মা আর্ত্ত দেবগণকে বলিয়াছিলেন, "বিষবৃক্ষোঽপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়মচ্ছেত্তুমসাম্প্রতম্"। আবার সাধনায় মানুষ অক্ষর ব্রহ্মে লীন হইতে পারে—এমন কি মহাশূন্যে —nihilএ—বিলীন হওয়া বিচিত্র নহে। সে এক এমন অবস্থা—স্বামী বিবেকানন্দের কবিতায়—"নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর"!

এই তুরীয় অবস্থার মহিমা উপলব্ধি করিয়াই মায়াবাদী উচ্চ কণ্ঠে জগতের অসারত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। মানুষের যখন একটা গভীর, নিবিড় অভিজ্ঞতা হয় তখন সে তাহার পূর্ব্ব সংস্কারের মূল্য দিতে চাহে না। তাহার প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন হয়। এভারেষ্ট অভিযানকারী মিঃ স্মাইথ তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের অব্যক্তব্য মহিমা ও মৌনতায় এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া সঙ্কল্প করেন যে আর লোকালয়ে থাকিবেন না—তিনি স্কটলণ্ডের উত্তরে হেব্রাইডিস দ্বীপের নির্জ্জনতায় আত্মমগ্ন হন।

কিন্তু মানবপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ কিছুতেই নিজকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন নাই। তিনি কিছুতেই মানিতে পারেন নাই যে, জগৎ একটা মায়ামরীচিকা মাত্র। তাঁহার

সাধনার, জ্ঞানের ভিত্তি হইল উপনিষদের ঋষির উপলব্ধি 'সর্ব্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম'। তাই তিনি সাত বৎসর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে "আর্য্যে" পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন সৃষ্টি-রহস্য, মানব-রহস্য। তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' সচ্চিদানন্দকে আশ্রয় করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সমগ্র সৃষ্টি শুধু তাঁহাতেই বিধৃত নয়, তিনিই ইহার প্রতি অণুপরমাণু। যুগ যুগ ধরিয়া অক্লান্ত অপরিসীম বিবর্ত্তন দ্বারা তিনিই তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ বিকাশ করিতেছেন মানুষের মধ্যে। এই বিবর্ত্তনে মানুষের অহং একটা স্তর মাত্র—কর্ত্তৃত্বের পূর্ব্বাভাস, পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চেতনা উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বাবস্থা। জীব খণ্ড-আত্মা, 'মমৈবাংশঃ' ; যখন সৃষ্টিতে নিজেকে বিকাশ করিয়া, সমগ্রের, পূর্ণের, অখণ্ডের আশ্রয় পায় তখনই ঈশ্বরত্ব লাভ করে। সেই পরম চেতনার উদ্বোধন হইলে খণ্ডের শুধু অন্তরে নয়, বাহিরেও রূপান্তর ঘটে, কারণ তখন বাহির হয় ভিতরেরই পূর্ণ বিকাশ। মানুষ যতদিন মানসিক সংস্কারে আবদ্ধ থাকে ততদিন পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। যদি সে উচ্চাবস্থাও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার সমগ্রের জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলেও সে সমগ্র সৃষ্টি-রহস্য উপলব্ধি করিতে পারে না, সৃষ্টির ক্রমে বিভ্রান্ত হয়। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন : "The incompetent pride of man's mind makes a sharp distinction and wants to call all else untruth and leap at once to the highest truth, whatever it may be—but that is an ambitious and arrogant error. * (মানুষের অক্ষম মানসিক অহঙ্কার একটা সুতীব্র বিভেদের সৃষ্টি করে এবং যাহাকে সে চরম সত্য মনে

* "Lights on Yoga."

করে তাহাতে চট্ করিয়া উঠিতে চায় এবং আর সব কিছুকে বলে অসত্য—কিন্তু ইহা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দম্ভপ্রসূত ভ্রম।)

এই কারণেই অনেক সন্ন্যাসী সংসারী জীবমাত্রকে উপেক্ষা করেন, তাচ্ছিল্য করেন; তাঁহার প্রতিক্রিয়ায় সংসারী মানুষ বলে, 'আমি অতি দীন, অতি তুচ্ছ, নরকের কীট, আমি কি করিয়া উদ্ধার পাইব? হে মধুসূদন, তোমার চরণে স্থান দাও'—ইত্যাদি। উদ্ধারকর্ত্তা সাজিতেও লোকের অভাব হয় না। আমাদের দেশের এই মনোভাব দূর করিবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ মন্ত্র দিয়াছিলেন 'সোঽহম' এবং বলিয়াছিলেন, "Let the lion of Vedanta roar"—বেদান্তকেশরী আবার গর্জ্জন করুক!

মানব সমাজের বিবর্ত্তনে পর্য্যায়ক্রমে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই গতি দেখা যায়। সকল জাতিতেই এই দুই গতির বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটী গতির সমন্বয় না হইলে জীবনে সামঞ্জস্য আসে না। মানুষ একান্তভাবে প্রবৃত্তির বশ হইলে তাহার জীবন হয় নিম্নগামী। আবার মানুষ বা সমাজ একান্তভাবে নিবৃত্তিকে আশ্রয় করিলে হয় ইহবিমুখ—তাহাতে সমাজমনে আসে এমন খণ্ডতা যে মানুষ ঐহিক জীবন পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়। ফলে মানবজীবন হয় ছন্দহারা, আর ব্যক্তিগত জীবনে সে যতই মুক্তির আস্বাদ লাভ করুক না কেন, সে সৃষ্টির পূর্ণরস আস্বাদনে বঞ্চিত হয়। এমন কি মনে হইতে পারে বিশ্বসৃষ্টি বোধ হয় ভগবানের একটা প্রকাণ্ড ভ্রম। অপরপক্ষে, মানুষ যদি সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া ধারণা করিতে পারে তাহা হইলে তাহার বিশ্বাত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়। একদিকে সে ব্রহ্মের বিশ্বাতীত সত্তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারে, অপর দিকে সৃষ্টির ক্রমে

১০

ব্রহ্মের ব্যাপ্তি বুঝিতে পারে। তখন সে উপলব্ধি করে এক অখণ্ড চৈতন্য ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত লীলায়িত—ঊর্দ্ধের শক্তি শুধু নিম্নে প্রতিফলিত নয়, নিম্নে সক্রিয়—নিম্নের রূপান্তরে সহায়ক।

তবু মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এই পৃথ্বীর এত দুঃখ, বেদনা, এত অজ্ঞানতা, এত অশুভ? মানুষ আদর্শের ঔজ্জ্বল্যে বর্ত্তমানকে ভুলিতে পারে, সে স্বর্গের স্বপ্নে বিভোর থাকিতে পারে, কিন্তু রূঢ় বাস্তবকে সে এড়াইবে কি করিয়া? মানুষ ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা দ্বারা কিংবা উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া জগতের কঠোরতা সহ্য করে, তবু এই সমস্যার একটা সমাধান না বুঝিলে তাহার মন তৃপ্ত হইবে কেন? সে জিজ্ঞাসা করে, কেন ও কিরূপে সচ্চিদানন্দ এই অজ্ঞানতা, নিরানন্দ, অস্থিতির আশ্রয় লইলেন? অখণ্ডতায় খণ্ডতা আসিল কি করিয়া, অসীম সসীম হইল কেন? শ্রীঅরবিন্দ "দিব্য জীবনে" নিজেই এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়াছেন এবং অপূর্ব্ব যৌক্তিকতার সহিত তাহার উত্তর দিয়াছেন। পরে তাঁহার জনৈক মনীষী শিষ্যও এই চিরন্তন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাহার যে অপূর্ব্ব মীমাংসা করিয়াছেন তাহা "The Riddle of This World" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসুমাত্রেই তাহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, ব্রহ্মের জগতে বিকাশের কারণ হইতেছে অভিজ্ঞতা লাভের প্রেরণা—অজানায় বিবর্ত্তনের অভিজ্ঞতা। যিনি স্বয়ম্ভূ, সনাতন, পূর্ণ, অখণ্ড, অসীম তিনিই খণ্ডতার রস আস্বাদন করিবার জন্য অজ্ঞানতার আবরণ লইলেন। এই আবরণ না লইলে অসীম সসীম বলিয়া প্রতীয়মান হইবে কি করিয়া, দেশকাল পাত্রের উদ্ভব হইবে কি করিয়া? কিন্তু আবরণ একটা

নয়, চেতনার উপর স্তরে স্তরে আবরণ সৃষ্টি হইয়া চেতনার রূপান্তর ঘটিল ; পূর্ণ-চেতনা খণ্ড-চেতনায়—কাল ও ক্ষেত্রের চেতনায় পরিণত হইল। এইরূপে যাহা ছিল সূক্ষ্ম তাহা স্থূলে পরিণত হইল ; ব্রহ্মের বহির্বিকাশ ঘটিল।

এইরূপে পরম চৈতন্য খণ্ড চৈতন্য বিকাশ করিয়া তাহার রসাস্বাদনে মগ্ন রহিলেন। কিন্তু অবতরণ, বিকাশ যদি সুরু হইল তাহার সীমা কোথায় পাওয়া যাইবে, কে তাহার পূর্ণচ্ছেদ নিরূপণ করিবে ? কে বলিবে 'thus far and no farther' ? ব্রহ্ম অসীম, তাঁহার বিকাশও অসীম, অনন্ত। পূর্ণ-চেতনা রূপান্তরিত হইল আংশিক চেতনায়, অবচেতনায় এবং অবশেষে অচেতনে, অজ্ঞানতায়। কিন্তু অচেতনের মধ্যেও চেতনা সুপ্ত, প্রচ্ছন্ন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরমাণুর বিশ্লেষণে সন্ধান পাইয়াছেন এক অদ্ভুত অবস্থার—যাহার স্থিতি, নিয়মকানুন নাই। সেখানে চলিয়াছে অণুর অবিশ্রান্ত নৃত্য। ইহা হইতেছে জড়ে অসীমতা, অন্তহীন গতি, অজস্র রূপসৃষ্টি। বিশ্বাতীত অবস্থায় ব্রহ্মের অন্ত নাই—বিশ্ব-বিকাশেও অন্ত নাই।

আবার এই সুপ্ত, প্রচ্ছন্ন চেতনা ঊর্দ্ধ বিবর্ত্তনে কিরূপে প্রাণ-চেতনা ও মনঃ-চেতনায় বিকশিত হয় তাহার পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি। আজও এই রূপান্তরের রহস্য সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই, এখনও ইহা বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। তবে জড় হইতে কেমন করিয়া প্রাণের স্ফুরণ হয় তাহা বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই রূপান্তর-সন্ধিতেও রূপের কত বৈচিত্র্য ! সুপ্ত জড়ে কিরূপ অলক্ষ্যে প্রাণের স্পন্দন ফুটিয়া উঠে, প্রাণের লীলায় কেমন করিয়া মনের আলোক পড়ে, ইহা আরও বিচিত্র ও বিস্ময়কর। অবশেষে

বুদ্ধির পূর্ণোদয় হয়, জড় জগতে জ্ঞানের আলোক ফুটিয়া উঠে, মানুষের আত্মা পরিস্ফুট হয়।

ব্রহ্মের এই অজানা অভিযানের প্রতীক মানুষ। একদিকে মানুষ প্রাকৃতিক প্রেরণায় জীবধর্ম্ম পালন করিতেছে, তাহার সংসার, পরিবার, সমাজ, জাতি গড়িয়াছে—অপরদিকে সে অজানার সন্ধানে, জ্ঞানের সন্ধানে, রসের সন্ধানে প্রাকৃতিক জীবনকে উপেক্ষা করিয়াছে। যদি ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য মানুষের একমাত্র কাম্য হইত, তাহা হইলে জ্ঞান-পিপাসায়, অজানার অভিজ্ঞতার জন্য দুর্গম গিরিকান্তারের রহস্য সন্ধানে সে ধাবিত হইত না। এই সন্ধানের সীমা কোথায়? একদিকে জড়ের, প্রাণের, বহিঃপ্রকৃতির রহস্য সন্ধানে কত মনীষী, কত বৈজ্ঞানিক জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; অপরদিকে মানবচেতনা, মানব সত্তার, বিশ্বাত্মার, ভগবানের সন্ধানে কত যোগী, ঋষি, সাধু, সন্ন্যাসী, দার্শনিক, পণ্ডিত ব্যবহারিক জীবনকে উপেক্ষা করিয়াছেন। জীবন-রহস্য জানিবার জন্য মানুষের কি আকুল আগ্রহ! ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যুগেও কত বৈজ্ঞানিক চেতনার বিশ্লেষণে—চেতনা, অবচেতন, অচেতন কি তাহার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মানুষের জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তি নাই, রসসন্ধানের অন্ত নাই।

এই সন্ধানীবুদ্ধিই মানব-সভ্যতার পরিচায়ক। এই বুদ্ধির ফলেই মানুষ প্রকৃতির গূঢ় রহস্যগুলি আয়ত্ত করিতেছে এবং জীবনকে সমৃদ্ধ ও শক্তিমান্ করিতে পারিয়াছে—জীবনের বৈচিত্র্য ঘটাইতে পারিয়াছে। কিন্তু মানুষ ইহাতেও তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই, বিশ্বের রহস্য আয়ত্ত না করিলে তাহার জ্ঞান পূর্ণ হইবে কি করিয়া? তাই সভ্যতার বিকাশ হইতেই মানুষ উর্দ্ধের

সন্ধান করিয়াছে, খুঁজিয়াছে শক্তি, শান্তি, আনন্দ, পরিপূর্ণতার উৎস। সে পরম চেতনার সন্ধান পাইয়াছে, পরিচয় পাইয়াছে পরমাত্মার। সে এই চেতনার সহিত যুক্ত হইবার উপায় পাইয়াছে—তাহার হৃদয়ে জাগিয়াছে ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি। ইহা তাহাকে জ্ঞান দিয়াছে সূক্ষ্মের, কারণের; বুদ্ধি দিয়াছে অতীন্দ্রিয়ের—তাহাকে অবহিত করিয়াছে শুধু জাগ্রত চেতনায় নয়, সন্ধান দিয়াছে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির। ইহাই খণ্ড জীবকে অখণ্ডতার ধারণা দিয়াছে, সীমার মধ্যে দিয়াছে অসীমের আভাস, অপূর্ণতাকে দিয়াছে পূর্ণ হইবার কৌশল—মানুষকে পথ দেখাইয়াছে ভগবানকে পাইবার।

এইরূপেই, যে পূর্ণ চেতনা নিজকে আবরিত করিয়াছিলেন অবচেতনা ও অচেতনার মধ্যে তিনিই আবার বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আত্মমুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। ইহাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন double ladder of consciousness—চেতনা অবতরণ করিতেছে ও আরোহণ করিতেছে। ভগবান খণ্ডের, সীমার মধ্যে আত্মবিকাশ করিয়া, তাহার রসাস্বাদন করিয়া, লীলাবৈচিত্র্য ঘটাইয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, আবার অখণ্ডতা, অসীমতা ও অনন্তের মহিমা জাগাইতেছেন। নিম্ন চেতনার রূপান্তর করা, নিম্নের উপর ঊর্দ্ধের আলোকপাত করাই হইতেছে তাঁহার মহিমা।

বীজের মধ্যে যেমন ভাবী বৃক্ষ নিহিত থাকে, তেমনি বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে সেই সনাতন আত্মা নিহিত। দেশ ও কাল অনুসারে যেমন বৃক্ষের বিবর্ত্তন হয়, তেমনি বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়া আত্মার বিকাশ। মানুষই হইতেছে এই ঊর্দ্ধ বিবর্ত্তনের কেন্দ্র,

এই কারণেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন মানবাত্মা 'মমৈবাংশঃ'। মানুষের মধ্যেই ঊর্দ্ধ ও নিম্নের সমন্বয়ের সম্ভাবনা। যেমন নিম্নপ্রকৃতির বিবর্ত্তনের প্রতীক মানুষ, তেমনি তাহার বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় ঊর্দ্ধ প্রকৃতি, পরম চেতনা। এই কারণেই জাগতিক অবস্থা মানুষকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে না—সে জীবনের বিড়ম্বনার মধ্যেও আত্মার জয়গান করিতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তপস্যা-সৃষ্ট জগৎ

ব্রহ্মের সৃষ্টিতে বিকাশের প্রেরণা বিষয়ে পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে, শ্রীঅরবিন্দ "The Riddle of This World"এ সে সম্বন্ধে দার্শনিকের ন্যায় শিষ্যের প্রশ্নেব জবাব দিয়াছেন। কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বে তিনি এ সম্বন্ধে "দিব্য জীবনে" যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধির পরিচায়ক। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠক যদি "দিব্য-জীবনে"র উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়টী পাঠ করেন তাহা হইলে চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় এবং সৃষ্টিতে তাঁহার বিকাশ-মহিমা আলোচনা করিয়া, জ্ঞানের মধ্যে কিরূপে অজ্ঞান আসিল, এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন অজ্ঞানের কি প্রযোজন। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ অবস্থায় সৎ, চিৎ ও আনন্দ, ত্রয়ী ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত; সে অবস্থায় কোন বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতাব আভাস নাই—তাহাতে সৃষ্টি ও সৃষ্টির অতীত অবস্থা সমভাবে বিধৃত। ব্রহ্মই সর্ব্বময়, বিরাট। তিনিই সৃষ্টির প্রতি অণুতে রহিয়াছেন। তাঁহার চেতনায় একাধারে একত্ব ও বহুত্ব। বহু হইয়াও তিনি একত্বের চেতনা হারান না। নিছক একত্বের চেতনায় বিকাশের ভঙ্গিমা নাই; তাই বহুধা বিকাশেই উদ্ভব হয

বহুপ্রকার সম্ভাবনা, বৈচিত্র্য, একত্বের মধ্যেই বহুবিধ সম্বন্ধ।* শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন দিব্যের অতিমানস চেতনা—supermind—এই সম্বন্ধ নির্ণয় করে। অতিমানস শক্তিতেই একত্ব বহুত্বে অভিব্যক্তি পায়। অতিমানসই স্রষ্টা; অতিমানসের সৃষ্টি স্বপ্নমাত্র নহে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "It is not an unsubstantial phantasmagoric idea creating mere appearances; it is being creating real terms of being"—সৃষ্টি একটা ছায়াবাজি মাত্র নহে; ব্রহ্মের সত্তায়ই সৃষ্টি—বাস্তবেই বাস্তব সৃষ্টি হইতেছে।

সৃষ্টির ক্রমে পূর্ণ চেতনা হইতে উদ্ভূত হয় বিভিন্ন খণ্ড চেতনা—মন, প্রাণ, জড়। বাস্তবে খণ্ড নয়, একই চেতনার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপান্তর। অতিমানস চেতনায় এই বিভিন্নতা বিভিন্নতা বলিয়াই মনে হয় না, প্রতীয়মান হয় একেরই লীলা-বৈচিত্র্য। কিন্তু প্রত্যেক স্তরে বিকাশের পূর্ণতা উপলব্ধি করিবার জন্য একত্বের, অসীমতার ধারণা বিলীনপ্রায় হয়। ফলে উদ্ভব হয় খণ্ড চেতনার, খণ্ড জ্ঞানের—এবং খণ্ডতায় অবশেষে উদয় হয় ভেদবুদ্ধি। এই খণ্ডতা না হইলে মন, প্রাণ বা জড়ের স্থিতি হইত না, তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্র সৃষ্ট হইত না—আমরা মনোজগৎ প্রাণজগৎ বা জড়জগৎ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, আমরাও ব্যক্তি হিসাবে সৃষ্ট হইতাম না। একে বহুর সম্বন্ধ সৃষ্টির জন্যই বিভিন্ন জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন,—

* But wherever there is anything of the nature of cosmic existence, there must be a play of relations and some principle of determination of relation.—*Life Divine*.

"It is on the play of these potentialities that the mental, vital and material worlds are founded."

পরমচেতনার বিশেষ অভিজ্ঞার জন্য একমুখিতা হইতেছে খণ্ডচেতনা সৃষ্টির কারণ। সর্ব্বব্যাপক চেতনা যখন বিশেষ সম্বিৎ-ভঙ্গীতে বিকাশ হন তখনই সৃষ্ট হয় বিশেষ চৈতন্য জগৎ। ইহা হইতেছে ব্রহ্মের তপস্যার ফল। তপস্যা হইতেছে চৈতন্যের একমুখিতা। তপঃশক্তিতেই বিশ্ব ও বিভিন্ন জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।* পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মা বা অন্যান্য দেবতাদিগের তপস্যা-কাহিনীর একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে, তাহা নিছক কল্পনা নহে। মানুষও যখন তপস্যা করে তখন তাহার সমগ্র চেতনা ও সত্তা একটী বিশেষ লক্ষ্যকে আশ্রয় করে। অসুরের আসুরিক শক্তিও তপস্যায় বর্দ্ধিত হয়।

ব্রহ্মের তপঃশক্তিতে তাঁহার বিরাট অখণ্ড চেতনায় ভাসিয়া উঠে অসংখ্য জগৎ। প্রতিটী জগৎ চেতনার বিশেষ প্রকাশভঙ্গী; তাহার হয় বিশেষ রূপ, বিশেষ প্রকৃতি। সেই প্রকাশভঙ্গী তখন আর অখণ্ড নয়, বৈশিষ্ট্যের জন্য খণ্ড। তখন তাহাতে আর পূর্ণচেতনার আলোক থাকে না; অজ্ঞানতার আবরণের একটা ছায়া পড়ে। সৃষ্টিতে তাই আলো-আঁধারের খেলা, স্মৃতি-বিস্মৃতির লীলা—জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব।

* By what power then is this (unity) ignored in our phenomenal consciousness? It is by the development of a power in conscious being, its power of dwelling in its idea of being, its act of being: this is its creative power—Tapas.
—*Life Divine.*

এই খণ্ড-জ্ঞান, অজ্ঞানতার জন্য আমরা দেহধারী বলিয়া আমাদের দেহসর্ব্বস্ব বুদ্ধি হয়। আবার যখন আমরা প্রাণের উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হই তখন ক্ষণিকের তরে আমাদের দেহের চেতনা থাকে না; যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে রণোন্মাদনায় সৈনিক দৈহিক বিপদকে করে তুচ্ছ, আঘাতকে করে উপেক্ষা। মানসিক ভাববিশেষে আমরা জগৎ-সংসার ভুলিতে পারি, কল্পলোকের সৃষ্টি করিতে পারি। তপস্যা দ্বারাই আমরা পরিচয় পাইতে পারি বিভিন্ন জগতের।

খণ্ড-জ্ঞানের জন্য অনেক সময়ে আমাদের জীবন মনে হয় আনন্দহীন। দারুণ দুঃখে আমাদের মনে হয় যেন সব থাকিয়াও কিছুই নাই। জীবন থাকিতেও মানসিক শক্তির অভাবে বা বিকৃতিতে মানুষ হয় উন্মত্তবৎ; চেতনা, আনন্দ ও বুদ্ধির অভাবে সে হইতে পারে জড়বৎ। মানুষের চেতনারই কত বিভিন্ন বিকাশ, কত ভঙ্গী, কত বিচিত্র অনুভূতি, যে বিষয়ে আজ আধুনিক বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু হইয়াছে।

অখণ্ড, পূর্ণচেতনা একমুখিতায় সৃষ্টির নানাস্তরে নানাভাবে বিকশিত হইয়া অবশেষে যেন অবলুপ্ত হয় অচেতনায়—আত্মা হন যেন আত্মবিস্মৃত। এই আত্মবিস্মৃতিই জড়ের প্রকৃতি। কিন্তু আত্মবিস্মৃতিই শেষ কথা নয়—ইহা যদি শেষ, কিংবা আদিম বা মূল হইত, তাহা হইলে পৃথিবী থাকিত একটা জড়পিণ্ড, তাহাতে জীবন-লীলার পরিচয় পাওয়া যাইত না। তাই দেখা যায় পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পর হইতেই চেতনার স্ফুরণ হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রূপ, আধার সৃষ্ট হইতে লাগিল। চেতনার ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নের অভিযানে সুরু হইল ঊর্দ্ধগতি; আবস্ত হইল ধরার বিবর্ত্তন; ফুটিয়া উঠিতে লাগিল জড়জগতে প্রাণ-জগৎ, মনোজগৎ; মানবাত্মা

স্বপ্ন দেখিল উর্দ্ধজগতের, মহান আত্মার, পূর্ণ-চেতনার। যে চৈতন্যশক্তি অচেতনায় অবগাহন করিয়াছিল, তাহাই লীলায়িত হইল উর্দ্ধে, মূর্ত্ত হইল মানবচেতনায় আরও উর্দ্ধের আস্পৃহায়। জড়ের নিশ্চলতায, স্থিতিতে বিকাশ পাইয়াছিলেন সৎ; তিনিই চিৎশক্তিতে বিকশিত হইলেন প্রাণে, জীবনে, মনে। সৃষ্টিতে আনন্দের আভাস জাগিল—মানবহৃদয়ে পরিস্ফুট হইল আনন্দময় সত্তার—উপনিষদের ঋষি উপলব্ধি করিলেন, 'সবই আনন্দে সৃষ্ট, আনন্দে বিধৃত, আনন্দেই সবার গতি।'

আনন্দই সব, কিন্তু খণ্ড-আনন্দে মানুষ তৃপ্ত থাকিবে কি করিয়া? মানুষ তাই স্বপ্ন দেখে পূর্ণ আনন্দেব, আস্বাদ করিতে চায় অখণ্ড আনন্দের, যুক্ত হইতে চায় আনন্দময সত্তার সহিত। জড়ের যে আনন্দ তাহা প্রচ্ছন্ন—সজ্ঞান নহে। প্রাণের আনন্দ পরিস্ফুট, কিন্তু পূর্ণ ভাবে সচেতন নহে। মনের আনন্দ সচেতন, কিন্তু চঞ্চল। এই চাঞ্চল্য কিসের জন্য? নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের জন্য নয় কি? মানুষ যাহা কিছু করে তাহা এই আনন্দলাভের জন্য। এমন কি মানুষ যে আনন্দ অস্বীকার করিয়া দুঃখকে বরণ করে, তাহারও প্রচ্ছন্ন কারণ আনন্দেব প্রেবণা। শুধু মানুষ যখন অসহায়ভাবে দুঃখ ভোগ করে তখনই তাহাব নিরানন্দ—অকৃতকার্য্যতা কিংবা আশাভঙ্গের জন্য।

মানুষের শত সহস্র কামনা ও বাসনা এই আনন্দলাভের জন্য ধাবিত। কামনা হইতেছে এই আনন্দময় সত্তার স্ফুরণ। মানুষের নিম্নস্তরের কোন প্রাণীর কামনা পরিস্ফুট নয়। কিন্তু মানুষের সব কামনা ত পূর্ণ হয় না; তাহারা অধিকাংশক্ষেত্রে মানুষকে করে বিভ্রান্ত—জানাইযা দেয় ইহাতে পূর্ণ আনন্দ নাই। কামনা অন্ধভাবে

ধাবিত, তাহার পূর্ণতা লাভ করিবার সামর্থ্য নাই। ইন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল, তাহারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ দিতে পারে না। তাই আনন্দকে ধারণ করিবার জন্য চাই চেতনার বিবর্ত্তন, আনন্দে স্থিতি লাভ করিতে হইলে আশ্রয় লইতে হইবে আনন্দময়ের। অজ্ঞানতায় আমরা খণ্ড-আনন্দ লাভ করিতে পারি মাত্র।

আবার মানুষের অক্ষমতা জানাইয়া দেয় যে, তাহার ইচ্ছা ও শক্তি সীমাবদ্ধ। একদিকে মানুষ শক্তিমান ; তাহার দেহের শক্তি, প্রাণশক্তি ও সর্ব্বোপরি মন ও বুদ্ধির শক্তি তাহাকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছে ; কিন্তু সে যদৃচ্ছাচরণ করিতে পারে না। তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ। দৈহিক ব্যাপারে সে প্রাকৃতিক শক্তির নিকট অসহায়। তাহার মৃত্যুর দ্বার অসংখ্য। জরা ও ব্যাধির নিকট সে অসহায়। অবশ্য সে মানসিক শক্তিদ্বারা অনেকাংশে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু চক্ষুর অগোচর বীজাণু নিমেষের মধ্যে তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে। তবু মানুষ শক্তি-কাঙ্ক্ষী। শক্তির দ্বারা সে অঘটন ঘটায়। মানুষের ইচ্ছা-শক্তি ব্রহ্মের চিৎশক্তিরই পরিচায়ক। ব্রহ্মের চিৎশক্তি অপরিমেয়; তাঁহার চিৎশক্তির তপঃপ্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট। মানুষের মধ্যেও এই শক্তি লীলায়িত। তাই মানুষ তপস্যা দ্বারা চিৎশক্তির অদ্ভুত বিকাশ করিতে পারে, অপরিমেয় শক্তি লাভ করিতে পারে। মানুষ তপস্যা, একাগ্র সাধনা দ্বারা সৃষ্টির বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে। সে শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়, কি আশ্চর্য্য ঐহিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে বিজ্ঞানের বিকাশ তাহার সাক্ষ্য।

ব্রহ্মের চিৎশক্তি অখণ্ড, এবং সৎ ও আনন্দেব সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বলিয়া পূর্ণ, স্বয়ংসিদ্ধ, অঘটনঘটন টীয়সী। সৃষ্টিতেই

তাহা খণ্ড, মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই মানুষের পূর্ণতালাভের জন্য এত আকুলতা, শক্তির বিকাশে এত আগ্রহ। মানুষেব দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ শক্তি বিকাশের প্রাথমিক উপায়। সৃষ্টিন বিকাশে যেমন পূর্ণ-সত্তা খণ্ড সত্তায়, অবশেষে অণুতে পরিণত হন, তেমনি শক্তিও খণ্ড আধারে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণ ঘটায়। দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য আত্মকর্তৃত্ব স্থাপন করা: তাই সৃষ্টির নিম্নস্তরে জীব জীবকে গ্রাস করিযা বর্দ্ধিত হয়।

সৃষ্টির উর্দ্ধগতিতে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুধু নিছক জীবনধারণের জন্য নহে, তাহার বিভিন্ন কারণ—যেমন স্বীয় ভোগসুখের বাসনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা—উপস্থিত হয়। এই সকল কারণেই মানুষ আদিম কাল হইতে কত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছে, কত রক্তপাত করিয়াছে! মানুষের উচ্চ অবস্থায় সংঘর্ষের কারণ হয় আদর্শ। আদর্শের জন্যও মানুষ কম রক্তপাত করে নাই—এখনও করিতেছে। লৌকিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ কত যুদ্ধ করিয়াছে—তথাকথিত ঈশ্বরের রাজ্যস্থাপনার জন্য বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। মানুষের ইতিহাসের এই অধ্যায় এখনও সমাপ্ত হয় নাই। এখনও ধর্ম্মের জন্য, মতবাদের জন্য (রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কারণ ত আছেই) পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

দেব-দানবের সংঘর্ষ বোধ হয় সৃষ্টির উর্দ্ধায়নের চরম সংঘর্ষ। অসুর যে খণ্ড-শক্তিতে বলীয়ান, তাহাকে সে ব্যাপক করিতে চাহে; তাহার যে খণ্ড-জ্ঞান, তাহাকে সে বিশ্বব্যাপী করিতে চাহে। সেঁ শুধু ভোগে তৃপ্ত নহে—সমগ্র বিশ্বকে ভোগায়তন ক্ষেত্রে পরিণত করিতে অভিলাষী। পুরাণে দেখা যায় অসুর বা রাক্ষস তপস্যায় 'রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্' লাভ করিয়া তৃপ্ত হয় নাই, বিশ্বকে গ্রাস করিতে চাহিয়াছে, এমন কি দেবতাগণকে সাময়িকভাবে রাজ্যচ্যুত

করিয়াছে। সে সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছে। এমন কি সে পরাশক্তির পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে চাহিয়াছে ভোগের জন্য। তাই পুরাণে আছে চণ্ডীর মনোমোহিনীরূপ দেখিয়া মহিষাসুর তাঁহাকে বনিতারূপে পাইতে চাহিয়াছে। তখন চণ্ডী কালীরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে নিধন করিয়া মুক্তি দিলেন।

নিম্নজগতের এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে বিভ্রান্ত না হইয়া মানুষ যদি পরম চেতনার, পরাশক্তির আশ্রয় লয়—যে চেতনা সৃষ্টির খণ্ডতায়, পরিচ্ছিন্নতায় আত্ম-বিস্মৃত নয়—তখন তাহার সত্যজ্ঞান ও পূর্ণশক্তি বিকাশ হয়, সে অমরত্বে, ব্রহ্মে, শাশ্বতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যু মানুষকে ঐহিক খণ্ড-সত্তার বিনশ্বরতা স্মরণ করাইয়া দেয়। মৃত্যু কি নিরানন্দের, খণ্ড-চেতনার, তাহাতে কি অজানার ভয় তাহা দেহধারী মানুষ ভাল করিয়া জানে। আর মৃত্যুতে সে অনুভব করে অদ্ভুত অসহায়তা। এই অনুভূতি কি মানুষের মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার নিগূঢ় অভীপ্সার পরিচায়ক নয়? মৃত্যুই অমরতার সম্ভাবনা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু দৈহিক জীব আমরা প্রথমেই দেহের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা করি—যাহাতে আমরা দৈহিক ভোগ-সুখের ক্ষমতা অটুট রাখিতে পারি। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় আমাদের নিগূঢ় অভীপ্সা চেতনার অমরত্ব। কিন্তু চেতনা খণ্ড আধারে আবদ্ধ থাকিলে তাহা নূতন আধার ছাড়া অখণ্ডতার আভাস পাইবে কি করিয়া? মৃত্যুই আমাদের আধারের রূপান্তর ঘটাইয়া অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যলাভের সুযোগ দেয়। স্থায়ী অভিজ্ঞতা কি মানুষকে তৃপ্ত করিতে পারে? অথচ মানুষ একটা শাশ্বত সত্তার পরিচয় চাহে, যাহাতে সে উপলব্ধি করিতে পারে যে, 'নূতনের মাঝেও সে চিরপুরাতন'—নতুবা তাহার নিজকে 'হারাই

হারাই সদা ভয় হয়'। ইহা শুধু ভয় নয়, পরিচিতের নিকট হইতে বিদায় লইবার ব্যথা।

মানুষ যতদিন অসহায়ভাবে, চেতনার খণ্ডতার জন্য, জন্ম-মৃত্যুর দোলায় দুলিতে থাকে, ততদিন মৃত্যুর অনুভূতিতে ব্যথা পায়। কিন্তু যখন সে তাহার শাশ্বত সত্তার, অবিনশ্বর চেতনার সন্ধান পায়; যখন সে উপলব্ধি করে তাহার উদ্ভব কোথা হইতে, তাহার বিকাশের কারণ, সৃষ্টিরহস্য—যখন সে মহান আত্মার, পূর্ণ চেতনার আশ্রয় লয়, তখন সে জন্ম-মৃত্যুকে বরণ করে ব্রহ্মের বিকাশ-বৈচিত্র্য হিসাবে।

মানুষ আদিম কাল হইতে মৃত্যু, অক্ষমতা ও কামনার সমস্যা-সমাধানে কত বিভ্রান্ত হইয়াছে—এগুলিকে অতিক্রম করিবার উপায়-লাভের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের সৃষ্টিতে এইগুলির রহস্য বুঝিতে পারে নাই। "দিব্য-জীবনে" Death, desire ও incapacity সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয় কি অপূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা তিনি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি এগুলি শুধু মানবীয় অভিজ্ঞতা হিসাবে দেখেন নাই, ইহাদের কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, প্রতিপন্ন করিয়াছেন সৃষ্টিতে ইহাদের অবশ্যম্ভাবিতা। আর তিনি দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্মের সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য লাভ করিলে, ব্রহ্ম চেতনার আশ্রয়ে মানব চেতনার রূপান্তর ঘটিলে, মানুষ শুধু অমরত্ব নয়, পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পূর্ণযোগের ভিত্তি

গীতাকেই শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণযোগের ভিত্তি করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনে তাঁহার অসাধাবণ জ্ঞানের কথা লোকপ্রসিদ্ধ। তিনি ঈশ, কেন প্রভৃতি উপনিষদগুলির অনুপম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বেদের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন—এমন কি বেদোক্ত মূর্ত্তিগুলি যে চৈতন্যের বিভিন্ন প্রতীক তাহা সাধনায় উপলব্ধি করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি "আর্য্যে" 'বেদ-রহস্যের' মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে তিনি উপনিষদগুলিকে ভারতের জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলিয়া মনে করিতেন, এবং স্বয়ং বেদ পড়িবার পূর্ব্বে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভাষ্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধনার বিশেষ স্তর অনুধাবন করিবার সময়ে তিনি সহসা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুসৃত, বর্ত্তমানে বিস্মৃতপ্রায়, প্রাচীন পথে আসিযা উপস্থিত হন। এই সময়ে যৌগিক-অভিজ্ঞতার সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি নাম-প্রতীক তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল; তাহাদেব মধ্যে তিনটী মাতৃশক্তির মূর্ত্তি—ইলা, সরস্বতী ও সরমা। তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের তিনটী স্তরের প্রতীক্।*

'At this time there began to arise in my mind an arrangement of symbolic names attached to certain psychological experiences which had begun to regularise themselves; and among them there came the figures of three female energies, Ila, Saraswati and Sarama, representing severally three out of the four faculties of the intuitive reason—revelation, inspiration and intuition.—*The Secrets of the Vedas.*

ইহাতেই বুঝা যায় যে তিনি আমাদের দেশের জগৎ-প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলি শুধু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য পড়েন নাই, সেগুলিকে সাধনার সহায়করূপে লইয়াছিলেন। তাহাতে যে সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা তিনি নূতন ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই জ্ঞানালোকে নূতন পথের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী গীতাভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, গীতায় যে সনাতন সত্য বিধৃত হইয়াছে তাহা দেশ, কাল ও পাত্রের অতীত। কিন্তু তাই বলিয়া বলা চলে না যে, জ্ঞানালোকের উষার দিকেই থাকিবে আমাদের দৃষ্টি: আধুনিক মানুষকে বিবর্ত্তন লাভ করিতে হইবে জ্ঞানসূর্য্যের মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে।

এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি গীতাকে করিয়াছেন পূর্ণযোগের ভিত্তি। গীতাই হইয়াছে তাঁহার ভাগবত-উপলব্ধি প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। বাংলায় থাকিতে তিনি লিখিয়াছিলেন বাংলা "গীতার ভূমিকা"; পণ্ডিচারী যাইয়া স্বরু করিলেন গীতার মহাভাষ্য, যাহা "Essays on the Gita" নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্ঞান-বিস্তারে, সাধনার সহায়করূপে কালোপযোগী বলিয়া তিনি গীতাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। পণ্ডিচারী যাইবার পূর্ব্বে গীতার বিশ্বরূপ দর্শনেব ন্যায় দুর্জ্জেয় বিষয়ে তাঁহার কি অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় প্রসঙ্গক্রমে "ধর্ম্মে" লিখিত এই অনুচ্ছেদটীতে :—

"বিশ্বরূপ দর্শন গীতায় অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অর্জ্জুনের মনে যে দ্বিধা ও সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ উক্তিদ্বারা নিরসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশদ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা অদৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত; যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই জ্ঞানের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়। সেই জন্য অর্জ্জুন অন্তর্যামীর অলক্ষিত

প্রেরণায় বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল। বুদ্ধি পূত ও বিশুদ্ধ হইয়া গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বে গীতায় যে জ্ঞান কথিত হইয়াছিল, সে সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ ; সেইরূপ দর্শনের পর যে জ্ঞান কথিত হয় সে জ্ঞান গূঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা। এই বিশ্বরূপ দর্শনকে যদি কবির উপমা বলি, গীতার গাম্ভীর্য্য, সততা, গভীরতা নষ্ট হয় ; যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনিক মত ও কবির কল্পনার সমাবেশে পরিণত হয়। বিশ্বরূপ দর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, সত্য ; অতিপ্রাকৃত সত্য নহে—কেন না বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্গত ; বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরূপ কারণজগতের সত্য, কারণজগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত অর্জ্জুন কারণ জগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন।”

অতঃপর লিখিতেছেন, “যিনি শক্তির উপাসক, কর্ম্মযোগী, যন্ত্রীর যন্ত্র হইয়া ভগবৎনির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে আদিষ্ট, তাঁহার চক্ষে বিশ্বরূপ দর্শন অতি প্রয়োজনীয়। বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বেও তিনি আদেশ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শন লাভ পর্য্যন্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না, রুজু হইয়াছে, পাশ হয় না। সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মশিক্ষার ও তৈয়ারী হইবার সময়। বিশ্বরূপ দর্শনে কর্ম্মের আরম্ভ।”—(“ধর্ম্ম”, ২৩ সংখ্যা)।

শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় গীতার ভাষ্য লেখা শেষ করেন নাই, “ধর্ম্মে” যতটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা “গীতার ভূমিকা” নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সেই অল্প কয়েক অধ্যায়ের মধ্যে তিনি শুধু গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহার অন্তর্নিহিত

রাজনীতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটাইলেন, তাহাতে ভারতের কি মঙ্গল হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুলনাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি কি লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে : "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইয়াছিল, তাহাও সত্য কথা। এই যুদ্ধের ফলে মহাপ্রতাপান্বিত কুরুবংশ একরূপ লোপ পাইল। কিন্তু কুরুজাতির লোপে যদি সমস্ত ভারত রক্ষা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কুরুবংশের ক্ষতি না হইয়া লাভ হইয়াছে।·· ···এমন হয় যে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ, দেশভাইকে যুদ্ধে বধ, জাতির হিত ও জগতের হিতের একমাত্র উপায় হয়। ইহাতে কুলনাশের আশঙ্কা যদি হয়, তাহা হইলেও জাতির হিত ও জগতের হিতসাধনে ক্ষান্ত হইতে পারি না।···এই যুগে জাতিই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, মানব সমাজের কেন্দ্র। জাতিরক্ষা এই যুগের প্রধান ধর্ম্ম, জাতিনাশ অমার্জ্জনীয় মহাপাতক। কিন্তু এমন যুগ আসিতেও পারে যখন এক বৃহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে, তখন হয়ত জাতির বড় বড জ্ঞানী ও কর্ম্মী জাতির রক্ষার জন্য যুদ্ধ কবিবেন (যেমন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কুলরক্ষার জন্য করিয়াছিলেন), অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্লবকারী হইয়া নব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া জগতের হিত সাধন করিবেন।"

সেই সুদূর অতীতেও (১৯০৯ খৃষ্টাব্দে) শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জ্জাতিকতা স্থাপনের জন্য যুদ্ধের আভাস দিযাছিলেন, আজ তাহা সত্যই জগৎজোড়া বুলি হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিকতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে জাতীয়তা আবার দম্ভভরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয়তার এইরূপ দম্ভ ও সংকীর্ণতা পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। শ্রীঅরবিন্দ মানুষের বিবর্ত্তনে খণ্ড আদর্শের জন্য সংগ্রামের

অবশ্যম্ভাবিতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু কোন দিনই নীট্‌শে বা হিট্‌লারের ন্যায় সংগ্রামের গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন নাই। বরং তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন; তবে স্মরণ করাইয়াছেন যে এই আদর্শকে অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অন্তরের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আদর্শ যতই মহান হউক না কেন, মানুষ যতদিন অন্তরে তাহা না উপলব্ধি করে, ততদিন উহা বাহিরে হয় কপটাচার ও সংঘর্ষের কারণ। এই সংঘর্ষের আগুনে পুড়িয়াই মানুষ হয় শুদ্ধ। মানবের বিবর্ত্তনে সংঘর্ষের প্রয়োজন এই কারণেই।

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে তখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ বলিয়াছেন, কিন্তু রাজনীতিক শ্রীকৃষ্ণকে তিনি গীতাভাষ্যে ফুটাইয়া তুলেন নাই—তিনি মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন অবতার শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ যদি শুধুই রাজনীতিবিদ্ হইতেন তাহা হইলে অর্জ্জুনকে তাঁহার একমাত্র উপদেশ হইত কর্ত্তব্যপালন এবং গীতা হইত কর্ত্তব্যপালনের নীতিগ্রন্থ। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের হৃদয়সমুদ্র তখন আসন্ন প্রলয়বাত্যার আলোড়নে বিক্ষুব্ধ, তিনি তত্ত্বকথায় তৃপ্ত হইবেন কি করিয়া? কাজেই ভগবানের অর্জ্জুনকে দিতে হইল চরম জ্ঞান, বিবৃত করিতে হইল পরম রহস্য, বুঝাইতে হইল সৃষ্টিতত্ত্ব—অবশেষে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে হইল।

পরম উপলব্ধির পরই যোগারূঢ় অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আর তিনি বীরকুলচূড়ামণি, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন নহেন, তিনি পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ভাগবত-যোদ্ধা—যিনি ভগবানের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরমোৎসাহে যুদ্ধ করিলেন। ভগবান দেখাইলেন যে, ইহা

নিছক রাজনীতিক যুদ্ধ নহে, ইহা হইতেছে সৃষ্টির বিবর্ত্তনে অন্তর ও বাহিরে অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ। তখন ভারতে ক্ষত্রিয়কুল যেমন ছিল দুর্দ্ধর্ষ, তেমনি ছিল দাম্ভিক। দম্ভের ফলে নীতিজ্ঞান ও [illegible]পরায়ণতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। রীতি মানিয়া চলা ছিল [illegible]নকার ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিক ঔদার্য্য ছিল অনাদৃত। এই কারণেই [illegible]ষ্মের ন্যায় মহান ব্যক্তি পূর্ব্বাপর সমস্ত জানিয়া বুঝিয়াও, দু[illegible]াধনের পক্ষ ত্যাগ করিলেন না। দুর্য্যোধনও দম্ভে এরূপ বিমূঢ় হইলেন যে, তিনি শান্তিস্থাপনার প্রয়াসী শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন।

মানুষ যখন মানবীয় বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধন করে তখন সে জাগতিক জ্ঞান, বিদ্যা প্রভৃতিতে পারদর্শী হয়, বাহুবলের পরাকাষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু আত্মার স্বরূপ বিস্মৃত হইতে পারে। প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশের দিকে, তাহার ভোগে তাহার চেতনা নিয়োজিত হয়, সে অন্তরের প্রেরণায় সাড়া দিতে চাহে না। সে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি লইয়া ব্যস্ত থাকে, মহত্তের প্রেরণা তাহার হৃদয়ে জাগে না। সে যেমন অন্তর্যামীকে চিনিতে পারে না, তেমনি সৃষ্টি কাহার বিকাশ, কে সৃষ্টিকর্ত্তা তাহার খোঁজ লয় না। সে খণ্ডকে আশ্রয় করে, অখণ্ডতা উপলব্ধি করিতে পারে না। সে মুহূর্ত্তকে অবলম্বন করে, শাশ্বতের দিকে ফিরিয়া চায় না।

অবশেষে এই খণ্ডবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি তাহার ধ্বংসের কারণ হয়। আবার অনিবার্য্যভাবে যখন সে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় তখন কর্ত্তব্য-পালনে তাহার দ্বিধা উপস্থিত হয়। সে দেখে তাহার পরিচিত, গতানুগতিক জগৎ কালের তরঙ্গে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে অসহায় বোধ করে। সে উপলব্ধি করিতে পারে না ধ্বংসের

পরে নূতন সৃষ্টি হইবে। এমন কি সে মনে করিতে পারে যে, এই আহবে যদি সে যোগদান না করে তাহা হইলে হয়ত ইহা এড়ান যাইবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের এই অবস্থা। তাঁহার দেহ ও মন অবসন্ন, তাঁহার গাণ্ডীব যেন হস্তচ্যুত। এই বিষাদের ক্ষণে তাঁহার সখা, সারথী তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিলেন, উৎসাহ দিলেন, কর্ত্তব্য-পালনের কথা স্মরণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতেও অর্জ্জুনের দ্বিধা-সংশয় দূর হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে এই খণ্ডপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী—অর্জ্জুন ইহাতে যোগদান না করিলেও ইহাকে রোধ করা যাইবে না। অর্জ্জুন কালের লীলায়, সৃষ্টির বিবর্ত্তনে নিমিত্ত মাত্র।

তবু মানুষী বুদ্ধি এই যুক্তিতে তুষ্ট হইতে চাহে না, মন প্রবোধ মানিতে চাহে না—কেন এই ধ্বংস, কেন এত দুঃখ বেদনা? তখন ভগবানকে তাঁহার সমগ্র রূপ দেখাইতে হইল, তাঁহার লীলারহস্য প্রকট করিতে হইল—চাক্ষুষভাবে দেখাইতে হইল তিনিই সব, তাঁহাতেই সব বিধৃত, তিনিই সৃষ্টির লীলায় বিভিন্নভাবে বিকাশ পাইতেছেন। অর্জ্জুন এই বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইলেন—তিনি খণ্ড, অংশ; বিরাট তাঁহার পরিচিত নহেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সখা, সারথী হিসাবেই জানেন, কাজেই তাঁহার অভিনব বিরাট সত্তা দেখিয়া তিনি বিভ্রান্ত হইলেন।

অচিরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শান্ত করিলেন—শুধু তাঁহার পরিচিত রূপ ধারণ করিয়া নহে, অর্জ্জুনকে এই জ্ঞান দিয়া যে, ভগবান নিছক ভয় আর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নহেন, তিনি মধুর—তিনি বন্ধু, সখা, অন্তরঙ্গ, জীবনসাথী। তাঁহাতেই একাধারে সব কিছুর বিকাশ

ঘটিতেছে। একদিকে যেমন দৈত্য, রাক্ষস প্রভৃতি বিমূঢ়াত্মা—যাহারা আলোককে অস্বীকার করে, খণ্ডচেতনার, অহংবুদ্ধির জয় ঘোষণা করে, যাহারা অখণ্ডের, শাশ্বতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—এক কথায়, মূর্ত্ত খণ্ড চেতনা *এবং খণ্ড বিকাশেই যাহারা তৃপ্ত। অপরদিকে, দেবগণ, সিদ্ধগণ, ঋষিগণ, তপস্বিগণ—যাঁহারা জ্ঞানালোকের সত্তা বা আলোব পথের পথিক। একদিকে আলো, অপরদিকে আঁধারে আলোর আত্মবিস্মৃতি—কিন্তু সমস্তই বিধৃত এক সত্তায়, পুরুষোত্তমে—যিনি সমস্ত বিকাশের উর্দ্ধে।

মানুষ ভগবান ও তাঁহাব স্থষ্টির প্রতীক্—মানবাত্মা তাঁহারই অংশ। মানবের মধ্যেই ভগবানের, ভাগবতসত্তার বিবর্ত্তন হইতেছে। সাধারণ জীবনে মানুষ স্থষ্টির অংশ, নিম্ন প্রকৃতির অধীন; অপবদিকে তাহার মধ্যে যে ভাগবত সত্তা নিহিত রহিযাছে তাহা যখন জাগ্রত হয় তখন ভাগবত প্রকৃতিব, পরাপ্রকৃতির আশ্রয়ে মানুষ ক্রমশঃ ভাগবত চেতনা লাভ করিতে পাবে। তখন মানুষ প্রকৃতিতে "যন্ত্রারূঢবৎ মায়যা" থাকে না, ভগবানের জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ তাহার মধ্যে পরিস্ফুট হয়; সে খণ্ড হইলেও চেতনা দ্বারা যুক্ত হইয়া অখণ্ডে বাস কবে—স্থষ্টিতে ভাগবত চেতনা বিকাশের, স্থষ্টির রূপান্তরের আধাররূপে সে ভগবানের লীলার সাথী হয়। তাহার ভিতর দিয়া ভাগবতসত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি আবার ভগবানের স্পর্শলাভ করিয়া পূর্ণ হয়।

মানবের এই বিবর্ত্তনে সহায়তা করিবার জন্য ভগবানই মানব-রূপ পরিগ্রহ করেন। যখন মানুষ দিশাহারা হয়, মানুষী বুদ্ধি যখন আর তাহাকে পথ দেখাইতে পারে না, বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যখন দারুণ অশান্তি, অসন্তোষ, অজ্ঞানতার স্থষ্টি করে; সুপ্ত বৃত্তিগুলি

যখন জাগরিত হইয়া ব্যক্তির মধ্যে, সমাজের মধ্যে, জাতির মধ্যে অনর্থ সৃষ্টি করে—যখন শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধর্ম্মের গ্লানি হয়—তখনই ভগবান আসেন মানুষের মধ্যে। ইহা শুধু প্রচলিত লৌকিক ধর্ম্মের গ্লানি নহে, মানব-ধর্ম্মের গ্লানি। মানুষ যখন আর উর্দ্ধবিবর্ত্তনের স্তর দেখিতে পায় না, তখনই ভগবান হন ব্যক্তির, সমাজের, জাতির দিশারী। কখনও কুল ধ্বংস করিয়া ভগবান জাতিগঠনে মানব ঐক্যের পথ দেখান। আবার জাতীয়তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যখন উহা বিকৃত হয়, তখন বৃহত্তর মানবজাতি গঠনের, বৃহত্তর ঐক্যের পথ দেখান।

ভগবানের এই মানবরূপ পরিগ্রহ হইতেছে তাঁহার অবতারত্ব। আধুনিকগণের মধ্যে অনেকে এই কথায় সংশয় প্রকাশ করিতে পারেন, এই জন্য শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজী গীতাভাষ্যে অবতারবাদের কথা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াছেন। অবতার হইতেছেন আদর্শ পুরুষ। তিনি যুগের, বিশেষতঃ যুগ-সন্ধির নেতা। তাঁহারই আদর্শে সমাজের, জাতির রূপান্তর ঘটে। তিনি শুধু জীবন-আদর্শ স্থাপন করেন না, ভাবরাজ্যে বিপ্লব ঘটান। তিনি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব শুধু সেই দেশের লোককে আকর্ষণ করে না, তাঁহার প্রভাব বহু জাতির মধ্যে কার্য্যকরী হয়।

মানুষ বিবর্ত্তনের যে স্তরে থাকে তাহারই উপযোগী হয় অবতারের প্রকৃতি ও রূপ। তাঁহার উদ্দেশ্য অভিনবত্ব বা অলৌকিকত্ব দেখান নয়—যদিও মানুষ অলৌকিকত্বে অভিভূত হইতে বড় ভালবাসে—তাঁহার লক্ষ্য মানব-হৃদয়ে কার্য্য করা, মানুষের মন-প্রাণ আকর্ষণ করা। এই কারণেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিকত্ব অপেক্ষা তাঁহার বাল্যলীলা, যৌবনে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশে মুগ্ধ হই।

একদিকে তিনি যেমন অবতার, অপরদিকে তেমনি যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ। দ্বাপরে অর্জ্জুন ছিলেন যুগের আদর্শ-মানুষ; তাই তাঁহাকে অবতার শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়, শিষ্য ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আধারেই দিব্যজ্ঞান বিকাশ করিলেন; তাঁহার চেতনাকে ভগবৎমুখী করিলেন; তাঁহাকে পূর্ণযোগ-কৌশল শিখাইলেন—অবশেষে তাঁহার নিকট পুরুষোত্তমরূপে নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করিলেন।

পুরুষোত্তমই হইতেছেন গীতার পরম রহস্য। পুরুষোত্তমকে না জানিলে পূর্ণযোগ-প্রতিষ্ঠা হয় না। তিনি পরম পুরুষ, তাঁহাতে বিশ্ব বিধৃত; তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা—তাঁহাতেই সৃষ্টির চরম সমন্বয়। কিন্তু তিনি সৃষ্টির অতীত; অতীত না হইলে সৃষ্টির নিয়ন্তা হইবেন কি করিয়া? আবার যদি তিনি সৃষ্টিছাড়া হন তাহা হইলে সৃষ্টি হয় একটা হেঁয়ালী—কি সৃষ্ট হইল, কোথা হইতে সৃষ্টি হইল, কে সৃষ্টি করিল এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে আমরা সৃষ্টিকে একটা অন্ধশক্তির বিবর্ত্তন মনে করিতে পারি (যেমন অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনে করেন), কিন্তু সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি সৃষ্টি-সমন্বয়, সৃষ্টি-ছন্দ, সৃষ্টি-লীলা।

জ্ঞানলাভের সহায়তার জন্য, আমাদের চেতনাকে অংশ হইতে বৃহতে বিকশিত করিবার জন্য, গীতা তিন পুরুষের কথা বলিয়াছেন—ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম। ক্ষর নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে; তাহার লীলা দেশ, কাল ও পাত্রে নিবদ্ধ। ক্ষর যতদিন নিজের লীলায় বিভোর থাকে, ততদিন অক্ষর, শাশ্বতকে বুঝিতে পারেনা। ক্ষরের জ্ঞানোদয়ে অক্ষর পরিস্ফুট হন, ক্ষর অক্ষরকে উপলব্ধি করে,

ক্ষরলীলার ঊর্দ্ধে সনাতন অক্ষর সত্তার পরিচয় পায়—উপনিষদের দুই পক্ষীর কথা।

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখি যে, অধিকাংশস্থলে মানুষ গতানুগতিক জীবনে বিরক্ত হইয়া অন্তরে আশ্রয় চায় একটা নির্লিপ্ততার। কর্ম্মজগতে ক্লান্ত মানুষ চায় একটা অখণ্ড শান্তি, তৃপ্তি—সে আত্মানন্দে, ভাবজগতে বিভোর থাকিতে চায়। অক্ষর এই নির্লিপ্ততা। তিনি কবি, জগৎসাক্ষী। তাঁহাতে সব বিধৃত, কিন্তু তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। যেন রহস্যময় আকাশ! পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন, কিন্তু উপরে আকাশ স্থির, নির্লিপ্ত। অথচ আকাশের ব্যাপ্তি সর্ব্বত্র। বৈজ্ঞানিকের ইথরতত্ত্ব আকাশের রহস্য অনেকটা ব্যক্ত করিয়াছে। মানুষ যখন উচ্ছ্বাসময় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রকৃতির নির্জ্জনতা, বিশালতা ও গাম্ভীর্য্যের মহিমা উপলব্ধি করে, তখন তাহার অন্তরে জাগে এক পরম নির্লিপ্ততা।

জ্ঞানযোগী নিয়ত অন্তরে এই নির্লিপ্ততা অনুভব করেন। যাহা কিছু ঘটুক, অন্তরে তিনি নির্লিপ্ত; কোন কিছু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। উঁচুদরের সৃষ্টিতেও মানুষের এই নির্লিপ্ততা চাই। যদি মানুষের মধ্যে এই নির্লিপ্ততা না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের জীবন পশুজীবনের উচ্চসংস্করণ হইত মাত্র। সে জীবনে সূক্ষ্মরসের আস্বাদ পাইত না; ক্ষণিকের স্থূলরস ও তাহার প্রতিক্রিয়াভোগে তাহার জীবন নিঃশেষ হইত। মানুষ জীব-জগতের সংগ্রাম ও সংঘর্ষ অতিক্রম করিবার উপায় পাইত না।

অক্ষরের এই মহিমা উপলব্ধি করিয়া ভারতের (অন্যান্য দেশেরও) বহু জ্ঞানী, বহু ধ্যানী ইহার আশ্রয় লওয়াই জীবনের গতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই ভাবের বশেই তাঁহাদের

মধ্যে কেহ কেহ জগৎকে, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সংসারকে, ক্ষরের জীবনকে বলিয়াছেন নিছক মায়া--পার্থিব জীবন একটা দুঃস্বপ্ন! সত্যই মানুষ যখন দেখে যে, একদিকে দুঃখবেদনা, মায়ামরীচিকা, আর অপরদিকে শান্তি ও নির্লিপ্ততা, তখন তাহার জ্ঞানী-মন স্বতঃই শান্তি ও নির্লিপ্ততার দিকে আকৃষ্ট হয়—উহার উপলব্ধিতেই চরম সার্থকতা মনে করিয়া বলে 'নান্যঃ পন্থাঃ'। এই কারণেই ভারতে এককালে সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ একমাত্র আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল—তুরীয় সমাধি ছিল যোগীর একমাত্র কাম্য।

গীতা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত এই ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয় করিয়াছেন। অক্ষর সত্য, সনাতন, শাশ্বত; কিন্তু ক্ষরও সত্য, সনাতন। ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয় হইয়াছে পুরুষোত্তমে। পুরুষোত্তমই ক্ষর, পুরুষোত্তমই অক্ষর—তাঁহাতে উভয় অবস্থা বিধৃত, কিন্তু তিনি উভয়ের অতীত। তিনিই সনাতন, শাশ্বত, পরম সত্য, পরমা গতি। তাঁহার সত্তায় প্রকৃতি সৃষ্ট, জীব সৃষ্ট। প্রকৃতি তাঁহার চেতনার অজানায় অভিযান; জীব তাঁহার অংশ—মমৈবাংশঃ। কিন্তু তাঁহার দুই প্রকৃতি—দ্বে মে প্রকৃতি; পরাপ্রকৃতি তাঁহার পরম চেতনা। জীবে তাঁহার পরাপ্রকৃতি বিকাশ পাইলেই তাঁহার বিকাশের পূর্ণতা —আর জীবেরও পূর্ণতা। এক বহুর বৈচিত্র্য উপভোগ করিতেছেন —বহু তখন বহুর ও একের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কারণে পুরুষোত্তমের আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব দেশ ও কালের মধ্যে পুরুষোত্তমের অভিব্যক্তি: ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশও পুরুষোত্তম। এইজন্যই মানুষের পরমা গতি পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম মানুষের শুধু নিয়ন্তা, প্রভু, বিভু নহেন, তিনি অন্তর্যামী—সাথী, পরম সখা।

ক্ষর মানব অক্ষর ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া পুরুষোত্তমের বিশ্বব্যাপী, সনাতন সত্তা উপলব্ধি করে—পরমধাম প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার চেতনায় ক্ষরের লীলা আর খণ্ড নয়—তাহা অখণ্ডেরই বিকাশ, অখণ্ডেরই লীলাবৈচিত্র্য, বৈচিত্র্যেও ছন্দোময়। পুরুষোত্তমের আশ্রয় লইলে চরাচর সমস্তই দেখে পুরুষোত্তম, দেখে সর্ব্বভূতে পুরুষোত্তম, দেখে পুরুষোত্তমের বিশ্বরূপ—দেখে এক বিরাট, মহান সত্তা অগণণরূপে বিকাশ পাইয়াছেন, লীলামাধুর্য্য সৃষ্টি করিতেছেন—আবার সবার প্রভুরূপে বিশ্ব পরিচালনা করিতেছেন।

মানুষ যখন এইভাবে পুরুষোত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আধার অনুসারে—অর্থাৎ লীলাবৈচিত্র্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করিয়া —পুরুষোত্তমেব সত্তা বিকশিত হয়। তখন মানুষ যে অবস্থায় থাকুক, যাহাই করুক না কেন, সে আর মানুষী খণ্ডবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় না—তাহার দিশারী হন স্বয়ং পুরুষোত্তম। তখন মানুষ হয় যোগী ; —কৌপীনধারী, সমাজে নিজের বিশেষত্ব ও প্রভাব দেখাইবার জন্য লালায়িত, 'আমি একটা কেউ-কেটা নই'-ভাবাপন্ন যোগী নহে ; —বিশ্ববন্ধু, মানবপ্রেমিক, করুণাময়, উদারহৃদয়, নিত্য ভাগবত-যোগযুক্ত পরম যোগী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যোগীই তাঁহার পরম প্রিয়। তাঁহাকে তিনি বাহিরের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে, শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে, উৎকট কঠোরতপা হইতে উপদেশ দেন নাই (বরং বলিয়াছেন এই অহৈতুক কৃচ্ছ্রসাধনে তিনিই পীড়া অনুভব করেন)—বলিয়াছেন সর্ব্বকর্ম্মে, জ্ঞানে, ভক্তিতে সর্ব্ব অবস্থায় তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিতে, সর্ব্বদা হৃদিস্থিত হৃষীকেশ, নারায়ণ, জনার্দ্দন, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে। প্রেরণা দিয়াছেন দিব্যকর্ম্মী হইতে, লোক-সংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিতে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভাগবত শক্তির বিকাশ

ভক্তি মানুষের ভগবানের সহিত যুক্ত হইবার সেতু। মানুষ যখন ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয় তখনই তাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির উদয়ে ভগবানের সহিত মানুষেব প্রেমের যোগ হয়। ভক্তিই ভাগবত কৃপা—ভক্তের হৃদয়ে ভগবানেব আনন্দঘন মূর্ত্তির বিকাশ। ভক্তির উদয়ে মানবাত্মা পবমাত্মার সহিত শাশ্বত যোগসূত্র বুঝিতে পারে। কি মধুর ভাবে শ্রীঅরবিন্দ "Synthesis of Yoga"-শীর্ষক প্রবন্ধগুলির এক অধ্যায়ে ভক্তির মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন! ভক্ত ভগবানকে যাহা কিছু দিয়া পূজা করে—একটী ফুল, একটী পাতা, একটু জল—তাহাতেই ভগবান তৃপ্ত। মানুষের অন্তর হইতে যখন ভক্তির উৎস উঠে, ভগবান তাহা প্রেমরসে সিঞ্চিত করেন।

মানুষ জ্ঞানবিকাশের পর হইতেই ভগবানেব সন্ধান করিয়াছে। মানুষ ভগবানকে কত মূর্ত্তিতে, কত রূপে, কত ভাবে অর্চ্চনা করিয়াছে, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে। মানুষ মানুষীরূপেও ভগবানকে পাইয়াছে—কত অবতার, নবী, ধর্ম্মগুরু, জ্ঞানীগুরু, যোগীগুরুর পূজা করিয়াছে। তবু মানুষের হৃদয়ে প্রশ্ন উঠে, 'কস্মৈ দেবায়'? মানুষ অনেক সময়ে নিজের বুদ্ধি ও কল্পনানুযায়ী ভগবান সৃষ্টি করিয়াছে; তাহা লইয়া খণ্ডবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিপরায়ণ মানুষের মধ্যে কম সংঘর্ষ হয় নাই। এখনও কি সে সংঘর্ষের শেষ হইয়াছে? আজও মানুষ

ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করিবার জন্য রক্তারক্তি করিতে একটুও পশ্চাদপদ নহে।

মানুষের স্বভাব এই যে, সে নিজে যাহা বিশ্বাস করে অপরকে তাহা বিশ্বাস না করাইতে পারিলে তৃপ্ত হয় না। এইরূপ বিশ্বাসে মানুষ গোষ্ঠী, সমষ্টি, সম্প্রদায় গঠনে বিশেষ ব্যগ্র। শুধু বিশ্বাস হইতে প্রবর্ত্তিত আচার, মতবাদ প্রভৃতি প্রচারে মানুষের কতই না আগ্রহ! এই মনোভাবের ফলে মানুষ ভগবানের সার্ব্বভৌমত্ব ভুলিয়া যায়, ভুলিয়া যায় যে ভগবানই সব, সবই ভগবানের সৃষ্টি। সৃষ্টিতে যে বৈচিত্র্য তাহাও ভগবানের। মানব ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে এই সংঘর্ষ, ধর্ম্মমতের অসহিষ্ণুতা, ধর্ম্মের বিকৃতি দেখিয়া এক শ্রেণীর মানুষ ধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত। লোক বিশেষের স্বার্থবুদ্ধিতে ধর্ম্মের বিকৃতি দেখিয়া, ভ্রান্ত মতের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে ধর্ম্মই সব অনিষ্টের মূল। ইদানীং আমরা দেখিয়াছি যে, এই কারণে কোন এক রাজনীতিকসম্প্রদায় ধর্ম্মকে জনসাধারণের পক্ষে অহিফেনের ন্যায় বুদ্ধি-ম্লানকারী বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

কথাটা একেবারে নিছক মিথ্যা নয়, কারণ মানুষের স্বার্থবুদ্ধির জন্য যখন কোন জিনিষ বিকৃত হয় তাহার অনিষ্টকারিতা নির্ব্বিচারে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। তখন মানুষের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই মনোভাবের ফলে কাহারও কাহারও ধারণা জন্মে যে, মানুষের ভোগসুখের ব্যবস্থা করা, মানবধর্ম্ম পালন করার সুযোগের ব্যবস্থা করিলেই হইল। তাহার জন্য যে কাজ করা যায় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। ভগবানকে দাঁড় করানর প্রয়োজন কি?

বাস্তবক্ষেত্রেও আমরা অনেকেই এই ভাবে চলি। আমরা সকলে মানবতার ধার ধারি না, তবে নিজের এবং সম্ভবমত পরের

ভোগসুখের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, মানবজীবন সার্থক হইল মনে করি। আমাদের কোন ধর্ম্মবিশ্বাস থাকিলেও তাহা থাকে মনের এক কোণে। দরকাবমত আমবা তাহা জাহির করি, বিপাকে পড়িলে হয়ত তাহার আশ্রয় লইতে পারি। তাহার আচার পালন করাই চবম সার্থকতা মনে করি, কিন্তু তাহাব আদর্শে ব্যক্তিগত (জাতিগত ত নহেই) জীবন গঠন করাব ধাব ধাবি না।

কিন্তু জীবনে আমবা কি একেবাবে ভগবানকে এড়াইযা চলিতে পারি? গতানুগতিক জীবনে আসে যখন প্রচণ্ড আঘাত, তখন আমরা দিশাহারা হইয়া উর্দ্ধে তাকাই এবং আমাদেব আকুলতা জাগে—এমন কি কেউ বিশ্বে নাই যাব নিকট আমাদের মর্ম্মবেদনা পৌছে? আমাদের অহংবুদ্ধি যাহাতে তৃপ্ত হইতে পাবে, সংস্কার বা ধারণানুযাযী সেইরূপ সাড়া হয়ত পাই না; কিন্তু একটু কান পাতিয়া শুনিলে হৃদয়ের অন্তস্তলে একটু সাড়া পাওযা যায বৈ কি।

কিন্তু শুধু দুঃখ বেদনা কেন, প্রাচুর্য্যের মধ্য দিয়া, আনন্দের মধ্য দিয়া, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া কি আমরা অসীমের হাতছানি পাই না? এই বিষযে জনৈক শিষ্যের নিকট শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন: তুমি হয়ত নির্জ্জন নদীতটে একটী সুন্দর মন্দির দেখিতেছ; হয়ত মূর্ত্তির সৌষ্ঠব কিংবা মন্দিরের কারুকার্য্যে তোমার মন বিভোর! অকস্মাৎ হয়ত তুমি অনুভব কর যে জগন্মাতার সস্নেহ দৃষ্টি তোমার উপব নিবদ্ধ—যেন চকিতে তুমি দেখিতে পাও তাঁর প্রসন্ন আনন! কিংবা হয়ত তুমি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়াছ; নিম্নের প্রাকৃতিক দৃশ্য স্বপ্নের মত—উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, আকাশ মাটিকে আলিঙ্গন করিতেছে। তখন হয়ত তোমার হৃদয়ে জাগিয়া ওঠে অনন্তের আভাস, তুমি অনুভব কর

এক বিশ্বসত্তা, যাহাতে সমস্ত বিবৃত। ভাবাবেশে তোমার ক্ষুদ্রত্ব বিস্মৃত হও।*

সত্যই আমরা যখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অভিভূত হই (প্রকৃতির রুদ্ররূপেও;—সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র এই অনুভূতিটি বড় চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন), তখন অজ্ঞাতে আমাদের হৃদয়ে ভক্তির উৎস বিশ্বস্রষ্টার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু শুধু বহিঃপ্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে ভাগবত প্রেরণা জাগায় না: কোন হৃদয়গ্রাহী পুস্তক, কোন দার্শনিক তথ্য, কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও আমাদিগকে ভাগবত মহিমার আভাস দিতে পারে। আমরা যদি প্রতীক্ষায় থাকি, হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখি, আমাদের মন যদি উন্মুখ হয়, তাহা হইলে ভগবানের, ভূমার স্পর্শ পাইবার যে অসংখ্য পথ রহিয়াছে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

ভগবানের এই বিরাটত্ব, অসীমতার আকর্ষণ আমাদের চেতনার বিবর্ত্তনের প্রথম অবস্থা। এই প্রেরণা যদি ক্ষণস্থায়ী না হয়, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ শুদ্ধাভক্তির উদয় হইতে থাকে। ভক্তি ক্রমশঃ জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে; আমরা অহংবুদ্ধির অতীত সত্তার অনুসন্ধান করি। সন্ধানের ফলে ক্রমশঃ আমরা ভগবানের নিত্য, শাশ্বত সত্তার পরিচয় পাইতে থাকি। আমাদের হৃদয় ও মনে বিকাশ পায় সমতা। সমতাই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ভিত্তি। এইজন্য শ্রীঅরবিন্দ গীতাভাষ্যে ও অন্যান্য প্রবন্ধে সমতার কথা বিশেষ ভাবে লিখিয়াছেন।

* "The Riddle of This World."

সমতা কি? ইহা কি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উদাসীনতা—শুধু নিজের ভাবে বিভোর হইয়া থাকা? যৌগিক সমতা উদাসীনতা নহে। যোগী আপাতদৃষ্টিতে সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন; বাহিরে তাঁহার চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না; মানুষের সুখদুঃখে তিনি যেন নির্ব্বিকার। মনে হয় যেন তাঁহার হৃদয় বলিয়া কিছুই নাই। বাস্তবপক্ষে যোগীর দৃষ্টি আপাতদৃশ্য ঘটনাবলীতে নিবদ্ধ নহে; তিনি উপলব্ধি করেন কালপ্রবাহে সমস্ত জিনিষের অভিব্যক্তি হইতেছে, তাহারা মানব দৃষ্টির অগোচর লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তিনি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করেন, কিন্তু কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় ঘটনার অবশ্যম্ভাবিত্ব বুঝিয়া বিচলিত হন না। তাঁহার ভাবাবেগ সাধারণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়, তাহা গভীর। তাঁহার হৃদয় সমগ্র বিশ্বের স্পন্দন অনুভব করে; বিশ্বের মঙ্গল, শান্তি, আনন্দ ও পরিপূর্ণতার ধ্যানে তিনি মগ্ন। তিনিই সত্য বিশ্বপ্রেমিক।

বহিঃপ্রকৃতির, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপারই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি বাহিরের চাঞ্চল্যের পিছনে স্থির, শাশ্বত সত্তা অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন নিম্নপ্রকৃতি ঊর্দ্ধ প্রকৃতি-স্পর্শের জন্য, রূপান্তরের জন্য উন্মুখ। তাহার আকুলতা, চাঞ্চল্যের কারণ এই উন্মুখতা। তিনি উপলব্ধি করেন প্রাকৃত জীবনের গতি দিব্যজীবনের দিকে—দিব্যজীবন প্রাকৃতজীবনের রূপান্তরের অপেক্ষায় আছে। যে পরাশক্তিতে এই রূপান্তরের সম্ভাবনা তাহা তিনি অনুভব করেন, এবং তিনি আশ্রয় লন এই শক্তির, এই শক্তির নিকট প্রাকৃতসত্তাকে সমর্পণ করেন। স্বীয় আধারে তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া—(macrocosm in microcosm)—

তাঁহার আত্মা বিশ্বাত্মার সহিত যুক্ত হয়, তিনি বিশ্বহিতের জন্য, মানবের দিব্যরূপান্তরের জন্য অখণ্ড কর্ম্ম করেন। এই কর্ম্মে তাঁহার যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে, ইহা তাঁহার অহং, খণ্ডব্যক্তিত্ব নহে, ইহা পরম ব্যক্তিত্ব—পুরুষোত্তমের বিকাশ।

তাঁহার কর্ম্ম বুদ্ধদেবের ন্যায় নিছক জ্ঞানযোগ, কিংবা খৃষ্ট বা গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় নিছক প্রেম-ভক্তিযোগ না হইতে পারে। কখন কখন যোগী যুদ্ধের ন্যায় ঘোর কর্ম্মেও আত্মনিয়োগ করিতে পারেন—যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের খণ্ডপ্রলয়ে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধ শ্রীঅরবিন্দের কথায়—

"ধরার কল্পলোকের তরে ঘোষেণ তিনি রণ।"

যুদ্ধে দিব্যকর্ম্মী মানুষের স্বাভাবিক যন্ত্রণা, বেদনা ও আর্ত্তনাদে উদাসীনতা দেখাইলেও তাঁহার দৃষ্টি থাকে পরম মঙ্গলের দিকে। যুদ্ধকে তিনি নীট্‌শের মত, কিংবা হিট্‌লার যেরূপ বলেন তাহার মত, জীবনের, জাতির চরম আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন না; আবার উৎকট শান্তিবাদীদের মত বিনা আয়াসে চিরস্থায়ী শান্তির কল্পনায় বিভোর থাকেন না। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মানুষের ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত অহমিকা ধ্বংসের জন্য, খণ্ডবুদ্ধি দূর করিবার জন্য, জড়জগতে, প্রাণজগতে ও মনোজগতে যুদ্ধের প্রয়োজন। কিন্তু মানুষকে যে চিরকালই যুদ্ধ করিয়া কাটাইতে হইবে তাহা নয়। মানুষ যখন সংঘর্ষের গ্লানিতে আর্ত্ত হইয়া উঠিবে, আন্তরিকভাবে মৈত্রী উপলব্ধি করিবে—যখন মানুষ নিজেকে বিশ্বাত্মার সহিত যুক্ত করিবে, বহুর মধ্যে এককে অনুভব করিবে, নিজের মধ্যে বহুকে ধারণ করিবে, তাহার চেতনা মানুষের সাধারণ সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিবে, তখন যুদ্ধ হইবে অসভ্যতার নিদর্শন।

কিন্তু মানুষ যতদিন সেই পরম আলোকের সন্ধান না পায়, ততদিন তাহাকে দুঃখ আনন্দ, হিংসা অহিংসা, যুদ্ধ শান্তি প্রভৃতি দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। জ্ঞানের পূর্ণতা হইলে এই দ্বন্দ্ব চুকিয়া যাইবে। মানুষ তখন আনন্দলোকের সন্ধান পাইবে—ধরায় কল্পলোক বিকশিত হইবে।

সমতায় প্রতিষ্ঠিত, ভাগবত চেতনায় নিত্যযুক্ত যোগী উপলব্ধি করেন সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি। কাজেই তিনি যেমন বাহিরে মানুষের হাসিকান্নায় যোগদান করিতে দ্বিধাবোধ না করিতেও পারেন, সাধারণ কাজ করিতে পারেন, তেমনি তিনি আবার ভাগবত প্রেরণায় সর্ব্বদাই বিরাট কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত। আবার তিনি ঐ প্রেরণায় একান্ত কর্ম্মহীন অবস্থায় তুরীয় সমাধিতে মগ্ন থাকিতে পারেন। নিশ্চল থাকিলেও তিনি নিষ্কর্ম্মা নহেন। স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেন নাই যে, যোগীর সাধনায় ভাবরাজ্যে যে বিপ্লব ঘটিতে পারে, শত সহস্র লোকের কর্ম্মেও তাহা হইতে পারেনা? বুদ্ধদেব শিখাইয়াছিলেন নির্ব্বাণ—কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পরে ভারতে ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজ-নীতির যে অভিনব বিকাশ হইয়াছিল, শিল্পকলায় যে অভিনব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কি বুদ্ধের সৃষ্ট ভাব-বিপ্লবের ফল নহে? বুদ্ধ শুধু এ জাতি নহে, অপর বহু জাতির মধ্যেই নূতন জীবন-সৃষ্টির বীজ বপন করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের, যোগীর কর্ম্মক্ষেত্র শুধু বাহিরে নয়, অন্তরে। তাঁহার নিকট কর্ম্মের বিভেদ নাই, তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

পূর্ণযোগের ভিত্তি উদার দৃষ্টি ও সমতা। শ্রীঅরবিন্দ যোগপথ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে

সাধককে অন্তরে সমতা ও স্থৈর্য্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। স্থিরতা না জন্মিলে আমরা উর্দ্ধতর সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারি না। এই সত্তাই ভাগবত সত্তার সহিত যুক্ত। আমাদের মন সাধারণতঃ চঞ্চল, বিষয়মুখী ও ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে উন্মুখ। এইজন্যই প্রথমে মনে স্থিরতার প্রয়োজন। মন যখন শান্ত, প্রাণাবেগেও অচঞ্চল. ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যমুক্ত ও সমতাযুক্ত হয়, তখনই আমাদের স্থিরবুদ্ধির স্ফুরণ এবং প্রকৃত সত্তার—আত্মার—উদ্বোধন হয়—যে সত্তা শাশ্বত, বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনেও অপরিবর্ত্তনশীল—যাহা আমাদের সত্য ব্যক্তিত্ব, যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'মমৈবাংশঃ'।

মনের চাঞ্চল্য দূর হইলে হৃদয়ের চাঞ্চল্যও দূর হয়। আমাদের ভাবাবেগ, স্বাভাবিক অনুভূতির প্রকৃতিকে সমভাবাপন্ন না করিলে আমরা জাগতিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইতে পারিনা, আমাদের মমত্ব দূর হয় না। মমত্ব দূর না হইলে যেমন আমাদের সত্যজ্ঞান হয় না, হৃদয়ও স্বচ্ছ হয় না। হৃদয় যখন আবিলতাবিহীন হয় তখনই তাহাতে স্ফুরিত হয় ভাগবত প্রেম, ভগবানে আস্পৃহা—যাহাকে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন aspiration। এই আস্পৃহা প্রথমে আমাদিগকে ভাগবতমুখী করে এবং বিকাশ করে চৈত্যপুরুষকে (Psychic)। এই চৈত্যপুরুষই অলক্ষ্যভাবে মনোময় সত্তা, প্রাণময় সত্তা ও অন্নময় সত্তার পিছনে রহিয়াছে—কিন্তু আমরা এই বিভিন্ন চেতনার দাবী মিটাইতে ব্যস্ত, চৈত্যপুরুষের সন্ধান রাখি না। কাজেই আমাদের মন, প্রাণ ও দেহ আলোড়িত হইলে বিভ্রান্ত হই। চৈত্যপুরুষ সম্বন্ধে যখন আমরা সচেতন হই তখনই আমাদের মন, প্রাণ ও দেহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জন্মে।

"যোগের আলোক" ("Lights on Yoga") নামক পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্তরের বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা যদি জীবনের রূপান্তর চাই, তাহা হইলে আমাদের এই রহস্যের সন্ধান করিতেই হইবে, আমাদের সত্তার পরিচয় পাইতেই হইবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান যেমন আমাদের দেহের পরিচয় দেয়, তেম্নি যোগ-বিজ্ঞান পরিচয় দেয় আমাদের প্রকৃত সত্তার ও উর্দ্ধ সত্তার। এই পরিচয় না পাইলে আমরা আমাদের সত্তাকে ভাগবতশক্তির আধার করিতে পারি না—ভগবান ও তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা পাইতে পারি মাত্র।

"যোগের আলোক" ও "যোগের ভিত্তি" ("Bases of Yoga") এই দুইখানি পুস্তক মানুষের দিব্যজীবন লাভের পরম সহায়ক। যোগ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্যে" "Synthesis of Yoga" নামে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন তাহাকে যোগ-বারিধি বলা যায়; কিন্তু ঐ দুইখানি পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যদিগের ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তরগুলি একত্র করা হইয়াছে। তাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহার উপর আলোকপাত করিয়া শ্রীঅরবিন্দ মানব চেতনার উর্দ্ধ বিবর্ত্তনের কৌশল দেখাইয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার প্রণালী এই যে, তিনি বাঁধাধরা, ছককাটা কতকগুলি আধ্যাত্মিক নিয়মকানুন প্রণয়ন করেন নাই, কিংবা বাধা-নিষেধে সাধকদিগের জীবন আড়ষ্ট বা মন পঙ্গু করেন নাই। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে বা সাধনায় তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহারই সমস্যা-সমাধানে সাহায্য করিয়াছেন। পূর্ণযোগের উদ্দেশ্য নিম্নের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধের

ধর্ম্ম স্থাপন করা—জীবনের বিকাশ-বৈচিত্র্য সূক্ষ্মতর, রসঘন করিয়া তোলা, জীবনের কোন অংশকে অস্বীকার করা নয়। কিন্তু জীবনের নিয়ন্তা তখন অহং নয়—জ্ঞান, শান্তি, আনন্দদায়িনী ভাগবত শক্তি। জীবনের উদ্দেশ্য তখন খণ্ড-অহংকে পূর্ণ করা নয়, অখণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাঁহারই ধর্ম্ম গ্রহণ করা, তাঁহারই ইচ্ছায়, শক্তিতে বিশ্বলীলার উদ্দেশ্য সফল করা। কাজেই অধ্যাত্মজগতে dictatorshipএর স্থান নাই—ভগবান ত' স্বেচ্ছাচারী রাজা বা সর্ব্বময় কর্ত্তা নহেন, যে একঢালাভাবে জীবন গঠন করিবেন! বিশ্বে বৈচিত্র্য ঘটান তাঁহার কাজ।

জীবনে সংযমের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনায় সে সংযম হইবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সংযম। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি'—শুধু বাহিরের সংযমে বহিঃপ্রকৃতি কখনও আয়ত্ত করা যায় না, চাই অন্তরের প্রেরণা, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন। তাই শ্রীঅরবিন্দ সংযমের নীতিজ্ঞান প্রচার করেন না; ইঙ্গিত দেন সমর্পণের—আমাদের প্রত্যেক বৃত্তিকে ভাগবত শক্তির নিকট সমর্পণ করিতে বলেন।

আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তিগুলির উপর যতক্ষণ কর্ত্তৃত্ব লাভ না করি, ততক্ষণ তাহারা আমাদের সত্তাকে আলোড়িত করে; আমরা এই চাঞ্চল্যে অসহায়। আমাদের মন যতই উন্নত হয় ততই আমরা তাহাদের আয়ত্ত করিতে চাহি, বুদ্ধি-দ্বারা এবং অনেকক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ দ্বারা। অনেক সময়ে আমরা কৃতকার্য্য হই বটে, কিন্তু আচম্বিতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, আমাদের মন ও বুদ্ধি কর্ত্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে। দেহ ও প্রাণের আলাদা ধর্ম্ম আছে, মন ও বুদ্ধি তাহাদের দ্বারা

অভিভূত হইয়া পড়ে। এই জন্যই আমরা দেখি যে, পরম পণ্ডিত, সুবিজ্ঞ দার্শনিক কিংবা উঁচুদরের শিল্পী বা কবি আকস্মিক ভাবে প্রাণস্রোতের উচ্ছ্বাসে বিভ্রান্ত হইয়া উঠেন। কথায় বলে 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'।

মানবজাতির ইতিহাসেও এইজন্য দেখি মানুষ যুগে যুগে কত নীতি, নিয়মকানুনের বেড়া দিয়া সমাজ রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইযাছে, কিন্তু প্রাণের উন্মাদনায় তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সমাজে দেখা গিয়াছে অসুর-তাণ্ডব। তাই বলিয়া ইহাও বলা চলে না যে, নীতিজ্ঞান, ethics, একেবারে নিরর্থক। মানুষ নীতিজ্ঞানের বিকাশেই পাশবিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া সভ্যতার আলোকে আসিযাছে। সকল ধর্ম্মেই সেইজন্য নীতিশাস্ত্র স্থান পাইয়াছে; অধিকাংশ ধর্ম্মপুস্তককে নীতিশাস্ত্র বলিলেও চলে।

কিন্তু সভ্যতার এতদূর বিকাশেও মানুষ এমন অবস্থায় আসিয়াছে, যাহাতে নীতিশাস্ত্র অজ্ঞানতার প্লাবনে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানবিৎগণ বলেন যে, ইহা অচেতনের (unconscious) স্ফুরণ। মানব-সভ্যতা এতদিন সুরম্য নগরীর মত গড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার তলদেশে প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি রহিয়াছে কে মনে করিয়াছিল?

মানুষের এক্ষণে ধারণা জন্মিতেছে যে, শুধু মানসিক বৃত্তি ও বুদ্ধি দ্বারা সুষ্ঠু ভাবে, স্থায়ীভাবে জীবন ও সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। মানসিক চেতনার ঊর্দ্ধে যে অতিমানস চেতনা আছে তাহাকে নামাইতে হইবে, এবং তাহার বিকাশেই মানুষের কর্ত্তৃত্ব জন্মিবে শুধু মনে নয়, প্রাণে এবং দেহে। শুধু মনের কর্ত্তৃত্বে প্রাণের প্লাবন রোধ করা কিংবা প্রাণের কর্ত্তৃত্বে দেহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর

নহে। যখন মানুষের হৃদয় খুলিয়া যায়, চৈত্যপুরুষ জাগিয়া উঠে, তখন মানুষের আত্মজ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞানালোকে মানুষ মন, প্রাণ ও দেহ নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিলাভ করে ;—শুধু নিয়ন্ত্রণ নহে, তাহাদের রূপান্তরিত করিতে পারে। মন, প্রাণ, দেহ লইয়া তখন আর বিড়ম্বনা বোধ হয় না, বোধ হয় তাহারা আত্মার বিকাশের যন্ত্র, তাহাদের অভিজ্ঞতা বিশ্বচেতনার লীলাতরঙ্গ।

দৃশ্যজগতের উর্দ্ধে ও অন্তরে যে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তির জগত আছে তাহার সহিত আমাদেব চেতনা যুক্ত হইলেই আমাদের প্রাকৃত চেতনার খণ্ডতা ও মালিন্য দূর হয়। খণ্ডতা দূর হইলে সমস্তই এক পরমচেতনার বিভিন্ন স্তর বলিয়া প্রতিভাত হয়। তখন আমাদের প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ বিকীর্ণ করে। আমাদের মন তখন ভূমার সহিত যুক্ত হয়, হৃদয় যুক্ত হয় বিশ্বাত্মার সহিত। তখন বিশ্বের প্রতি স্পন্দন আমাদের হৃদয়ে স্পন্দনছন্দ জাগায়। আমাদের মন হয় শান্ত, সমাহিত ; আমাদের বুদ্ধি হয় স্থির, অবিচল ; আর আমাদের হৃদয়ে বিকাশ পায় শুধু মানবপ্রেম, জীবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম নহে—ভগবানের পূর্ণ সত্তা—যাহা বিশ্বাতীত, সনাতন, শাশ্বত ; আবার যাহা বিশ্বলীলায় মধুর।

আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই সচেতন নই। আমাদের দেহ, প্রাণ ও মন কি ভাবে কাজ করে তাহা আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি না। মন আমাদের পরিচালক, কিন্তু উহা সাধারণতঃ দেহ ও প্রাণের দাবী মিটাইতে ব্যস্ত। মানসিক শক্তি চর্চ্চার ফলেই আমরা মনের প্রভাব বুঝিতে পারি। এই প্রভাব অনেকস্থলে আমাদের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

মনঃসংযম দ্বারা যোগী কি অদ্ভুত শক্তি বিকাশ করিতে পারেন তাহার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।

রেচক কুম্ভকাদি দ্বারা প্রাণশক্তিরও অদ্ভুত বিকাশ করা যায়। অনেক যোগী আশ্চর্য্য প্রক্রিয়ায় মানুষকে বিস্মিত করিতে পারেন। প্রাণায়াম আধ্যাত্মিক সাধনাব একটী বিশিষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত। হঠযোগী দেখাইতে পারেন দেহের উপর কি আশ্চর্য্য কর্ত্তৃত্ব লাভ করা যায়। শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্যে" 'যোগ-সমন্বয়' নামক প্রবন্ধগুলির কয়েকটীতে রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ণযোগেও এইগুলি বিভিন্ন উপায় হইতে পারে, তবে ইহা অপেক্ষা সহজসাধ্য ও অব্যর্থ উপায় হইতেছে যোগশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা। আমাদের হৃদয়দ্বার যখন খুলিয়া যায়, চৈত্যপুরুষ স্ফুট হন, তখনই আমাদের মধ্যে যোগশক্তি, উর্দ্ধপ্রকৃতি সক্রিয় হন। পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ দ্বারা আমরা এই শক্তির সহিত যুক্ত হইতে পারি, এবং যতই আমাদের সত্তার বিভিন্ন স্তর, আমাদের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সজ্ঞানে ও সানন্দে এই শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, ততই উর্দ্ধের চৈতন্য বিকশিত হয়, ক্রমশঃ আমাদের সত্তা হয় এই চৈতন্যশক্তির আধার। আধার বিশেষের (প্রতি আধার সংস্কার অনুসারে বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাহার জন্য আমরা বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ দেখি) বিবর্ত্তন ও রূপান্তর একমাত্র এই প্রকৃতির সহাযতায় সম্ভব। বিবর্ত্তন ঘটিলে আমাদের প্রাকৃত চেতনাকে বিচ্ছিন্ন, অহঙ্কারযুক্ত মনে হয় না—মনে হয় অখণ্ড চেতনা বিচিত্র ভঙ্গীতে, অভিনব ছন্দ সৃষ্টি করিয়া অহরহঃ ব্রহ্মের তপস্যা করিতেছে। ব্রহ্মের তপস্যায় জগৎ সৃষ্ট; মানবের মধ্যে যখন তপস্যা স্ফূর্ত্ত হয় তখনই ব্রহ্মের চেতনার সহিত মানবচেতনা যুক্ত

হয়। তখন শুধু মানবপ্রকৃতিতে নয়, বিশ্বেও অপূর্ব্ব ছন্দ অনুভূত হয়।

মানুষের চেতনা তখন শুধু আনন্দ অনুভব করে না—অনুভব করে বিরাটত্ব, ভূমা। মানুষ তখন অনুভব করে যে, বিশাল জড়-জগতের সহিত তাহার দেহ যুক্ত—তাহার দেহ জড়-জগতের অংশ; প্রাণ যুক্ত প্রাণ-জগতের সহিত এবং মন যুক্ত মনোজগতের সহিত। বিজ্ঞানও এই সত্যে সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে এ বিষয়ে আমরা মনে একটা ধারণা করিতে পারি মাত্র। সৃষ্টির প্রতি স্তরের বিশালতা ও অখণ্ডতা অনুভব করিতে হইলে তাহার সহিত বিশেষ চেতনায় যুক্ত হইতে হয়—যুক্ত হইলে সত্য জ্ঞান জন্মে। শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে বলিয়াছেন knowledge by identity। জড়, প্রাণ ও মনের এই সার্ব্বভৌমত্ব আছে বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি. সকল মানুষের দেহ একই ভাবে গঠিত; প্রাণে আমরা অপরের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারি, এবং মন দ্বারা অপরের মন বুঝিতে পারি। এই সার্ব্বভৌমত্বের জন্যই প্রাকৃতিক নিয়ম, ধর্ম্ম সম্ভব হইয়াছে—বিজ্ঞান কার্য্যকারণ নির্ণয় করিবার সুবিধা পাইয়াছে।

মানুষ যখন যোগপথে অগ্রসর হয় তখন সে অনুভব করে এই স্তরগুলি এক একটা বিভিন্ন জগং—জড়জগৎ, প্রাণজগং, মনোজগং; —অবশ্য একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত; কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্র বিভিন্ন, প্রকৃতি বিভিন্ন এবং প্রত্যেকেরই আছে বিকাশ-বৈচিত্র্য। মানুষের চেতনা ও বুদ্ধি যে স্তরের আশ্রয় লয়, মানুষের সত্তা সেই স্তরের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য জড়বুদ্ধি মানব পায় জড়ের প্রকৃতি—তামসিক; যে প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করে সে হয় রাজসিক; এবং যে মানসিক শক্তির আশ্রয় লয় তাহার

মধ্যে সত্ত্বগুণ বিকাশ পায়। মানুষ যখন ইহাদের সার্থকতা বুঝিতে পারে, খণ্ডতা বুঝিতে পারে, তখনই সে প্রকৃতির ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে—যাহাকে বলে ত্রিগুণাতীত অবস্থা।

মানুষ এই গুণত্রয়ের অস্থিতি বুঝিতে পারিলেই, পরাপ্রকৃতির আশ্রয় লয়—যাহাতে আর দ্বন্দ্ব বা খণ্ডতা নাই, যে অবস্থা হইতে আর বিচ্যুতি নাই। এই পরম রূপান্তর লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে যে সে দেহ নয়, প্রাণ নয়, মন নয়—এগুলি তাহার আত্মবিকাশের, বহির্জগতের পরিচয় পাইবার উপায়। সে উপলব্ধি করে ইহাদের পরিচালক জীবাত্মা। জীবাত্মাই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন আধাব গ্রহণ করে, এবং তাহার প্রয়োজন অনুসারে মহাপ্রকৃতি তাহার দেহ, প্রাণ ও মন গঠন করেন। মানুষ সাধনা দ্বারা এই জ্ঞানলাভে সমর্থ বলিয়া মনঃসংযম দ্বারা এমন অনুভূতি পায় যে তাহার আত্মা, তাহার সত্তা অটল অবিচল, আর চিন্তাগুলি তাহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। শ্রীঅরবিন্দ "যোগালোকে" এই অবস্থার কথা বলিয়াছেন। জেলে থাকিতে তাঁহার নিজের এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা তিনি "কারাকাহিনী"তে বর্ণনা করিয়াছেন।

মানুষের হৃদয় শান্ত হইলে সে উপলব্ধি করিতে পারে যে বাসনাও বহির্জগতের স্রোতপ্রসূত। মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসহায় ভাবে বাসনাস্রোতে হাবুডুবু খায়, কিন্তু একটু নির্লিপ্ত ভাব অবলম্বন করিলেই অনুভব করিতে পারে যে, তাহার সত্তা এই স্রোতের টানেও অবিচলিত থাকিতে পারে। আরও নির্লিপ্ত হইলে উপলব্ধি করে সে আছে স্থির, আর বাসনা বুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে

ও মিলাইয়া যাইতেছে। তখন সে আর বাসনার দাস নয়—প্রভু, তাহার তাহাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জন্মে। অবশ্য চাঞ্চল্যের বিপরীত ভাব অবলম্বন করিলেও ক্রমশঃ এই স্থিরতা আসে, কিন্তু তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য। বাসনাকে নির্ম্মমভাবে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে, দমন করিলে তাহা সাময়িক ভাবে প্রশমিত হয়, কিন্তু তাহার বীজ নষ্ট হয় না। এই কারণেই ধীমান ব্যক্তি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি নিপীড়িত না করিয়া, সমতা, অবিচলতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন করেন এবং তাহাদের রূপান্তরিত করিয়া চৈতন্যের উচ্চভাবগুলির আশ্রয় লন। এই অব্যর্থ উপায়ে প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি আর সত্তাকে অন্ধভাবে আলোড়িত করে না, উর্দ্ধের প্রেরণায় সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে কার্য্য করে।

শারীরিক সুখ-দুঃখ মানুষ কি ভাবে জয় করিতে পারে তাহার নিদর্শন অপ্রতুল নহে। ধীমান ব্যক্তিগণ শারীরিক ব্যাধি উপেক্ষা করিয়া কিরূপে মনঃশক্তি নিয়োজিত করেন তাহার পরিচয় অনেক মহৎ জীবনীতে পাওয়া যায়। আবার প্রাণের প্রেরণায় মানুষ, শারীরিক বিপদ কেন, মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিতে পারে। সৈনিক রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে; দেশহিতৈষী দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। মানুষ উচ্চভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, বিশ্বাসের জন্য বা প্রেরণাবশে গতানুগতিক জীবন উপেক্ষা করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

কিন্তু সকল মানুষ এই প্রেরণা চিরকাল অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না। প্রেরণা চকিতে বিদ্যুতের মত ঝিলিক দেয়; আবার মিলাইয়া যায়। সত্য রূপান্তরের জন্য তাই মানুষকে আশ্রয় করিতে হয় উর্দ্ধের ধর্ম্ম, আঁকড়াইয়া থাকিতে হয় সত্যকে,

প্রেম জাগাইতে হয় সত্যের প্রতি। শুধু ইহাতেও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না—ইহা প্রাথমিক উপায় মাত্র। প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে চাই সত্য জ্ঞান, বিশ্বসত্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরের অভিজ্ঞতা। তপস্যা, ধ্যান, প্রার্থনায় এই অভিজ্ঞতার আভাস দেয়। ফলে জন্মে দৃঢ় প্রত্যয়, অটুট বিশ্বাস, লক্ষ্যে অব্যর্থ দৃষ্টি। তাহার পর বিকাশ পায় দিব্য চেতনা। প্রথমে বিকাশ পায় হৃদয়ে, তাহার পর মনে, ক্রমে প্রাণে, অবশেষে দেহে—এমন কি চেতনার অন্তর্লীন স্তরে পর্য্যন্ত ;—যেমন সূর্য্য উঠিলে প্রথমে আলোক পড়ে তরুশিরে, তাহার পর সমস্ত প্রকৃতির উপর আলো ছড়াইয়া পড়ে।

চৈতন্যের আলোকে, শক্তিতে, আনন্দে যখন আমাদের সত্তা ভরিয়া উঠে, তখন মানুষের মনে হয় সে আর জরা-মরণশীল, অহংবুদ্ধিপরায়ণ ক্ষুদ্র মানুষ নয়—সে অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের অগণন কেন্দ্রের অন্যতম। মানবজাতিকে তখন মনে হয় বিরাট চৈতন্যময় পুরুষের বহিঃরূপ—মানুষের মধ্যে লীলায়িত হইতেছে ভাগবত শক্তি। মানুষের কর্ম্ম তখন আর অহংকে কেন্দ্র করিয়া চলে না, তাহা পরিণত হয় বিশ্বযজ্ঞে। ইহাই উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।'

এই মরজগতে, অজ্ঞান-অন্ধকার সমুদ্রে ভাসমান আমাদের দিশারী কে? চিরন্তন দিশারী হৃদিস্থিত হৃষীকেশ, যিনি অলক্ষ্য-ভাবে অন্তরে থাকিয়া সমস্তই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। কিন্তু আমাদের বহির্মুখী জীবনে ত' বাহিরের অবলম্বন চাই। এ অবলম্বন হইতেছেন গুরু—লৌকিক গুরু নহেন, যোগ-গুরু। গুরুর ভিতর আমরা আদর্শের অভিব্যক্তি দেখিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে বরণ করি। আধুনিকদিগের গুরুবাদে ঘোরতর আপত্তি শুনা যায়। কিন্তু

জাগতিক সাধারণ ব্যাপারেও আমরা গুরু বিনা জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। অধ্যাত্ম সাধনায়, পূর্ণযোগে গুরুই যে একমাত্র দিশারী ইহা একান্ত দাম্ভিক ছাড়া সকলেই স্বীকার করিবে। পূর্ণযোগ কোন বিশেষ মতবাদ নহে; এখানে জোরজুলুম, নিয়মকানুন, দলপুষ্টি করার চেষ্টা প্রভৃতির স্থান নাই—ইহা হইতেছে মানবাত্মার বিশ্বাত্মাকে আবাহন, আত্মার শাশ্বত অভিযান, চেতনার পরম চেতনার সন্ধানে অভিসার, আমাদের খণ্ড জীবনে পূর্ণতা লাভের কৌশল। ইহার দিশারী না পাইলে 'ক্ষুরধার' পথ অতিক্রম করিব কি করিযা? আর চাই এমন দিশারী যাঁহার পথের পূর্ণ অভিজ্ঞতা হইয়াছে, যিনি পথের রহস্যকে আয়ত্ত করিয়াছেন এবং লক্ষ্যে বিজয়কেতন স্থাপন করিয়াছেন।

ষোড়শ অধ্যায়

জগন্মাতার লীলা

সাধক যখন নিজের সত্তা বিশ্লেষণ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে, অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আলোকের সন্ধান পায়; যখন হৃদয়-দ্বার খুলিয়া যায়, মন গতানুগতিক সংস্কারের, বিচারবুদ্ধির গণ্ডী কাটাইয়া সত্যজ্ঞানের জন্য উন্মুখ হয়, যখন সে সমগ্র সত্তা দিয়া শাশ্বতের স্পর্শ পাইতে চায় এবং সেই স্পর্শে রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন সে এক অপূর্ব্ব জগতের সন্ধান পায় যেখানে পরম চেতনা পূর্ণভাবে সক্রিয়, যেখানে চলে জগন্মাতার অবাধ লীলা—যেখানে সমস্তই তাঁহার সত্তার সত্তা, তাঁহারই চেতনার উর্ম্মি। জগন্মাতার পরাজ্ঞান, পরাশক্তি, পরাআনন্দ, পরালীলার আশ্রয় লওয়া যোগমার্গে শ্রীঅরবিন্দের অব্যর্থ নির্দ্দেশ।

তিনি "The Mother" ("মা") নামক পুস্তকের শেষভাগে লিখিয়াছেন: "এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন, মিথ্যামায়ার, মৃত্যু ও দুঃখের জগতে, আবরণ ভেদ করিয়া, আধারকে উপযুক্তভাবে গঠিত করিয়া, সত্য, আলোক, দিব্যজীবন ও অমরত্বের আনন্দ আনিতে সমর্থ মানুষের চেষ্টা, এমন কি তপস্যাও নয়—সমর্থ মাতার শক্তি।" *

* The Mother's power and not any human endeavour and tapasya can alone tear the lid and covering and shape the vessel and bring down into this world of obscurity and falsehood and death and suffering Truth and Light and Life divine and the immortal's Ananda.

জগৎ হইতে, মানব হৃদয় হইতে যখন দিব্যের জন্য আকুল আহ্বান উঠে, দিব্য যখন তাহাতে সাড়া দেন, তখন মানব-আধারে, এই আলো-আঁধারের জগতে যে শক্তি সক্রিয় হন তিনিই হইতেছেন দিব্যশক্তি, পরাপ্রকৃতি, জগন্মাতা।

মানুষের তপস্যা মানবসত্তার পূর্ণ রূপান্তর সাধন করিতে সমর্থ নয় কেন? মানুষ সাধারণতঃ যে শক্তি লইয়া কার্য্য করে, তাহা বিশ্বশক্তির অংশ হইলেও, আধারের খণ্ডতার জন্য সীমাবদ্ধ। যখন সে সীমা অতিক্রম করিতে চায়, তখনই তাহাকে আশ্রয় লইতে হয় উর্দ্ধের অবারিত শক্তির, ইন্দ্রিয়জগতে যাহার মাত্র প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায়। মানুষের তপস্যা সেই শক্তির আশ্রয় লাভের চেষ্টা। মানুষের তপস্যা যদি অখণ্ড না হয়, তাহা হইলে সে যখন তুরীয় অবস্থা হইতে নামিয়া আসে, তখনই প্রাকৃতিক চেতনায় ফিরিয়া আসে। এই অবস্থায় মনে হইতে পারে উর্দ্ধ ও নিম্নের এই দুই জগৎ, উর্দ্ধ ও নিম্ন চেতনা বিচ্ছিন্ন। মানুষের খণ্ডজ্ঞানের জন্য, মনোবৃত্তির জন্য এইরূপ হইয়া থাকে।

এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসের—যাহাকে তিনি Supramental বলিয়াছেন—আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন। অতি-মানসের আশ্রয় লইলে মানুষের কতকগুলি দিব্যবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে থাকে, যাহাতে তাহার অন্তর আলোকিত হয়, অব্যর্থ জ্ঞান-দৃষ্টি জন্মে—জ্ঞানলাভের জন্য তাহাকে শুধু ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধি বা যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিতে হয় না। সে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারে যে, সে শুধু নিম্নজগতের জীব নহে—সে এক বিরাট সত্তা, অপরিমেয় জ্ঞান, স্বতঃস্ফূর্ত্ত অবাধ শক্তি ও ভূমার আনন্দের মধ্যে রহিয়াছে। ইহা সর্ব্বব্যাপী এবং তাহার অন্তরেও ইহা

সক্রিয়। তাহার চেতনা প্রসারিত হইলে তাহার প্রতীতি জন্মে এই সত্তা, জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দে সে শুধু বিধৃত নয়, ইহাতে গঠিতও। যখন এই উপলব্ধি নিবিড় হয় তখন মানুষের জীবন হয় সাবলীল—এক মহান্ ছন্দের বিকাশ ; তাহার কর্ম্ম হয় অবাধ—সে কর্ম্মকে আব নিজের কর্ম বলিয়া দেখে না, দেখে যে ইহা পরাশক্তি, জগন্মাতার লীলার বহিঃতরঙ্গ। সে অনুভব করে সে নিজেই এই দিব্যশক্তির বিকাশের অন্যতম আধার।

শ্রীঅরবিন্দ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, এই মহান উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে সাধককে পূর্ণভাবে, সমগ্র সত্তা দ্বারা এই মহাশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আত্মসমর্পণ বলিলেই আমাদের সাধারণ মনে বিজেতা-বিজিতের সম্বন্ধ জাগিয়া উঠে ; কিন্তু দিব্য-সমর্পণে এইরূপ ভাবের লেশমাত্র নাই। এমন কি ইহা লৌকিক ত্যাগও নহে। ইহা খণ্ডতার অখণ্ডের নিকট সমর্পণ, সসীমের অসীমকে বরণ, অহংএর আত্মাকে আহ্বান। আমাদের অহং কি ? কতকগুলি সংস্কারবিশিষ্ট, নিজ খণ্ড-শক্তিতে বিশ্বাসী, স্বল্প ও অস্থিত আনন্দের জন্য লালায়িত, নিজস্বষ্ট মনোজগতে বিচরণ-প্রয়াসী যে চেতনা তাহাই আমাদের অহঙ্কার। যখন এই চেতনা স্বল্পে তুষ্ট না থাকিয়া জগৎকে চায়, কূপমণ্ডুক না থাকিয়া বৃহদাকাশের পরিচয় পাইতে চায়, তখন ইহাকে আশ্রয় করিতেই হইবে, যুক্ত হইতেই হইবে, সমর্পণ করিতেই হইবে অখণ্ড চেতনার, পূর্ণজ্ঞানের নিকট—অভীপ্সা করিতে হইবে আনন্দ-লোকের। তখন খণ্ড চেতনার আধার মানুষকে অন্তর্মুখী হইতে হইবে, নিছক বহির্মুখী ব্যবহারিক বুদ্ধিপরায়ণ থাকিলে চলিবে না। তাহাকে সন্ধান করিতে হইবে চেতনার উৎসের, পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে চেতনার

লীলাভঙ্গী—শুধু এই দৃশ্যমান জগতে নয়, উর্দ্ধের জগতে, যেখানে চৈতন্যের লীলা অব্যাহত, যেখানে চৈতন্য স্বরাট, সম্রাট—যে জগৎ হইতে সকল জগতের সৃষ্টি, দার্শনিক যাহাকে বলেন কারণ-জগৎ।

"যোগালোকে" শ্রীঅরবিন্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন মানুষ কিরূপে এই মহাচেতনার, পরাশক্তির, পূর্ণ আলোক ও আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। যোগমার্গে সাধক শুধু অসীম শান্তি, নিস্তব্ধতা, বিশালতা অনুভব করে না, সে উপলব্ধি করিতে পারে এক বিরাট শক্তি, যাহাতে সমস্ত শক্তি বিধৃত, যাহা সমস্ত শক্তির কারণ; এক অদ্ভুত আলোক যাহাতে পরিস্ফুট পরাজ্ঞান; এক অপরিমেয় আনন্দ, যাহা জগতের সব মাধুরীর উৎস।

সাধক যখন বাহিরের চাঞ্চল্যমুক্ত হইয়া নিবিড় শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই দিব্যশক্তি তাহার আধারে সক্রিয় হয়। প্রথমে ইহা মস্তকে অবতরণ করে এবং সাধকের মনের অন্তর্লীন কেন্দ্রগুলিকে বিকশিত করে; পরে হৃদয়ে অবতরণের ফলে চৈত্যময় ও ভাবময় সত্তা মুক্ত হয়, নাভি ও অন্যান্য প্রাণকেন্দ্রে অবতরণ করিলে প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তি সাবলীল হইয়া উঠে, এবং অবশেষে যোগে যাহাকে মূলাধার বলা হয় তাহাতে অবতরণ করিলে দৈহিক সত্তা পায় পরম আলোকের স্পর্শ। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন এই শক্তি সাধকের সমগ্র প্রকৃতিকে ধারণ করে—একবারে নয়, এক এক অংশ লইয়া; তাহার পর যাহা বর্জ্জনীয় বর্জ্জন করে, যাহা রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন তাহাকে রূপান্তরিত করে, নূতন যাহা সৃষ্টি করার প্রয়োজন তাহা সৃষ্টি করে। ইহা সমগ্র মানবসত্তার সমন্বয় সাধন করে, প্রকৃতিকে দেয় এক নূতন ছন্দ। সাধকের লক্ষ্য যদি আরও উর্দ্ধে হয়, তাহা হইলে এই শক্তিই আরও উচ্চতর শক্তি, আরও

উচ্চতর প্রকৃতি তাহার আধারে বিকাশ করিতে পারে—এমন কি অতিমানস শক্তি ও সত্তা পর্য্যন্ত।

এই শক্তির কৃপায় সাধকের চেতনার রূপান্তর ঘটিলে সাধক মহাশক্তির পরিচয় পায়। মহাশক্তি কে, কিরূপ তাঁহার প্রকাশভঙ্গী এসম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ "মা" পুস্তকে যে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়, সমগ্র সত্তা যেন দীপ্ত হইয়া উঠে।

বিশ্বে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার পিছনে রহিয়াছেন দিব্য—তাঁহার শক্তিতেই সমস্ত বিকাশ পাইতেছে। দিব্য যোগমায়া দ্বারা নিজকে আবৃত করেন—নিম্ন প্রকৃতিতে কার্য্য করেন জীবের অহং দ্বারা। যোগেও দিব্য হইতেছেন সাধক ও সাধনা। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, চেতনা, আনন্দ প্রভৃতি আধারে বিকাশ করেন, যখন আধার উহা গ্রহণে উন্মুখ হয়। (এই উন্মুখতা প্রকৃতির নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে আবর্ত্তন)। এই বিকাশের ফলেই সাধনা সফল হয়, সাধকের সত্তা রূপান্তরিত হয়, সে আর নিম্নপ্রকৃতির ক্রীড়নক থাকে না, হয় ঊর্দ্ধপ্রকৃতির মূর্ত্তরূপ।

জীব কিরূপে এই মহাশক্তির সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য লাভ করিতে পারে শ্রীঅরবিন্দ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষয়-মুখী, ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধি যখন ঊর্দ্ধশক্তি বিকাশের সঙ্কল্প করে, তখনই সে মহাশক্তির শরণাপন্ন হয়। প্রথমতঃ জীব এই ভাব লইয়া কার্য্য করে যে সে মহাশক্তির সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আত্মা ও দেহ এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট; অহংবুদ্ধিবশে সে কোন কাজ করে না, নিজেকে সে মনে করে ভাগবতযন্ত্র। এমন কি যদি তাহার মনে হয় সে-ই সব করিতেছে, তাহা হইলে এই ধারণায় করে যে

প্রতিটী কাজ জগন্মাতার তৃপ্তির জন্যই করিতেছে—তাহার নিজের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। তাহার একমাত্র পুরস্কার হইতেছে ক্রমশঃ দিব্যচেতনা, শান্তি, শক্তি ও আনন্দ লাভ করা। স্বার্থহীন কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মের আনন্দ, কর্ম্মের দ্বারা আত্মোপলব্ধি কি যথেষ্ট পুরস্কার নহে?

অবশেষে সাধক উপলব্ধি করে তাহার কোন পৃথক সত্তা নাই, সে মহাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট, বিধৃত, সে কর্ম্মী নয়, তাঁহার বিকাশের আধার মাত্র। সে উপলব্ধি করে সে জগন্মাতার কাজ করিতেছে না, জগন্মাতাই তাহাকে যন্ত্র করিয়া কাজ করিতেছেন—তাহার সব শক্তিই মা'র শক্তি; তাহার মন, জীবন, দেহ মা'র লীলার আধার —মা এইগুলির সহায়ে বিশ্বে নিজকে বিকশিত করিতেছেন। যদি সাধক মা'র কৃপায় এই চেতনা লাভ করে তখন তাহার পৃথিবীতে কোন দুঃখ ভয় থাকে না, তাহার হৃদয় মা'র অজস্র করুণায় ভরিয়া উঠে, তাহার সত্তা হয় শান্তিময়, আনন্দময়। তখন সে উপলব্ধি করে সে শুধু মা'র লীলার আধার নয়, সত্যই মা'র সন্তান, তাঁরই চেতনার, শক্তির সনাতন অংশ। সে অনুভব করে তাহাকে মা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহার মধ্যেই মা বিরাজ করিতেছেন। আর সে অনুভব করে তাহার দৃষ্টি, চিন্তা, কার্য্য—এমন কি তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রতি অঙ্গসঞ্চালন মা'রই, তাহার নিজের নয়। সে উপলব্ধি করে মা তাঁর লীলার জন্য তাহাকে ব্যক্তিরূপে, শক্তির আধাররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, গঠন করিয়াছেন—এই অজ্ঞান-জগতেও সে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সে তাঁরই সত্তার সত্তা, চেতনার চেতনা, শক্তির শক্তি, আনন্দের আনন্দ।

যখন সাধকের অনুক্ষণ এই চেতনা থাকে, যখন কিছুতেই তাহার চেতনা অখণ্ডতা হারায় না, বিস্মৃতি আসিয়া বিচ্ছিন্নতা ঘটায়

না, কিছুতেই তাহার অহংবুদ্ধি, খণ্ডবুদ্ধি, খণ্ডচেতনা বিকৃতি ঘটায় না, তখন মা তাঁর অতিমানস শক্তি বিকাশ করেন—যে শক্তি বিশ্বাতীত, যাহা সত্যজ্ঞানপ্রদায়িনী, যাহাতে সমগ্র সৃষ্টির ছন্দ বিধৃত, যাহা হইতেছে সমস্ত আনন্দের উৎস। মা তখন সাধকের সত্তাকে এমন জগতে লইয়া যান যেখানে তাঁহার লীলা অবারিত—সে হইতেছে মা'র নিজের জগৎ, যেখানে পরম সত্তা সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজমান।

জগন্মাতার বিশ্বলীলা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব, পরম রহস্যময়, সাধারণবুদ্ধির ধারণাতীত। যোগাশ্রয়ী সাধক মায়ের কৃপায়, গুরুর কৃপায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। জগন্মাতা বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড চেতনাশক্তি, কিন্তু তাঁহার অভিব্যক্তির এত অজস্রধারা যে, অতি তীক্ষ্ণধীর পক্ষেও তাহা অনুসরণ করা সম্ভব নয়। * পরমসত্তা মাতৃশক্তির সহায়ে ঈশ্বর-শক্তি ও পুরুষ-প্রকৃতিরূপে অসংখ্য জগতে, সৃষ্টির অসংখ্য স্তরে দেব ও দেবশক্তিরূপে বিকশিত। আমাদের জানা ও অজানা যত জগত আছে সমস্তই মাতৃশক্তিতে মূর্ত্ত। সমস্তই হইতেছে পরমপুরুষের সহিত জগন্মাতার লীলা; মা'ই অনন্তের সনাতন সত্তার রহস্য বিকাশ করিতেছেন। মা পরমসত্তার ইচ্ছায় সমস্ত বিকাশ করেন —সৃষ্টির সমস্ত গতিভঙ্গী মা'য়ের হ্লাদিনী-শক্তিতে নিরূপিত হয়।

আমরা মন, প্রাণ ও জড় এই ত্রিধারা বিকাশের জগতকে

* The One whom we adore as the Mother is the divine Conscious Force that dominates all existence, one and yet so many-sided that to follow her movement is impossible even for the quickest mind and the freest and most vast intelligence.—*The Mother.*

জানি, কিন্তু ইহার ঊর্দ্ধে যে কত অজানা জগত রহিয়াছে তাহার পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের মহাশক্তির আশ্রয় লইতে হইবে। অবশ্য পরাচেতনা হইতে এই বিচ্ছিন্ন জগৎ মা'ই ধারণ করিয়া আছেন এবং ইহাকে দুর্জ্ঞেয় লক্ষ্যে নিযন্ত্রিত করিতেছেন। কিন্তু আমরা যদি ঊর্দ্ধের অভিলাষী হই তাহা হইলে মা'র শরণাপন্ন হইতে হইবে। শরণাপন্ন হইবার সুযোগ মা'ই দিয়াছেন, কারণ তিনি স্বয়ং জগতে চারিটী মূর্ত্তিতে নিজকে বিকাশ করিয়াছেন। একটী হইতেছে মায়ের জ্ঞানঘন মূর্ত্তি—মহেশ্বরী; অপরটী শক্তিঘন মূর্ত্তি—মহাকালী; আর একটী পরমা শ্রীর মূর্ত্তি—মহালক্ষ্মী; আর একটী পরমপূর্ণতার মূর্ত্তি—মহাসরস্বতী। সাধক মা'র আশ্রয় লইলে তাহার আধারে বিকাশ পায় জ্ঞান, শক্তি, শ্রী, পূর্ণতা।

এই মূর্ত্তিগুলি হিন্দুর বিশেষ পরিচিত, কিন্তু বাহিরের লৌকিক পূজায় অনেক সময়ে আমরা ইহাদের তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি না। এই কারণে আমাদের আধুনিক মন সাধারণত ইহাদেব পূজা ও সাধনাকে পৌত্তলিকতা বলিযা উড়াইয়া দিতে চাহে। প্রাচীনকালে এদেশীয় সাধকগণ ধ্যানে ভাগবতসত্তার বিভিন্নরূপ দেখিয়া মূর্ত্তিতে সেগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—ইহাদের সবগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত নহে।* আমরা আর্ট কি কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিই, না মানসমূর্ত্তি বলিয়া বরণ করি ?

গভীর ধ্যানে সমস্ত জিনিষের কারণ-রূপ ফুটিয়া উঠে। কারণ বলিয়া হয়ত তাহা মানুষের বহির্জীবনে ততটা প্রয়োজনীয় নয়,

* বেদানুসন্ধিৎসার ফলে শ্রীঅরবিন্দের যে অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিন্তু মানুষের মনের কাছে তাহার কি মূল্য তাহা শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক মাত্রেই জানেন। সৃষ্টি প্রথমে হয় কারণে, রূপান্তরের সূচনা দেখা যায় কারণে—পরে তাহা বিকাশ পায় কার্য্যে, রূপে। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতা। এই জন্যই রূপের পিছনে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হয়; কার্য্যের কারণ, উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে হয়।

গীতার দশম অধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে, সক্রিয় অবস্থায়, অর্থাৎ সৃষ্টির বিকাশে, ভাগবতসত্তার চারিটী ধারা—knowledge, power, harmony and work (জ্ঞান শক্তি, শ্রী ও কর্ম্ম)। মানবজাতির মধ্যেও আমরা এই চার-ধর্ম্মী লোক দেখি। এক শ্রেণী জ্ঞানী, যাঁহারা জ্ঞানের চর্চ্চায় জীবন যাপন করেন (ভারতে যাহাদের ব্রাহ্মণ বলা হইত); আর এক শ্রেণী শক্তি-আশ্রয়ী (ভারতের ক্ষত্রিয়, যাঁহারা সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করেন), অপর শ্রেণী বহির্জীবন পূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন করেন (ভারতের বৈশ্য); চতুর্থ শ্রেণী হইতেছেন কর্ম্মী যাঁহারা সমাজ-সেবা করেন, যাঁহাদের উপর সমাজের জীবিকার জন্য নির্ভর করিতে হয় (ভারতের শূদ্র, যে কথাটি ব্যবহারে হীন অর্থ পাইয়াছে)। আধুনিক জাতিভেদ বংশগত, কৃত্রিম; কিন্তু উপরোক্ত জাতিভেদ প্রকৃতির বিভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কাজেই ছিল স্বাভাবিক।

সমাজে যে ব্যবস্থা হউক না কেন, প্রতি মানুষের মধ্যে কি এই চারিটী ধারা নাই? মানুষ চায় জ্ঞান, শক্তি (পর-পীড়নের জন্য নহে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য), জীবনে চায় শ্রী ও সুষমা এবং এইগুলির অভিব্যক্তি করিতে যায় কর্ম্মে—অর্থাৎ নিখুঁত ভাবে কর্ম্ম করিয়া এইগুলি ফুটাইতে চায়—অন্তরের মহৎ প্রেরণাগুলি বাহিরের সৃষ্টিতে বিকাশ করিতে চায়। জ্ঞান, শক্তি,

শ্রী ও কর্ম্মের সমন্বয়ে মানুষের জীবন পূর্ণ হয়, কর্ম্মও হয় নিখুঁত। জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি না থাকিলে কর্ম্ম হয় যান্ত্রিক—তাহাকে বিড়ম্বনা বলিলেও হয়।

মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের সভ্যতা এই চারিটী শক্তি বিকাশের ফল। মানুষ পূর্ণভাবে ইহাদের প্রত্যেকটির আশ্রয় লইতে পারে না বলিয়া তাহার জীবনে এত অশুভ, বিড়ম্বনা, অজ্ঞানতা ও দুঃখ—জীবন ছন্দহীন। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ জগন্মাতার এই চারিটী প্রকৃতির শরণাপন্ন হইতে বলিযাছেন, আমাদের সত্তায় পরাশক্তির এই চারি প্রকৃতি বিকাশ করিতে বলিযাছেন। তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, যতক্ষণ এই চারিটী প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ ও অবাধ লীলা না হয়, ততক্ষণ জগন্মাতার উর্দ্ধতন প্রকৃতি, মা'র সত্তাব অন্যান্য রূপ সাধকের হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় না। * আমাদেব বহির্মুখী মন, চঞ্চল হৃদয় ও জড়ধর্ম্মী দেহের পক্ষে এ সমর্পণ মুখের কথা নয়। মা'র এক একটি প্রকৃতি ও রূপ লইয়া যুগ যুগ সাধনা করিতে হয়; কিন্তু মায়ের কৃপায় সাধকের পক্ষে একটা যুগ এক মুহূর্ত্তে পরিণত হইতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে, আমাদের খণ্ডবুদ্ধি, স্বল্পপরিসর মন, আবেগচঞ্চল হৃদয় ও গতানুগতিক দেহধর্ম্ম লইয়া মা'র সত্তা নিরূপণ করিবাব চেষ্টা বৃথা। যদি আমরা সমগ্র প্রকৃতি ও জীবনের রূপান্তরের জন্য উদগ্রীব হই, যদি আমাদের দেহের

* Only when the Four have founded their harmony and freedom of movement in the transformed mind and life and body, can those other rarer Powers manifest in the earth movement and the supramental action becomes possible.—
—*The Mother.*

প্রতিটী কোষ পর্য্যন্ত মায়ের শান্তি, শক্তি, আনন্দদায়িনী চেতনার স্পর্শ পাইবার জন্য উন্মুখ হয়, তাহা হইলেই মা তাঁহার শক্তি বিকাশ করেন, সাধকের চেতনা, এমন কি আধারকে পর্য্যন্ত, রূপান্তরিত করেন। আর আমরা যদি অখণ্ডভাবে মা'কে না চাহি, যদি মাত্র তাঁহার করুণা কণা যাজ্ঞা করি, তাহা হইলে আমাদের চেতনায় মা'র প্রকৃতির ক্ষণিক বিজলী আভা দেখা যাইবে—মা একবার দেখা দিবেন, আবার লুকাইবেন। বিমূঢ় হইয়া যদি আমরা গর্ব্বভরে অহংবুদ্ধির উপব নির্ভর করি, মা তাহাতে বাধা দিবেন না, কিন্তু আমরা চলিব ধ্বংসেব পথে। * গীতায় ভগবান বলিয়াছেন বিমূঢ়াত্মা বিনাশ পায়।

মা বিশ্বজননী, কিন্তু সৃষ্টির উপর তাঁহার আসক্তি নাই। তাই একদিকে তিনি আর্ত্তকে দেন আশ্রয়, পরম অভয়, তেমনি প্রয়োজন বোধ করিলে সৃষ্টি ধ্বংস করিতে পশ্চাদপদ হন না। আমরা যখন দুর্বুদ্ধিপরায়ণ হই, আমাদের হৃদয়, মন, দেহ যখন কলুষিত হয়, তখন মায়ের খড়্গ দেখিয়া আমাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে; কিন্তু তিনি নির্ম্মম হস্তে অশুভ ধ্বংস করেন শুভ সৃষ্টি করিবার জন্যই।

কিন্তু মা শুধু সৃষ্টির বাহিরে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নহেন, তিনি নিজেই এই অজ্ঞানতার আবরণ গ্রহণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সৃষ্টির বিবর্ত্তনে সহাযতা করিতেছেন। ভক্ত মায়ের পরিচয় পাইয়া অনেক সময়ে ব্যাকুল হয় যে, মা'ই যদি সব জিনিষের পিছনে রহিয়াছেন,

* In each man she answers and handles the different elements of his nature according to their need and their urge and the return they call for, puts on them the required pressure or leaves them to their cherished liberty to prosper in the ways of the Ignorance or to perish.—*The Mother*.

তাহা হইলে তিনি ত্বরিতগতিতে সমস্ত অশুভ ধ্বংস করিয়া সৃষ্টির কল্যাণ করেন না কেন? মানুষের মন সব বিষয়ে ব্যস্ত; দৈবের কেরামতি দেখিবার জন্য সে বিশেষ উৎসুক। কিন্তু ভাগবত চেতনার ক্রিয়া ত আধ্যাত্মিক ভোজবাজি (শ্রীঅরবিন্দ গীতাভাষ্যে যাহাকে spiritualistic fireworks বলিয়াছেন) নহে—তাহাব উদ্দেশ্য অজ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞান বিকাশ করা, অজ্ঞানতাকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করা। তাই মা'র শক্তি কতকটা অজ্ঞান আবরণের মধ্যে লুকান (partly she veils and partly she unveils her knowledge and her power); এমন কি অনেক সময়ে তিনি মানুষের মনের গতি, প্রাণের আবেগ, দেহের আকুতিতে সাড়া দিয়া অদ্ভুত কৌশলে তাহাদের রূপান্তরে সহায়তা করেন। *

কি অসীম করুণায় মা সৃষ্টির বিবর্ত্তনের জন্য, জীবনকে অজ্ঞানতা হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহার আলো ও আনন্দের রাজ্যে লইবার জন্য এই ধূসর ধরায় অবতরণ করিয়াছেন! মা যদি অবতরণ না করিতেন, তাহা হইলে জীব কখনই শান্তি, আনন্দ, পরিপূর্ণতা ও মুক্তি লাভ করিতে পারিত না; তাহাকে অসহায়ভাবে, যন্ত্রবৎ, পশুজগতের ন্যায়, নিম্নপ্রকৃতির নিয়মাধীন থাকিতে হইত—সে উর্দ্ধের স্বপ্ন দেখিতেও সক্ষম হইত না। কি অনুপম ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ মা'য়ের এই মহান্ ত্যাগেব কথা লিখিয়াছেন!

"সন্তানের উপর গভীর বিপুল স্নেহবশতই তিনি এই তমসার আবরণখানি নিজের উপর টেনে নিতে সম্মত হয়েছেন।

* The Mother is dealing with the Ignorance in the fields of the Ignorance; she has descended there and is not all above.—*The Mother.*

অজ্ঞানের অনৃতের শক্তিরাজির আক্রমণ, তাদের প্রভাবের উৎপীড়ন সব কৃপা ক'রে সহ্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন, মৃত্যুর অনুরূপ যে জন্ম সেই তোরণটা পার হ'য়ে চলে এসেছেন, সৃষ্টির যত দুঃখ, বেদনা ও যন্ত্রণা নিজের উপরে গ্রহণ করেছেন—কারণ, তিনি হয়ত দেখেছিলেন একমাত্র এই পন্থায় সে সৃষ্টিকে জ্যোতির আনন্দের সত্যের অনন্তজীবনের মধ্যে উন্নীত করা যেতে পারে। এই যে বিপুল আত্মবলি, এরই সময়ে সময়ে নাম দেওয়া হয় পুরুষ-যজ্ঞ—কিন্তু গভীরতর অর্থে একে বলা যায় প্রকৃতির যজ্ঞ—ভাগবতী মায়ের নিঃশেষ আত্মবলি !"*

* "মা"—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ।

সপ্তদশ অধ্যায়

সভ্যতা বিবর্ত্তনের ধারা

মানুষের বিবর্ত্তনের প্রেরণা হইতেছে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণতালাভ করা—জ্ঞানে, কর্ম্মে ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে। সভ্যতার বিবর্ত্তনেও আমরা এই প্রেরণা পাই। প্রথমতঃ মানুষের মূল লক্ষ্য ছিল শুধু দৈহিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি করা। তার পর সে চলিতে লাগিল প্রাণের প্রেরণায়; অবশেষে তাহার প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে মানসিক আদর্শ। মানুষ শুধু ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া তৃপ্ত হয় নাই, সে গড়িয়াছে সমাজ, জাতি, সৃষ্টি করিয়াছে ধর্ম্ম এবং প্রেরণা পাইযাছে মৈত্রীর। এই প্রেরণাই মানুষকে নিছক প্রাকৃতিক জীবন হইতে তুলিয়াছে উর্দ্ধে। মানুষের ভিতর দিয়া উর্দ্ধের প্রেরণা জাগানই প্রকৃতির যোগ; নিম্নপ্রকৃতিই বিবর্ত্তন লাভ করিতেছে উর্দ্ধপ্রকৃতির দিকে। মানুষের মধ্যে যখন এই উর্দ্ধের প্রেরণা জাগে তখনই জীবন সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টিভঙ্গী যায় বদ্‌লাইয়া; সে শুধু ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিয়া তৃপ্ত হয় না, তাহার সমগ্র জীবনকে উচ্চতর আদর্শে রূপান্তরিত করিতে চায়। সে এই বৃত্তিগুলি স্থূলভাবে ভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় না, তাহাতে সূক্ষ্মরস আস্বাদন করিতে চায়। তাহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সে ব্যক্তিগত রূপান্তর ঘটাইয়া তৃপ্ত হয় না, সে মহান্ আদর্শে সমাজকে, জাতিকে, সমগ্র

মানবজাতিকে রূপান্তরিত করিতে চায়—বহুর মঙ্গলের জন্য স্বার্থ তুচ্ছ করিয়া, ব্যক্তিগত শান্তি উপেক্ষা করিয়া, মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া। তখন আত্মপ্রেম মানবপ্রেমে রূপান্তরিত হয়।

বুদ্ধের সম্বন্ধে একটী গল্প আছে (শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ করাইয়াছেন) যে, নির্ব্বাণ-স্বর্গের তোরণে আসিয়া তিনি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মানবের দুঃখে আবার তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তিনি আর স্বর্গে প্রবেশ করিলেন না, মানবসেবার জন্য মর্ত্ত্যেই রহিয়া গেলেন। দেশে দেশে এইরূপ মানবপ্রেমিক জন্মিয়াছেন বলিয়া মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে, প্রেম শিখিয়াছে, স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে প্রেরণা পাইয়াছে, সমষ্টির জন্য কাজ করিতে শিখিয়াছে। সমাজ-প্রেমিক সমাজের সেবা করিয়া তাহার মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন; দেশ-প্রেমিক দেশের ও জাতির সেবা করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন; সর্ব্বোপরি মানবপ্রেমিক মানব-জাতির মধ্যে মৈত্রী-প্রচার করিয়া মানবধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা সমগ্র মানবজাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবার প্রেরণা জাগাইতেছে।

তবু একথা বলা চলে না যে, মানবসভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন প্রগতি হইয়াছে। একদিকে যেমন বুদ্ধ, চৈতন্য, কন্‌ফুসিয়াস, লাওৎসে, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মানবপ্রেমিকের আবির্ভাব হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে দেশে দেশে, যুগে যুগে নরবিদ্বেষী, ক্রূরপ্রকৃতি, নিষ্ঠুর, পরাক্রান্ত ব্যক্তিও জন্মিয়াছে, যাহারা নররক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছে। যুদ্ধের বিভীষিকা ছাড়াও, অকারণে যে কত ব্যাপক নরহত্যা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই—আজও তাহার রেশ দেখা যায়। সম্প্রতি এই সভ্যযুগেও বর্ব্বরতার পুনরাবর্ত্তনে ব্যথিত হইয়া বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ডীন ইঞ্জে তিনটী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ

নরবিদ্বেষীর কীর্ত্তিকাহিনী আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহারা হইতেছেন রোমক সম্রাট নীরো, জঙ্গীস খাঁ ও রুশিয়ার উন্মাদ সম্রাট আইভান দি টেরিব্‌ল্—ভয়াবহ আইভান। বাস্তবিক ইহারা যেরূপ অহৈতুক হত্যাতাণ্ডব করিয়াছিলেন তাহার লোমহর্ষণ কাহিনী পড়িয়া মনে হয়, দানব আর রাক্ষস ত এই! ইহারা পৌরাণিক অসুর ও রাক্ষসদের ভীষণতা ম্লান করিয়াছেন।

ডীন ইঞ্জে বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন যে, আবার এইরূপ ভয়ঙ্করপ্রকৃতি লোকের আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নয়। তিনি আলোচনা করিয়াছেন—কি উপায়ে ইহাদের তাণ্ডব ব্যর্থ করা যায়। তাহার ধারণা যে জনসাধারণ যদি উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে ঔদার্য্য, দয়া, প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি বিকশিত হইবে, এবং ভীষণ প্রকৃতিবিশিষ্ট কোন ব্যক্তির আবির্ভাব হইলেও মানবজাতি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাহার তাণ্ডব-লীলা রোধ করিতে পারিবে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা কি শুধু ব্যক্তিগত প্রকৃতির জন্য? কত জাতিগত, ধর্ম্মগত নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়; আজও কি চোখের সাম্‌নে তাহা দেখিতেছি না? আজ বরং ধ্বংসলীলা হইয়াছে নৈর্ব্যক্তিক—ব্যক্তির প্রকৃতির উপর ইহা খুব কম নির্ভর করে। নিষ্ঠুরতা, বর্ব্বরতা, ক্রূরতা আজ জাতিগত—ব্যাপক। একা জঙ্গীস্ খাঁ বা নীরো এত নিরপরাধ মানব-জীবন ধ্বংস করিতে পারে নাই—যাহা এক একটা বিমানাক্রমণের ফলে হয়। সম্প্রতি কোন এক সহরের উপরে মাস কয়েকের বিমানাক্রমণের ফলে জনসাধারণের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা হইয়াছে দশ হাজারেরও উপর। কত বড় যুদ্ধ হইলে তাহাতে দশ হাজার হতাহত হইতে পারে?

সভ্যতার প্রগতিতে, জ্ঞানের বিকাশে, বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলেই যে মানুষের ধ্বংসতাণ্ডবের শক্তি বাড়িয়াছে এ কথা আজ সকলেই বলেন। পাশ্চাত্যের অনেকেও সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত; তাঁহারা বলেন, সভ্যতার কি এই শোচনীয় পরিণতি হইবে? মানুষের সভ্যতার ইতিহাস, গঠন ও ধ্বংসের ইতিহাস। ইদানীং মানুষের আশা হইয়াছিল যে, বিজ্ঞানের বিকাশে মানুষ এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবে। কিন্তু এখন সে আশা লুপ্তপ্রায়, এখন সকলেই শঙ্কিত, ইহার পরে মানবজাতির কি অবস্থা হইবে। যদি ব্যাপক মহাযুদ্ধ হয় তাহা হইলে পৃথিবীর বর্ত্তমান চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া যাইবে; কিন্তু তাহার পরে কি? *

আজ সত্যই পৃথিবীর অবস্থা কি অদ্ভুত! একদিকে মানুষ অভিনব শক্তি বিকাশ করিয়াছে। প্রকৃতির উপর তাহার কি অদ্ভুত কর্তৃত্ব হইয়াছে! প্রাকৃত জীবনভোগের কত বিচিত্র উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুধু ভোগ নয়, জ্ঞানের দিক দিয়াও মানুষ কি সব অপূর্ব্ব সম্পদ লাভ করিয়াছে। আজ পৃথিবীর দেশগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর অজ্ঞাত নয়—আজ যেন পৃথিবী হইয়াছে সঙ্কুচিত; জাতিতে জাতিতে কত মেশামিশি, মানুষে মানুষে কত পরিচয়! আজ এক সহরে বসিয়া রেডিও-সাহায্যে পৃথিবীর প্রধান সহরগুলির বার্ত্তা পাওয়া যায়, প্রতি জাতির জীবনধারার সন্ধান পাওয়া যায়। সে যুগে হিউয়েন সাঙ কত বৎসর ভ্রমণ

---

* এই পুস্তকখানি ছাপা হইবার সময়েই আবার ইয়ুরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, ক্ষুদ্র জাতিগুলির স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য, আবার বৃটেন ও ফ্রান্স প্রবলপরাক্রান্ত জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতির উপর ইয়ুরোপ ও জগতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

করিয়া ভারতের পরিচয় লইয়াছিলেন, আর আজ এক বৎসরেই হিমালয় অভিযানকারী আসিয়াছিলেন সাত দল।

মানব জীবনের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও মনীষীদের আশা হইয়াছিল যে ধরা স্বর্গে পরিণত হইবার আর বিলম্ব নাই। বিজ্ঞান মানুষকে এমন সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিবে যে, মানুষের জীবন হইবে একটা আরামময় সুখস্বপ্ন। শিক্ষায় সমগ্র মানবজাতি সুসভ্য হইয়া উঠিবে, কাজেই কুসংস্কার ত উড়িয়া যাইবে, ধর্ম্মবিশ্বাসের কোন প্রয়োজন থাকিবে না; যুক্তিবুদ্ধিই হইবে মানুষের একমাত্র আলোকবর্ত্তিকা। দেশ বিশেষে শুধু প্রচলিত ধর্ম্মের উচ্ছেদ করা হইল না, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইল—ঈশ্বরকে সিংহাসন হইতে টানিয়া নামান হইল! বেচারা ঈশ্বর যে কোথায় লুকাইলেন কে জানে!

ঈশ্বরকে দূর করা হইল বটে, কিন্তু এদিকে দানব জাগিয়া উঠিল—একেবারে আচম্বিতে—কোথায় গেল বুদ্ধি, যুক্তি, নীতি, ন্যায়, আইন-কানুন! যুক্তির স্থলে আসিল সুবিধাবাদ, নীতির স্থলে আসিল দুর্নীতি, ন্যায়ের স্থলে আসিল অন্যায়, অত্যাচার, অন্যায়ের প্রশ্রয়। জাতিসঙ্ঘের স্থলে আসিল জাতিসংঘর্ষ। আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার স্থলে আসিল উৎকট জাতীয়তা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থলে আসিল, নূতন ধরণের নৈর্ব্যক্তিক দাসত্ব, ব্যক্তির রাষ্ট্রের দাসত্ব। গণতন্ত্রের স্থলে স্থাপিত হইল স্বেচ্ছাতন্ত্র। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতির যত কিছু নিয়ম-কানুন তাহার পুরাণো কেতাবগুলি পুড়াইয়া ফেলিয়া এখন ঢালিয়া সাজিলেই হয়; এবং তৈয়ারী করিলে হয় 'নব বর্ব্বরতার ইতিহাস' 'স্বেচ্ছাচারতন্ত্র' 'অন্যায়ের কেরামতি', 'জাতিবিদ্বেষ সঙ্ঘ', 'মুষলনীতি' ইত্যাদি!

বর্ত্তমান নিরাশার অন্ধকারে, পৃথিবীর এই অসহায় অবস্থায় সত্যই মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু কি কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হইল তাহা নির্দ্ধারণ না করিলে আলোর সন্ধানও পাওয়া যাইবে না। মানুষ ভুল করিয়াও জীবনে অগ্রসর হয়; সভ্যতাও ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইতেছে। মানুষ এ পর্যান্ত যাহা করিয়াছে তাহা নিছক মিথ্যা নয়; মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানবজাতি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে, বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতায় ক্রমশঃ ঐক্যের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জাতিতে জাতিতে পরিচয়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদের যে প্রয়োজন ছিল তাহা শেষ হইতেছে, সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদ্‌লাইয়া যাইতেছে, এবং আন্তর্জ্জাতিকতার অবশ্যম্ভাবিতা বুঝা যাইতেছে।

জাতিসঙ্ঘের বর্ত্তমানে যে অবস্থাই হউক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই আন্তর্জ্জাতিকতার আদর্শেই সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পিছনে ছিল আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট উড্‌রো উইল্‌সনের মহান প্রেরণা।* যখন ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ চলিতেছিল—আমেরিকা তখনও তাহাতে যোগদান করে নাই, উড্‌রো উইল্‌সন তাঁহার আদর্শ ব্যক্ত করেন নাই—তখন শ্রীঅরবিন্দ "আর্য্যে" মানবমিলনের আদর্শ (Ideal of Human Unity) সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছিলেন তাহার একটীতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধের পরে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের

* আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উইল্‌সনের কন্যা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুদূর আমেরিকা হইতে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে বাস করিতেছেন।

রূপ বদ্‌লাইয়া যাইবে এবং জাতিগুলি আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য একটী সঙ্ঘ স্থাপন করিবে। শ্রীঅরবিন্দ তাহার নাম দিয়াছিলেন 'Parliament of Man'। যুদ্ধ শেষ হইয়া যখন ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল, তখনও শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কেন নব-প্রতিষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘ টিকিবে না। তিনি ইহা লিখিবার পরেই জাতিসঙ্ঘের আদর্শে ভণ্ডামির পরিচয় পাওয়া গেল—ভগ্নহৃদয়ে উড্‌রো উইল্‌সন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আমেরিকাই সঙ্ঘে যোগদান করিল না। আদর্শের ব্যর্থতায় ব্যথিত হইয়া উইল্‌সন বেশী দিন বাঁচেন নাই। দশ বৎসরের মধ্যেই সঙ্ঘের ভিত্তিতে ফাটল ধরিল। আজ তাহার কি অবস্থা হইয়াছে আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। তাঁহার এই সম্বন্ধে লেখাগুলি "War and Self-determination" নামক পুস্তকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে, তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখের "আর্য্যে" লিখিয়াছিলেন, "ইতিমধ্যে মানুষ যদি ভ্রান্তভাবেও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, তাহা একটী সুলক্ষণ; কারণ ইহাতে বুঝা যায় ভ্রান্তির পিছনে যে সত্য আছে তাহা পরিস্ফুট হইবার মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় আছে।"* সত্য যে নিশ্চয়ই বিকাশ লাভ করিবে, মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া অগ্রসর

* Meanwhile that he should struggle even by illusions towards that end, is an excellent sign; for it shows that the truth behind the illusion is pressing towards the hour when it may become manifest as reality.

হইয়া একদিন আদর্শকে শ্রদ্ধাভরে বরণ করিবে, ভ্রান্তিমুক্ত হইয়া সে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের অটুট বিশ্বাস আছে। এই কারণেই সর্ব্বপ্রকার রাজনীতিক বা সামাজিক আলোড়নে তিনি অবিচলিত। তিনি কোন দিন কোন জিনিষ বা ঘটনাকে বাহির হইতে বিচার করেন না, তাহার অন্তর্নিহিত সত্য প্রত্যক্ষ করেন। তিনি জানেন মানুষ কোন্ লক্ষ্যে, কিসের টানে যুগ যুগ ধরিয়া বিবর্ত্তন লাভ করিতেছে, কেন তাহার অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন মানুষের প্রাণের গতি, মনোবৃত্তি তাহাকে কিরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়, তাহার সভ্যতাকে যুগে যুগে কি রূপভঙ্গী দেয়, ঊর্দ্ধের প্রেরণায় মানুষ কিরূপে নবযুগের সৃষ্টি করে; আবার নিম্নের টানে সে পড়ে বিড়ম্বনার আবর্ত্তে—যখন তাহার আচার হয় অনাচার, নীতি হয় দুর্নীতি, শৃঙ্খলা হয় বিশৃঙ্খলার কারণ।

এই নীচুর টান কি? মানুষের প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি যদি গর্জ্জিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার মানসিক আদর্শ সে প্লাবন রোধ করিতে পারে না। মানুষ অন্তরের সহিত, ঐকান্তিকতার সহিত আদর্শকে বরণ না করিলে এইরূপ হয়; স্বার্থবুদ্ধি তাহার বুদ্ধির বিকৃতি ঘটায় এবং এমন অনাসৃষ্টির উদ্ভব করে যাহার ফল তাহাকেও ভোগ করিতে হয়। তাই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেই শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, "মানুষের হৃদয় যেমন আছে তেম্‌নি যদি থাকে তাহা হইলে শান্তির হইবে অবসান, শান্তির প্রতিষ্ঠান মানুষের দুর্দ্দাম আবেগে যাইবে ভাঙ্গিয়া। জীবধর্ম্ম অনুসারে হয়ত মানুষের আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মনোধর্ম্মে ইহার প্রয়োজন আছে

(a psychological necessity)। আমাদের ভিতরে যাহা আছে তাহা বাহির হইবেই।” সুতরাং, “যখন মানুষে মানুষে শুধু সম্প্রীতি নয়, তাহার মনে ঐক্যের আদর্শ প্রাধান্য লাভ করিবে; যখন মানুষ মানুষকে শুধু ভ্রাতৃভাবে নয় (উহা ক্ষণভঙ্গুর বন্ধন), নিজের অংশরূপে দেখিবে (অর্থাৎ একাত্ম হইবে), যখন মানুষ ব্যষ্টি বা সমষ্টির অহং-ভাবাপন্ন থাকিবে না, সে বাস করিবে বিশ্ব-চেতনার মধ্যে—তখনই যুদ্ধ (যে কোন প্রকারেই) তাহার জীবন হইতে বিদূরিত হইবে, আর ফিরিয়া আসিবে না।”

শ্রীঅরবিন্দ মানবসভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানুষের দুইটী দৃষ্টিভঙ্গী ইহার বিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। প্রথমতঃ, মানুষ তাহার প্রাকৃতিক বৃত্তির প্রেরণায় সভ্যতা গঠন করিয়াছে। মানুষের অহংজ্ঞান তাহাকে এমন ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছে যাহাতে তাহার মূল লক্ষ্য হইয়াছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রতিষ্ঠা কিসের জন্য?—আত্মপ্রসার ও আত্মসুখভোগের চেষ্টায়। আদিম মানুষ এই বৃত্তিতে পরিচালিত হইয়া জীবনসংগ্রাম চালাইয়াছে। প্রথমে সে উদরপূর্ত্তি ও যতদূর সম্ভব দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে যে প্রতিবন্ধক হইয়াছে সে তাহাকে বিনষ্ট

* Only when man has developed not merely a fellow-feeling with all men but a dominant sense of unity and commonality, only when he is aware of them not merely as brothers—that is a fragile bond—but as parts of himself, only when he has learned to live not in his separate personal and communal ego-sense, but in larger universal consciousness, can the phenomenon of war, with whatever weapon, pass out of his life without the possibility of return.—*Arya,* 15th April, 1916.

করিয়াছে, এবং দুর্ব্বল হইলে নিজে বিনষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যৌনবৃত্তির প্রেরণায় সে বংশবৃদ্ধি করিয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় হয়ত তাহার পরিবার ছিল না, কিন্তু পরে তাহার হইয়াছে পারিবারিক বন্ধন—সে হইয়াছে পারিবারিক ভর্ত্তা, কর্ত্তা।

পরিবার সৃষ্ট হইবার পর তাহার সমষ্টি-বুদ্ধি জাগিল, সে শুধু ব্যষ্টির প্রতিষ্ঠায় তৃপ্ত হইল না, সমষ্টি-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বুঝিল। অতঃপর স্থাপিত হইল কুল, সমাজ,—ক্রমশঃ সমাজের বিবর্ত্তনে উদ্ভব হইল জাতি। মানুষ বুঝিল যে শুধু সংঘর্ষ, সংগ্রাম করিয়া জীবন চলে না, সহযোগিতারও প্রয়োজন। সমষ্টিগত সহযোগিতা ভিন্ন কুল, সমাজ বা জাতি গঠিত হইতে পারে না। সমষ্টিই ব্যষ্টির ভিত্তি, এই প্রেরণায় মানুষ বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ত্যাগধর্ম্ম শিখিল, এমন কি আত্মবিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হইল না। যে সমাজ বা জাতির মধ্যে সহযোগিতা যত ঐকান্তিক, তাহা ততই প্রাণবন্ত।

"আর্য্যে" সমাজবিবর্ত্তনের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে (Psychology of Social Development) শ্রীঅরবিন্দ যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই প্রাণধর্ম্মেরও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন। প্রাণধর্ম্ম ম্লান হইলে সমাজ বা জাতি হইয়া পড়ে দুর্ব্বল এবং ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। ইয়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি এই প্রাণধর্ম্ম। পশ্চিম ইয়ুরোপীয় টিউটনিক আদর্শ প্রাধান্য লাভ করিবার পর হইতেই ইয়ুরোপীয়দিগের আদর্শ হইয়াছে ব্যবহারিক জীবন। ব্যবহারিক বুদ্ধির উপরই পাশ্চাত্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। ইয়ুরোপের সৃষ্টি ও সভ্যতার মূলে এই বুদ্ধি। ইয়ুরোপের লোক হইতেছে প্রাণ-ধর্ম্মের প্রতীক—Vitalistic in the very marrow of his thought and being। আধুনিক যুগে ইয়ুরোপের এই

মনোভাবের ফলে খৃষ্টধর্ম্মের দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম প্রভৃতি সংস্কার, এমন কি প্রাচীন লাতিন সভ্যতার আদর্শ পর্য্যন্ত, বর্ত্তমান অর্থনীতিক ও রাজনীতিক সভ্যতার চাপে তলাইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান, নীতি, সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সব কিছুর লক্ষ্য হইতেছে জীবনগঠন করা, জীবনকে সুন্দর করা এবং জীবনের গ্লানি ও অবসাদ দূর করা। জীবনের আর কিছু লক্ষ্য হইতে পারে পাশ্চাত্য মন তাহা মানিতে চাহে না।

প্রাচীন যুগের দৃষ্টি-ভঙ্গী ছিল একেবারে বিভিন্ন। সে যুগের লোক যে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাহারা বহির্মুখী জীবনকে একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করিত না। তাহারা মনে করিত জীবন বিশেষ আদর্শ উপলব্ধি করিবার ক্ষেত্র। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের আদর্শ ছিল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করা, নৈতিক সুসম্বদ্ধ জীবনগঠন করা এবং সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা। প্রাচীন এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আরও উদার। এশিয়া জীবনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যাপারকে উপেক্ষা করিত না, কিন্তু তাহার আদর্শ ছিল ধর্ম্মের। গ্রীস ও রোমের গৌরবের জিনিষ ছিল শিল্প, কাব্য ও দর্শন—রাজনীতিক ব্যাপারেও তাহারা অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এশিয়ার এ সব গৌরব ছিল, তাহার সামাজিক ব্যবস্থা ছিল আরও উন্নত; কিন্তু এশিয়ার আসল গৌরব তাহার ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিকুল, সাধু, সন্ত, সন্ন্যাসী ও তপস্বিগণ।

আধুনিক জগতের আদর্শ হইয়াছে মানুষের সেই মৌলিক প্রেরণাকে প্রাধান্য দেওয়া। তাই সে অসীম কৃতিত্ব দেখাইতেছে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপারে—বিজ্ঞানের চর্চ্চায়। বিজ্ঞানের লক্ষ্য নিছক জ্ঞানচর্চ্চা নয়—ব্যবহারিক জীবনের রূপান্তর ঘটান।

মানুষ চাহিতেছে জড়প্রকৃতির উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব—প্রকৃতিকে সে চায় নিজের সেবায় নিয়োজিত করিতে। শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীক মন ছিল দার্শনিক, সৌন্দর্য্যানুসন্ধিৎসু ও রাজনীতিক আদর্শবাদী—আধুনিক মনের ঝোঁক হইতেছে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতির দিকে। প্রাচীন আদর্শ ছিল সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা—মানবজীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করা। আধুনিক আদর্শ সৌন্দর্য্যের পূজা নয়, ব্যবহারিক তৎপরতা ও বহির্জীবনকে পূর্ণ করা, যাহাতে জীবন কাজে লাগে—স্বপ্নবিলাসে নষ্ট না হয়।

এই আদর্শ অনুসরণের ফলে বহির্জগতের রূপ কিরূপে বদ্‌লাইয়াছে তাহা আমরা দেখিতেছি। মানুষ বুঝিয়াছে যে শুধু ব্যক্তিগত সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইলেই হইল না—সমষ্টির জীবনকেও একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালাই করা চাই। যে অহংবুদ্ধি ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল, তাহা আজ ব্যাপক হইয়াছে সমষ্টিতে। এমন কি জগৎ-জোড়া সমষ্টির রূপান্তরের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা যে এখনও বাস্তবে পরিণত হয় নাই তাহার কারণ উৎকট জাতীয় অহংকার। এই জাতিগত অহংকারের জন্য ব্যক্তি, কুল বা সমাজকে রাষ্ট্রের বেদীতে আত্মাহুতি দিতে হইতেছে।

বহুপূর্ব্বেই শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের আদর্শের জন্য সোস্যালিজম, কম্যুনিজম প্রভৃতি সমষ্টি-নীতির উদ্ভব হইবে। মহাযুদ্ধের সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, জার্ম্মান মনোভাবের বিবর্ত্তনে ঐ দেশে সোস্যালিজমের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য। সত্যই আজ জার্ম্মানীতে পূর্ণ রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। সেখানে আজ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবননিয়ন্ত্রণের—যাহাকে কথায় বলে 'দোল্‌না হইতে কবর পর্য্যন্ত'—ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। ব্যক্তিগত

রাজনীতিক স্বাধীনতা দূরের কথা, আর্থিক স্বাধীনতা পর্য্যন্ত নাই। সমগ্র জাতি আজ বিরাট যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। রুশিয়ায় 'ষ্টেট্ সোস্যালিজম' হইলেও বোধ হয় সেখানে এরূপে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় নাই —বরং সাময়িক উৎকট পরীক্ষার পর রুশিয়ায় জীবনধারা সাবলীল হইতেছে। জার্ম্মানীর প্রতিভা হইতেছে জীবনকে নিখুঁত ভাবে ঢালাই করা, ইংরাজীতে যাহাকে বলে regimentation—হিট্‌লার আজ সমগ্র জাতিকে তাহাই করিয়াছেন।

আজ জার্ম্মানী হইয়াছে জাতিগত অহংকারের প্রতীক। এই অহং সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।* বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, ইটালীও কালক্রমে সাম্রাজ্যবাদের মদিরাপানে মত্ত হইবে। তখনও মুসোলিনির নাম অজানা ছিল, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আবিসিনিয়ার ভাগ্যে কি হইবে তাহা একরূপ খোলাখুলি ভাবে বলিয়াছিলেন। তবু তিনি জার্ম্মানী ও ইটালীর জাতীয় প্রকৃতিগত বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যই মুসোলিনি হিট্‌লারের মত ইটালীকে একটা যান্ত্রিক দেশে পরিণত করিতে পারেন নাই। হিট্‌লার সমগ্র জার্ম্মানজাতিকে একটা আদর্শে ঢালাই করিয়াছেন—with scientific thoroughness। বৈজ্ঞানিক কুশলতায় ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কি অদ্ভুত কৌশল জার্ম্মানী গত মহাযুদ্ধে দেখাইয়াছিল! আজও তাহার শস্ত্রের ঝির্লিং ইয়ুরোপের শান্তি নষ্ট হইয়াছে।

* এই পুস্তকখানি ১৯৩৯এর এপ্রিল মাসে লেখা শেষ হয়। সেপ্টেম্বরের ১লা তারিখে বৃটেন ও ফ্রান্সের সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

দিব্য-মানব জাতির সম্ভাবনা

নীট্‌শে বোধ হয় জার্ম্মানীর জাতীয় মনোভাবের প্রতীক। নীট্‌শে যে অতিমানবের (Superman) কথা বলিয়াছিলেন, হিট্‌লারকে পুরাপুরিভাবে সে পর্য্যায়ে ফেলা চলে না, কিন্তু নীট্‌শের আদর্শ জার্ম্মানীর সত্তায় বিকাশ পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। নীট্‌শের আদর্শ প্রাকৃতমানবের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। প্রাকৃতমানব প্রাণধর্ম্মী; তাহার মনও প্রাণধর্ম্মে অনুপ্রাণিত। নীট্‌শের অতিমানব প্রাণ-ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। তাহার আদর্শ আত্মপ্রতিষ্ঠা, শক্তির বিকাশ, অপরিমেয় ভোগ, আত্মার তৃপ্তির জন্য কোন নীতি বা বিধান মানিয়া না চলা। নীট্‌শের অতিমানব সর্ব্বময় প্রভু হইতে চায়, অপরের সুখদুঃখ, লাভক্ষতির, মঙ্গলামঙ্গলের দিকে তাহার দৃক্‌পাত নাই। সে দুর্ব্বলের দুর্ব্বলতায় অবজ্ঞার হাসি হাসে, তাহাকে চূর্ণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। বলবানের সহিত শক্তি পরীক্ষায় সে সদাই প্রস্তুত। তাই খৃষ্টীয় প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি নীট্‌শের নিকট উপহাসাস্পদ। পুরাণে অসুরের, 'টিটানে'র যে কাহিনী পাঠ করা যায় নীট্‌শের অতিমানব তাহারই মানব-সংস্করণ। অথচ নীট্‌শে চার্ব্বাক বা এপিকিউরাস-পন্থী নহেন, মেকিয়াভেলির কূটনীতি তাঁহার দর্শনে স্থান পায় নাই—তাঁহার অতিমানবের দুর্ব্বার অহঙ্কার বীরত্বব্যঞ্জক।

পাশ্চাত্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত জনজাগরণের ফলে রাজনীতিক ও সামাজিক ব্যাপারে যে বিপ্লব চলিয়াছিল তাহাতে মনে হইত যে সমষ্টিই ক্রমশঃ সমাজ ও রাষ্ট্রে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে। ফরাসী বিপ্লবে যে গণ-প্রতিষ্ঠার সুরু হইয়াছিল, রুশ বিপ্লবে তাহার পরিণতি হইয়াছে আশা হইয়াছিল। লক্ষণ দেখা গিয়াছিল পৃথিবীর সকল দেশই ধীরে ধীরে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের, রাজনীতি ও অর্থনীতির দেশোপযোগী রূপান্তর করিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সমষ্টির প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইলে, রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে হইলে, এমন নেতার প্রয়োজন যিনি রাষ্ট্রকে, সমাজকে রাখিতে পারিবেন মুঠার মধ্যে। তাই রুশ বিপ্লবের সময়ে লেনিনের কর্ত্তৃত্ব প্রকট হইল—লেনিনের আদর্শেই রুশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত হইল, জাতির রূপান্তর হইল, অর্থনীতি নূতন ধারা অবলম্বন করিল। লেনিনের তিরোভাবে ষ্টালিন তাঁহার আসন লইলেন। তিনি আবার নবনীতি গ্রহণ করিলেন, এবং বিপ্লবের যে নেতাগণ তাঁহার নূতন নীতি বরদাস্ত করিতে পারিলেন না (হয়ত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ষড়যন্ত্র করিয়াও থাকিবেন) ষ্টালিন নির্ম্মম ভাবে তাহাদের জীবনলীলা সাঙ্গ করিলেন।

জার্ম্মানীতে পূর্ব্বে ছিলেন প্রতাপশালী সম্রাট। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিবার পর পূর্ণ বার বৎসর চলিয়াছিল বিশৃঙ্খলা—যদিও যুদ্ধের পর জার্ম্মানীর রাষ্ট্র ছিল গণতন্ত্রের আদর্শস্থল। অতঃপর হিট্‌লার ছলে, বলে ও কৌশলে জার্ম্মানীর সর্ব্বময়কর্ত্তা হইবার ফলে জার্ম্মানজাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে; অপর যে দেশগুলিতে জার্ম্মান-বাসিন্দা ছিল হিট্‌লার তাহা বিনাযুদ্ধে ছলে ও কৌশলে জার্ম্মান-

সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন এবং আজ তাঁহার তাণ্ডবে সমগ্র ইয়ুরোপ অস্থির। মুসোলিনির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ইটালী ছিল দুর্ব্বল, রাজার কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না। ফ্যাসিষ্টদল গড়িয়া মুসোলিনি ইটালীর রূপান্তর ঘটাইলেন ; ইটালীর বিপুল সাম্রাজ্য লাভ হইল।

আজ বলিতে গেলে সারা পৃথিবীতে সর্ব্বময়প্রভুত্বের দিন। এই প্রভুদের প্রাচীনকালের একচ্ছত্র সম্রাট বা স্বেচ্ছাচারী রাজার সহিত তুলনা করা চলে না। স্বেচ্ছাচারিগণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দুর্ব্বল অজ্ঞান প্রজাপুঞ্জের উপর আধিপত্য করিতেন, কিন্তু সর্ব্বময়প্রভুদের পিছনে রহিয়াছে জনশক্তি, গণ-সমর্থন। প্রভু হইতেছেন জাতির নেতা, কাণ্ডারী, সমষ্টির মূর্ত্তরূপ। হিট্‌লারই জার্ম্মানী এবং আজ জার্ম্মানী বলিতে হিট্‌লার। আর সব নেতা, উপনেতা তাঁহার পার্শ্বচর মাত্র।

ইয়ুরোপীয় জাতীয়তার ইহাই পরিণতি—সমষ্টিগত অহঙ্কারের চরম বিকাশ। এখন এই উৎকট জাতীয়তার পরিণাম কি তাহার জন্য জগৎ উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে।* বিগত মহাযুদ্ধের সময়েই শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের পর বিজেতারা কিছুদিন শান্তি রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতা যে নীতিতে চলিতেছে তাহাতে উহাকে 'যুদ্ধ দূর করিবার জন্য শেষ যুদ্ধ' (war to end war)

* এই উৎকট জাতীয়তার প্রতিক্রিয়ায় আবার মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আজ বৃটেন ও ফ্রান্স স্বেচ্ছাচারিতার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদের রূপ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছিল। আশা হয় এই যুদ্ধের ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শ পূর্ণভাবে স্থাপিত হইবে।

বলা হাস্যাস্পদ। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইতেছে রাজনীতি ও অর্থনীতি; কিন্তু ইহার ফল সাম্রাজ্যবাদ, উৎকট জাতীয়তাবাদ। সাম্রাজ্যবাদ বিগত মহাযুদ্ধের কারণ; বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদ আবার প্রকট হইয়াছে। জার্ম্মানী ও ইটালীর সাম্রাজ্যলোলুপতায় চারি বৎসরেব মধ্যে কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছে;—বিনা যুদ্ধেও বাহুবলের হুম্‌কীতে উহাদের সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে। আর এশিয়ায় জাপান পাশ্চাত্যের অনুকরণে আর কোথাও সুবিধামত ক্ষেত্র না পাইয়া প্রতিবেশী চীনের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

বাস্তবিক পৃথিবীর এই মহাসন্ধিক্ষণ। পুরাণো আদর্শ, নীতি, ন্যায়জ্ঞান প্রভৃতি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ডিমোক্রেসী, লিবারেলিজ্‌ম প্রভৃতির যুগ অস্তমিতপ্রায়। এখন হয মহাযুদ্ধের ফলে সভ্যতা প্রচণ্ড আঘাত পাইবে, মানবসৃষ্টি বহুল পবিমাণে ধ্বংস হইবে—নতুবা পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতিগুলিকে লইতে হইবে নূতন আদর্শ; রাজনীতি ও অর্থনীতিকে ঢালাই করিতে হইবে নূতন ছাঁচে। বাহুবলের নীতি, দুর্ব্বলকে শোষণ করিবার নীতি আর চলিবে না। সকল জাতিরই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে হইবে। জাতীয় ঐক্য নহে, মহামানব ঐক্যকে আদর্শ করিতে হইবে। এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি মনীষীগণ বহুকাল ধরিয়া জাতিগুলিকে এ বিষয়ে সাবধান কবিতেছিলেন, কিন্তু বলদৃপ্ত কেহ কি হিতোপদেশ শুনিতে চায়?

কিন্তু শুধু এইচ, জি, ওয়েল্‌সের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে, বৈজ্ঞানিক আদর্শে সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে। জাতির হৃদয় যখন ধর্ম্মান্ধতা, জাতিবিদ্বেষ, লোলুপতা বা শক্তিমত্তায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে তখন বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি যায় তলাইয়া। কেহ কি পূর্ব্বে কল্পনা করিতে

পারিতেন যে, যে-জার্ম্মান জাতির মধ্যে পৃথিবীর সেরা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিযাছেন, সেই জাতিই বিদ্বেষের উন্মাদনায় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মের জন্য দেশে ঠাঁই দিকে না, তাঁহাদেব সর্ব্বহারা করিযা দূর করিয়া দিবে? অপরপক্ষে নিছক শান্তিবাদের আদর্শেও প্রাণ-ধর্ম্মীর হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাহা যদি হইত তাহা হইলে পোপের শান্তির আবেদনে ইয়ুরোপেব জাতিগুলি সাড়া দিত। একান্ত শান্তিবাদী, কোন কারণেই যুদ্ধ না করিবার পক্ষপাতী, বৃদ্ধ ল্যান্সবেরীকে হিট্‌লার ও মুসোলিনীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইত না। শক্তিমত্তা, যাহাকে জার্ম্মানী বলে power politics, আর্থিক লোলুপতা, উৎকট জাতীয়তাবাদ বলিতে গেলে আজ সমগ্র জগতের আদর্শ; তাই আজ অধিকাংশ জাতি নিঃস্ব হইযাও শস্ত্রবহরের জন্য জলের মত টাকা ঢালিতেছে। এই তাণ্ডবের বিরুদ্ধে কাহারও দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। হয়ত মানবপ্রকৃতির আমূল বিবর্ত্তনের ইহা পর্ব্বাভাস। সে বিবর্ত্তন মহাধ্বংসের মধ্য দিয়া হইতে পারে, কিংবা ভাগবত শক্তির কৃপায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে পারে।

যে মনোভাবের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বিশ বৎসর পূর্ব্বে "সমাজবিবর্ত্তনের মনোভাব" শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে বিশেষভাবে আলোচনা কবিয়াছেন। যে সকল আদর্শ প্রাচীনকাল হইতে মানবসভ্যতা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তিনি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া তাহাদের কার্য্যকারিতা নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানুষ যদি নিছক প্রাণধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা হইলে মানবসমাজে এই

দ্বন্দ্বসংঘর্ষ কিছুতেই দূর হইবে না। তাই প্রাচীনকাল হইতে মানুষের মনে আর এক আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে—নীতির আদর্শ, ধর্ম্মের আদর্শ। আজও এই দারুণ দুর্দ্দিনে অনেকে সেই আদর্শের কথা বলিতেছেন, কিন্তু আদর্শে ঐকান্তিকতা কোথায়?

কিন্তু এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলে প্রাচীন ধারায় চলিলে হইবে না। প্রাচীনকালে এই জাগতিক দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে বিরক্ত হইয়া মানুষ একেবারে ইহবিমুখী হইতে চাহিয়াছে। মানুষের যে বৃত্তিগুলি তাহার সত্তাকে ইহমুখী করে সেগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। আদর্শ লইয়াছে সন্ন্যাসের, নির্ব্বাণের। মানুষ আপাতদৃষ্টিতে দেখিয়াছে প্রাণধর্ম্ম এই আদর্শের বিরোধী, তাই সে প্রতিক্রিয়ায় প্রাণধর্ম্মকে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছে। ধনসম্পদকে আদর্শের বিরোধী দেখিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছে। ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষায় অনর্থ দেখিয়া আত্মার পীড়ন পর্য্যন্ত করিয়াছে। দেহ-পরিচর্য্যায় অস্বস্তি দেখিয়া দেহকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অশান্তি দেখিয়া আত্মবিলোপের চেষ্টা করিয়াছে। যৌনবৃত্তির চাঞ্চল্য দেখিয়া বিবাহকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতে চাহিয়াছে। জগতকে বিড়ম্বনার ক্ষেত্র দেখিয়া জগৎ ত্যাগ করা কাম্য মনে করিয়াছে—এমন কি জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে।

এই সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসের আদর্শ একেবারে নিরর্থক নহে। সমাজ যদি নিছক ভোগায়তন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই অত্যুগ্র আশক্তি দূর করিবার জন্য সন্ন্যাসের প্রয়োজন। কিন্তু ইহাকে যদি চরম আদর্শ করা যায়, তাহা হইলেও মানুষ এমন নিস্পৃহ ও উদাসীন

হয় যে, সমাজ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাই সন্ন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ আবার ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবনের গতি ফিরাইতে চাহে।

প্রাচীন ভারতে জীবনের সমন্বয়-সাধনের জন্য চারিটী আদর্শ স্থাপিত হইয়াছিল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এবং এই আদর্শে জীবনে চারি আশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। চরম আদর্শ ছিল সন্ন্যাস। কিন্তু সন্ন্যাসের আদর্শের ত্রুটী এই যে, তাহার ধারণা জগতের কোন দিব্য সম্ভাবনা নাই, সংসার ভাগবতচেতনা বিকাশের ক্ষেত্র নহে। ভগবানকে পাইতে হইলে লোকসমাজ ছাড়িয়া পর্ব্বতকন্দরে, অরণ্যে বা নির্জ্জন নদী কিংবা সমুদ্রতটে আশ্রয় লইতে হইবে।

সন্ন্যাসের মহিমা, গাম্ভীর্য্য যথেষ্ট, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে সন্ন্যাসের দৃষ্টি আংশিক। জীবনের অপরাপর ধর্ম্মের, যাহাকে প্রাকৃতজীবন বলা হয়, গূঢ় রহস্য না বুঝিলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। জীবনে খণ্ডতা থাকিলে একদিকে থাকে অপূর্ণতা, অপরদিকে অস্বীকার। এই জন্যই জীবনের উদ্দেশ্য,—মন, প্রাণ, দেহের সার্থকতা পর্য্যন্ত—না বুঝিয়া মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে "দিব্য-জীবনে" শ্রীঅরবিন্দ যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন পূর্ব্বে তাহার কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন আমাদের দেহ, প্রাণ ও মন ভাগবত উপলব্ধির পক্ষে বাধা নয়, বরং ভাগবত উপলব্ধিতে এগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শক্তি ও আনন্দ বিকাশ করিতে পারে, এবং সৃষ্টিছন্দ মূর্ত্ত করিতে পারে। ভাগবতশক্তির সামান্য বিকাশেই মানুষ সৃষ্টিতে এত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, বিজ্ঞানের দ্বারা জীবনের গতি পরিবর্ত্তন

করিয়াছে. সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টি দ্বারা রসবোধের বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে। আর উর্দ্ধের প্রেরণায় মানুষ পাইয়াছে বিচিত্র অনুভূতি। মানুষ ভাগবতসত্তা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে—তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে—ঐক্যের সম্বন্ধ, আবার ভেদের সম্বন্ধ, পূর্ণ জ্ঞানের সম্বন্ধ, পূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ। মানুষ পরিচয় পাইয়াছে তাঁহার অপার প্রেমের, যাহা আধারের অপেক্ষা রাখে না; স্পর্শ পাইয়াছে তাঁহার অসীম আনন্দ ও শান্তির। এই দিব্য অভিজ্ঞতায় প্রাকৃত জীবন পঙ্গু হয় না। বরং প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলি খণ্ডতা ও বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পায়, আর এমন সব বৃত্তি পরিস্ফুট হয় যাহাদের জ্ঞান, শান্তি, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিবার নিগূঢ় ক্ষমতা আছে।*

মানুষের বিবর্ত্তন হইয়াছে, সভ্যতার প্রগতি হইয়াছে, এই আংশিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণে। মানসিক উন্নতির ফলে মানুষ বহির্জীবন সমৃদ্ধ করিয়াছে। ব্যষ্টির উন্নতির স্থলে সমষ্টির উন্নতির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, এমন কি মানবঐক্যের ও মহামিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছে। কিন্তু মানুষের যদি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী না জন্মে, মানুষ যদি আদর্শ উপলব্ধি-বিষয়ে বিশ্বাসী না হয়, পূর্ণসত্তার আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহা হইলে মানবসভ্যতা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, উত্থান-পতনের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। কারণ খণ্ডবুদ্ধির, খণ্ডজ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে অখণ্ড সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। মানুষ যে এ পরিচয় পায় নাই তাহা নয়,

* The widest spirituality does not exclude or discourage any essential human activity or faculty, but lifts them all out of their imperfection and groping ignorance and makes them the instruments of light, power and joy of the divine being. —*Psychology of Social Development*

কিন্তু তাহাকে সর্ব্বতোভাবে জীবনে আশ্রয় করিয়াছে খুব কম লোক। আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ভগবানকে পাইতে পারি। কিন্তু তাঁহাতে সমষ্টিগত ভাবে আশ্রয় না লইলে চলিবে না। সমষ্টিগত ভাবে আমরা সমাজের উন্নতি চাই, জাতির উন্নতি চাই, এমন কি মানবজাতির বিবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু আমাদের আশ্রয় হইতেছে খণ্ডজ্ঞান—বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, বড় জোর লৌকিক ধর্ম্ম। সমষ্টিগত ভাবে যদি আমাদের লক্ষ্য হয় ভাগবত উপলব্ধি তাহা হইলে সমগ্র মানবজাতির বিবর্ত্তন সম্ভব। আমরা যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে ভগবানের সাযুজ্য, সামীপ্য, সালোক্য চাই, তাহাই করিতে হইবে সমষ্টিগত আদর্শ। তখনই আমাদের মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইবে, আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব একই হইয়াছেন বহু, বহু রহিয়াছে একে।

সাধারণবুদ্ধিতে মনে হইতে পারে যে, এই ভাগবত আদর্শ গ্রহণ করিলে আমাদের পার্থিব জীবনের উপর লক্ষ্য থাকিবে না. যেমন অনেকে বলেন বৈরাগ্যের আদর্শে ভারত ইহবিমুখী হইয়াছে। কিন্তু এ আদর্শ বৈরাগ্যের নয়, ইহা পূর্ণতার, পূর্ণ সমৃদ্ধির, পূর্ণভাবে জীবনের রসভোগের আদর্শ। এই আদর্শে আমাদের শুধু সীমাবদ্ধ মানবীয় শক্তির সাহায্যে চলিতে হইবে না, আমাদের মধ্যে সমষ্টিগত ভাবে বিকাশ পাইবে ভাগবত শক্তি এবং সেই শক্তি আমাদের দিবে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ কর্ম্মশক্তি ও পূর্ণ আনন্দ। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্ম তখন শুধুই সংগ্রাম ও সহযোগিতার ক্ষেত্র হইবে না—হইবে মানুষের সমাজজীবন পূর্ণ করিবার উপায়। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যাইবে বদলাইয়া; সেগুলি আর স্বার্থপরতা, নীচতা ও কুটিলতায় পঙ্কিল হইবে না। আমরা মানুষে মানুষে

প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিব না, আমরা পরস্পর হইব সহায়ক—সকলের জীবনের পরিপূর্ণতার চেষ্টায় নিজের জীবন পরিপূর্ণ করিব।

কিন্তু আমরা বহির্জীবনে যান্ত্রিক একাকারেব চেষ্টা করিব না। যান্ত্রিক একাকার-বুদ্ধি মানবীয় খণ্ডবুদ্ধির রূপ-জগৎ সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। ভগবানকে আমরা একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলিয়া জানি, কিন্তু উপলব্ধি করি যে তিনি এক হইযাও বহু ও বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। কাজেই আমরা যদি ভাগবত চেতনায প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের সার্থকতা বুঝিব কিন্তু ঐক্যের জ্ঞান হাবাইব না। চেতনার ঐক্য বুঝিলে আমবা উর্দ্ধে উঠিয়াও নিম্নের বিকাশভঙ্গী বুঝিব। কিন্তু সে বিকাশে আর খণ্ডের মালিন্য থাকিবে না, পরন্তু ভাগবতশক্তির বিকাশে খণ্ডের মধ্যেও পূর্ণতা উপলব্ধি হইবে। তখন জগন্মাতার পরাশক্তি-বিকাশে জীবনের ধারা চলিবে নূতন আলোকে।

এই বিবর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীঅববিন্দের একপ প্রত্যয় যে, তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন সত্যসৃষ্টিতে প্রলয় থাকিবে না, শুধু হইবে রূপান্তর। এমন কি আমাদের দেহের মধ্যে যদি পূর্ণ চৈতন্য কোন দিন বিকাশ পায়, তাহার প্রতি কোষ যদি ভাগবতসত্তা অনুভব করে, তাহা হইলে আমাদের দেহকেও অসহায় ভাবে মৃত্যুর কবলে পড়িতে হইবে না। অবশ্য মানুষ চিরজীবী হইবে না, কারণ বিশ্বসৃষ্টিই ভগবানের রূপান্তর—কিন্তু মানুষের রূপান্তরে অসহায়তার, অজানার ভয় থাকিবে না। দেহের ধর্ম্ম রূপান্তরিত হইয়া, ভাগবত আনন্দের স্পর্শে জরা-ব্যাধিহীন হইবে। দেহ তখন ভোগায়তন থাকিবে না, হইবে ভাগবত ছন্দবিকাশের আধার। যে শক্তি,

জ্ঞান, আনন্দ, পরিপূর্ণতা আমরা ধ্যানে উপলব্ধি করি, তাহা শুধু আমাদের মনে নয়, প্রাণে, দেহে পর্য্যন্ত বিকাশ পাইবে। মানুষের কর্ম্ম তখন শুধু জৈব ধর্ম্ম পালন বা অহঙ্কার পরিতৃপ্ত করিবার উপায় হইবে না, তাহা সৃষ্টি করিবে ভাগবত· বৈচিত্র্য। কর্ম্ম তখন শ্রান্তিময়, নিরানন্দময় হইবে না, তাহাতে আমরা উপলব্ধি করিব শক্তির স্ফুরণ।

এখনই যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই দিব্যরূপান্তর হইবে তাহা নয়। স্মরণ রাখিতে হইবে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, জগন্মাতা সর্ব্বত্রই পরাশক্তিতে কাজ করিতেছেন না—তিনি অজ্ঞতার আবরণও লইয়াছেন। তিনিই অজ্ঞানের লীলাবৈচিত্র্য রূপান্তরিত করিয়া উপযুক্ত ক্ষণে অজ্ঞানকে জ্ঞানে মুক্তি দেন।

এই দিব্যরহস্যের সন্ধানে যাঁহারা জীবন নিয়োজিত করিয়াছেন, যাঁহাদের সত্তায় ভাগবতচেতনা বিকাশ পাইয়াছে, তাঁহারাই আমাদের দিশারী, তাঁহারাই মহামানব। তাঁহারা নীট্‌শের আত্মভোগসুখবাদী, আসুরিকপ্রকৃতি, অহঙ্কারী অতি-মানব নহেন—তাঁহারা বিশ্বাত্মা, তাঁহাদের চেতনায় ব্রহ্মাণ্ড; তাঁহারাই পৃথিবীতে ভাগবতশক্তি, ভাগবতজ্ঞান, ভাগবত আনন্দবিকাশের কেন্দ্র। তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ "Psychology of Social Development"এ লিখিয়াছেন:

"The spiritual man who can guide human life towards its perfection is typified in the ancient Indian ideal of Rishi, who living the life of man has found the word of the supra-intellectual, supramental spiritual truth. He has risen over these lower limitations and can view all things from above,

but also he is in sympathy with their effort and can view them from within; he has the complete knowledge and the higher knowledge. Therefore, he can guide the world humanly as God guides it divinely, because like the Divine he is in the life of the world and yet above it."

আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিই হইতেছেন দিব্য-মানব জাতির অগ্রণী। তাঁহার যেমন উর্দ্ধ্ব জ্ঞান আছে, তেমনি তিনি উপলব্ধি করেন সৃষ্টির রহস্য। তাঁহার মধ্যে খণ্ডতা নাই, কিন্তু তিনি খণ্ডতার মর্ম্ম উপলব্ধি করেন। ক্ষণে ক্ষণে অবতারের জন্ম সম্ভব নয়; ঋষিই হইতেছেন মানুষের উর্দ্ধায়নের দিশারী। অবতার যেমন মানুষের জীবন-চেতনার রূপান্তরের জন্য মানবরূপ গ্রহণ করেন, ঋষি মানবের মধ্যে থাকিয়া রূপান্তরে সহায়তা করেন। ঋষির মধ্যে ভাগবত জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের যে স্ফুরণ হয় তাহাতে সাধারণ মানুষের তাহা উপলব্ধি করিবার সুযোগ হয় এবং মানুষের হৃদয়ে মহা-ঐক্য ও মহাছন্দের আভাস আসে। পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক সমষ্টি গড়িতে পারেন ঋষি। এই কারণেই ভারতে ঋষি আদৃত; ভারতের লোক ঋষির আশ্রয় লইয়াছে এবং ঋষির তপস্যায় অমঙ্গল হইতে ত্রাণ পাইয়া আলোর সন্ধান পাইয়াছে। সত্যই, মানবের গুরু এবং দিশারী অহংবুদ্ধিপরায়ণ, দাম্ভিক, ঘোরকর্ম্মা নেতা নহে; বিশ্বপ্রেমিক, উদারহৃদয়, সত্যদর্শী, ভাগবতচেতনার আধার ঋষি—দিব্যমানব। তাঁহার আধারকে কেন্দ্র করিয়া পার্থিবসত্তার সকল স্তরে ভাগবতসত্তা ও চেতনা-বিকাশের সম্ভাবনা, মানবজীবনের বহু-যুগাকাঙ্ক্ষিত দিব্যরূপান্তরের সূচনা।

পরিশিষ্ট

অরবিন্দ—রবীন্দ্র সন্দর্শন

[১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে ইয়রোপ যাইবার পথে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিচারীতে অবতরণ করেন। পণ্ডিচারী-আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে দীর্ঘকাল পরে কিরূপ দেখিলেন সে সম্বন্ধে জাহাজে বসিয়া একটী প্রবন্ধ লিখেন। উহা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।]

অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোসকে দেখ্‌বো। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'লো · ভাঙা শরীব নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট ক'রেই নাম্‌তে হ'লো—তা হোক্, অববিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝ্‌লুম,—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন। সেই তার দীর্ঘ তপস্যার চাওযা ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন ব'ল্‌লে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জাল্‌বেন। কথা বেশি বল্‌বার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হ'লো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খর-দস্তুর মতেব উপদেবতার নৈবেদ্য রূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনাব মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই

মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে ব'লে এলুম,—আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আস্‌বেন এই অপেক্ষায় থাক্‌বো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজ্‌বে, শৃন্বন্তু বিশ্বে।

প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হ'য়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হ'য়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

শান্তিলি জাহাজ,
২৯শে মে, ১৯২৮